RICE IAS - এর সাথে শুরু হোক
আপনার UPSC CSE প্রস্তুতির যাত্রা।

RICE IAS

IAS MAINS 2026 পরীক্ষার জন্য

প্রত্যাশিত CURRENT AFFAIRS

জুন -২০২৬

Sealdah, Kolkata | Old Rajinder Nagar, New Delhi | At Adamas University

8100819447 | 9933118849 | 8100971442

RICE IAS

Daily Deep Analysis

for IAS Mains

- ***In-depth*** coverage of ***micro-topics*** from the ***UPSC GS Mains syllabus***
- One ***GS Mains topic*** covered ***comprehensively*** every day
- ***Systematic*** GS Mains syllabus ***mapping***
- Focused coverage of ***GS Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions*** with model answers

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis on our website

SCAN this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447

Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849

At Adamas University 8100971442

RICE IAS

Daily Editorial Explained

for IAS Mains

- *UPSC **Mains-oriented editorial** decoding*
- ***Theme-based** conceptual clarity*
- *Clear linkage with **UPSC GS papers***
- *Focused coverage of **UPSC Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions** with model answers*

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis
on our website
SCAN
this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447
Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849
At Adamas University 8100971442

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** 1

1.1. ভারতীয় সমাজ 1

1.1.1. স্বাধীন চলচ্চিত্রের জন্য একটি নতুন রোডম্যাপ 1

1.1.2. জাতীয় জাতিশুমারি (CASTE CENSUS) এবং জাতিহীন সমাজের বিতর্ক 5

1.2. ভূগোল 8

1.2.1. ভারতের আবহাওয়া বিভাগের (IMD) ব্লক-ভিত্তিক মৌসুমি বায়ু পূর্বাভাস ব্যবস্থা 8

1.3. সংস্কৃতি 9

1.3.1. বন্দে মাতরম বিতর্ক এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা 9

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** 12

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 12

2.1.1. ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম 12

2.1.2. দলত্যাগ বিরোধী আইনের সংকট: দশম তফসিলের পুনর্মূল্যায়ন 15

2.1.3. ভারতে অনলাইন বাকস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ: গণতান্ত্রিক উদ্বেগ এবং আইনি টানাপোড়েন 19

2.1.4. বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬ 22

2.1.5. বুলডোজার বিচার: যখন রাষ্ট্র আইনকে উপেক্ষা করে 24

2.1.6. আইনি কল্পনা এবং দশম তফশিলের অধীনে দলীয় একীভূতকরণ: চ্যালেঞ্জ এবং আগামীর পথ 27

2.1.7. আদর্শ আচরণবিধি এবং ভারতের নির্বাচনী গণতন্ত্রের সততা 31

2.1.8. ভারতের জলশাসন 34

2.1.9. NTA-র 'জিরো এরর' নীতির ব্যর্থতা: ভারতের পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা 37

2.1.10. সরকার গঠনে রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা 41

2.1.11. অনলাইন গেমিং নিয়ন্ত্রণ বনাম সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তৈরি হওয়া উভয়সঙ্কট 44

2.1.12. ভারতের বিচার ব্যবস্থার বাজেটে আর্থিক ভারসাম্যহীনতা 46

2.1.13. SHANTI আইন, ২০২৫-এর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা: 49

2.1.14. ভারতের বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা এবং আদালত অবমাননা ক্ষমতার সীমা 51

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 55

2.2.1. OPEC থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রস্থান: বৈশ্বিক তেল রাজনীতি এবং ভারতের ওপর প্রভাব 55

2.2.2. জাতিসংঘ মহাসচিব 58

2.2.3. ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA): 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ 61

2.2.4. ভারত–ভিয়েতনাম সম্পর্ক 65

2.2.5. ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্ক এবং KIND-X উদ্যোগ 68

2.2.6. ইউ.এস.–চীন (US–China) কৌশলগত স্থিতিশীলতা এবং ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন 71

2.2.7. ভারত-উত্তরাঞ্চলীয় অংশীদারিত্ব এবং উদীয়মান সুমেরু ভূ-রাজনীতি 73

2.2.8. ইউএই (UAE) এবং ইউরোপে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নতুন পদক্ষেপ 76

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার 78

2.3.1. সুরক্ষা থেকে সেবা: ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের পথ 78

2.3.2. ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য: প্রবণতা, মাত্রা এবং নীতিগত উদ্বেগ 82

3. সাধারণ অধ্যয়ন ৩ **86**

3.1. অর্থনীতি **86**

3.1.1. রুপির অবমূল্যায়ন এবং বিনিয়োগের ওপর এর প্রভাব 86

3.1.2. চরম তাপপ্রবাহ এবং গিগ ইকোনমি: ভারতের নগর শ্রম সহনশীলতার পুনর্ভাবনা 89

3.1.3. খণ্ডিত বিশ্বব্যবস্থায় ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা 93

3.1.4. মূলধন ফ্লাইট ও টাকার সংকট: ভারতের বৈদেশিক খাত চাপের মুখে 96

3.1.5. প্রবৃদ্ধি থেকে উৎপাদনশীলতা: ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর পথে ভারতের যাত্রা 100

3.1.6. ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস রিজার্ভ: জ্বালানি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ 103

3.1.7. ভারতের ইভি (EV) রূপান্তর এবং পাওয়ার গ্রিডের চ্যালেঞ্জ 106

3.1.8. ভারতে টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি 109

3.1.9. ভারতের রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা 112

3.2. পরিবেশ **115**

3.2.1. কার্বন ট্যাক্স দেশের টাকা দেশেই রাখা উচিত 115

3.2.2. মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত ব্যবস্থাপনা: সহাবস্থান এবং টেকসই সংরক্ষণ 119

3.2.3. ভারতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংকট: কেন্দ্রীভূত শাসনের সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের পথ 122

3.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা **126**

3.3.1. সাইবার যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক আইনি জবাবদিহিতার সংকট 126

3.4. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি **129**

3.4.1. ভারতের মহাকাশ কূটনীতি 129

3.5. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা **134**

3.5.1. ভারতের নগর অগ্নি নিরাপত্তা: চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকার 134

3.6. প্রতিরক্ষা **137**

3.6.1. ভারতের নতুন নিরাপত্তা নীতি 137

***

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. সমাজ

1.1.1. স্বাধীন চলচ্চিত্রের জন্য একটি নতুন রোডম্যাপ

ভূমিকা

অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (AMPAS) সম্প্রতি তাদের International Feature Film বিভাগের নিয়মে পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনটি বিশ্ব চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি এবং প্রচারের ক্ষেত্রে একটি **দার্শনিক পরিবর্তনের** (philosophical shift) ইঙ্গিত দেয়—যা কঠোর **জাতীয় গেটকিপিং** (national gatekeeping) থেকে সরে এসে **উৎসব-কেন্দ্রিক** (festival-driven) এবং **যোগ্যতা-ভিত্তিক স্বীকৃতির** (merit-based recognition) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চলচ্চিত্রের গুরুত্ব — একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. **সাংস্কৃতিক ও সাংবিধানিক গুরুত্ব**

- ভারতীয় সংবিধানের **১৯(১)(ক) ধারা** অনুযায়ী **বাক-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা** নিশ্চিত করা হয়েছে, যার মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন এবং বিতরণের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭০ সালের **কে.এ. আব্বাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে রায় দিয়েছিল যে চলচ্চিত্র হলো শৈল্পিক অভিব্যক্তির একটি বৈধ মাধ্যম যা **মৌলিক অধিকারের** অধীনে সুরক্ষিত।
- **২৯ এবং ৩০ নম্বর ধারা** ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করে। মালয়ালম, অসমীয়া, মারাঠি বা ভোজপুরি-র মতো **আঞ্চলিক ভাষার চলচ্চিত্র** হলো এই সম্প্রদায়গুলোর নিজস্ব **স্বতন্ত্র পরিচয়** প্রকাশ, সংরক্ষণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম।
- **সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৯৫২** এবং **সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন** (CBFC) চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তাদের এই নিয়ন্ত্রণের পরিধি এবং **সৃজনশীল স্বাধীনতার** মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা জরুরি।
- **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (অনুচ্ছেদ ৪৯)** রাষ্ট্রকে স্মৃতিস্তম্ভ এবং শৈল্পিক ও জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন কাজগুলি রক্ষা করার নির্দেশ দেয়। একটি **সাংস্কৃতিক নিদর্শন** (Cultural Artefact) হিসেবে চলচ্চিত্রও এই নীতির আওতাভুক্ত।

২. **অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সফট পাওয়ার** (Soft Power)

- বলিউড, আঞ্চলিক সিনেমা এবং স্বাধীন চলচ্চিত্র মিলিয়ে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের **কর্মসংস্থান** করে।
- চলচ্চিত্র ভারতের **সফট পাওয়ার ডিপ্লোম্যাসি** (Soft Power Diplomacy) বা সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শিত ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলো **সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন** তৈরি করে এবং বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।
- **ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন** (NFDC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশেষভাবে অবাণিজ্যিক, **স্বাধীন এবং সমান্তরাল চলচ্চিত্র** (Parallel Cinema) সমূহকে সহায়তা করার জন্য, যা ভারতের শৈল্পিক পরিচয়কে বিশ্বদরবারে তুলে ধরে।
- গোয়ায় প্রতি বছর অনুষ্ঠিত **ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া** (IFFI) হলো একটি প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্ববাসীর কাছে ভারতীয় সিনেমাকে প্রদর্শন করে। তবে অনেক প্রশংসিত স্বাধীন চলচ্চিত্র এই স্তরের পর আর পর্যাপ্ত প্রচার বা সহায়তা পায় না।

৩. **সামাজিক গুরুত্ব — বিভিন্ন প্রজন্ম ও সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব**

- **সামাজিক সচেতনতার হাতিয়ার:** শিশুদের ক্ষেত্রে বয়সোপযোগী সিনেমা **মূল্যবোধ, সহমর্মিতা এবং নৈতিক চেতনা** গড়ে তোলে। তরুণ প্রজন্মের কাছে এটি বেকারত্ব, **জাতিভেদ বৈষম্য** এবং শহুরে পরিযানের মতো বিষয়গুলি তুলে ধরে তাদের **রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা** তৈরি করে। বড়দের জন্য এটি জীবন ও বাস্তবতার দর্পণ হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, **'তারে জামিন পার'** (২০০৭) চলচ্চিত্রটি শিখণ অক্ষমতা (Learning Disabilities) সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করেছিল।
- **লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক অ্যাডভোকেসি:** স্বাধীন চলচ্চিত্র নারীদের বিষয়বস্তু এবং স্রষ্টা—উভয় রূপেই **প্রতিনিধিত্ব (Agency)** প্রদান করে। এটি এমন সব গল্প বলে যা মূলধারার সিনেমায় কম দেখা যায়। একইভাবে, এই সিনেমাগুলি **দলিত সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের** অধিকারের পক্ষে কথা বলে **গণতান্ত্রিক আলোচনা (Democratic Discourse)** ও সামাজিক বিচারে সাহায্য করে। **'লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরখা'** (২০১৬) লিঙ্গ বৈষম্যের সীমানা ভেঙেছে, আবার **'কোর্ট'** (২০১৫) বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের প্রতি **প্রাতিষ্ঠানিক অবিচারকে** প্রকাশ করেছে।
- **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবন্ত দলিল:** আঞ্চলিক স্বাধীন চলচ্চিত্রগুলো **লোকজ ঐতিহ্য, মৌখিক ইতিহাস এবং উপভাষাগুলিকে** সংরক্ষণ করে, যা নগরায়নের ফলে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটি ভারতের **বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক স্মৃতির (Plural Cultural Memory)** আধার হিসেবে কাজ করে। যেমন—অসমীয়া চলচ্চিত্র **'ভিলেজ রকস্টারস'** (২০১৭) বা গ্রামীণ কৃষি সংকট নিয়ে তৈরি **'পিপলি লাইভ'** (২০১০) ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর জীবন্ত প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে কাজ করে।

ভারতীয় স্বাধীন চলচ্চিত্রের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রচারমূলক কাঠামোর অভাব**

- ভারতীয় স্বাধীন চলচ্চিত্রের একটি বড় বৈপরীত্য হলো—এটি বিশ্বজুড়ে দৃশ্যমান কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে **প্রতিনিধিত্বহীন (institutionally underrepresented)**। কান, ভেনিস বা বার্লিনের মতো উৎসবে পুরস্কার জয়ী চলচ্চিত্রগুলো ভারতে ফেরার পর প্রয়োজনীয় **ডিস্ট্রিবিউশন সাপোর্ট (distribution support)** বা প্রচারের জন্য তহবিল পায় না, যা বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য জরুরি।
- ফ্রান্সের CNC বা দক্ষিণ কোরিয়ার KOFIC-এর মতো ভারতে কোনো নিবেদিত **আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রচার তহবিল (international film promotion fund)** নেই, যারা আন্তর্জাতিক প্রচার, সাবটাইটেল এবং প্রেস আউটরিচের জন্য অর্থায়ন করে।
- অ-হিন্দি আঞ্চলিক চলচ্চিত্রগুলি আরও বেশি অদৃশ্যতার শিকার হয়। ইংরেজি সাবটাইটেল বা আন্তর্জাতিক ডিস্ট্রিবিউশন চুক্তির অভাবে অনেক পুরস্কার জয়ী আঞ্চলিক ছবিও একাডেমি ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

২. **সেন্সরশিপের চাপ এবং সৃজনশীল স্ব-সেন্সরশিপ**

- ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো নিয়মিত প্রতিবাদ বা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে। যেমন—**S. Durga (২০১৭)** ছবিটিকে শুরুতে IFFI-তে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং **Lipstick Under My Burkha (২০১৭)** ছবির শংসাপত্র পেতে অনেক দেরি হয়েছিল।
- বিতর্কের এই নিরন্তর ভয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের **স্ব-সেন্সরশিপ (self-censorship)** করতে বাধ্য করে, যা স্বাধীন চলচ্চিত্রের **শৈল্পিক সততা (artistic integrity)** এবং সামাজিক গুরুত্বকে নষ্ট করে।

৩. **বৈচিত্র্য বনাম একক প্রতিনিধিত্ব**

- ভারতের ২২টি তফসিলি ভাষা এবং অসংখ্য আঞ্চলিক শিল্পের বৈচিত্র্যকে একটি মাত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা মৌলিকভাবেই ত্রুটিপূর্ণ।

- হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, বাংলা বা অসমীয়ার মতো প্রতিটি ভাষার নিজস্ব সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বর রয়েছে। এগুলিকে একটি মাত্র **জাতীয় এন্ট্রিতে (single national entry)** সংকুচিত করা বিশ্ব দরবারে একটি **হিন্দি-কেন্দ্রিক পক্ষপাত (Hindi-centric bias)** তৈরি করে।
- AMPAS-এর নতুন নিয়ম, যা উৎসব-নন্দিত চলচ্চিত্রগুলিকে স্বাধীনভাবে যোগ্য হওয়ার সুযোগ দেয়, এটি স্বীকার করে যে সিনেমা কোনো একক সত্তা নয় বরং একটি **মোজাইক (mosaic)** বা বৈচিত্র্যের সমাহার।

৪. **বিশ্ব স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ 'জাতীয় গেটকিপিং'**

- অস্কারের জন্য ভারতের অফিসিয়াল এন্ট্রি একটি সরকারি কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হয়, যার প্রক্রিয়াটি প্রায়ই **অস্বচ্ছ (opaque)**। তারা শৈল্পিক বা রাজনৈতিকভাবে সাহসী ছবির চেয়ে নিরাপদ এবং **মূলধারার বাণিজ্যিক গল্পকে (commercially mainstream narratives)** বেশি পছন্দ করে।
- 'এক দেশ, এক চলচ্চিত্র' নিয়মটি একটি **প্রাতিষ্ঠানিক বাধা (institutional bottleneck)** তৈরি করেছে। যেমন—২০২৪ সালে উৎসব-নন্দিত ছবি *All We Imagine as Light*-এর পরিবর্তে *Laapataa Ladies*-কে বেছে নেওয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

৫. **সৃজনশীল সমজাতীয়করণের ঝুঁকি**

- আন্তর্জাতিক উৎসবের সংস্পর্শে আসার ফলে নির্মাতাদের মধ্যে এক ধরনের **জেনুইন আর্টহাউস নান্দনিকতা (generic arthouse aesthetics)**—যেমন ধীর গতি বা নূন্যতম বর্ণনা—অনুসরণ করার প্রবণতা তৈরি হয়, যা নিজস্ব সাংস্কৃতিক শেকড়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- অথচ বিদ্রুপের বিষয় হলো, বিশ্বজুড়ে সেই ছবিগুলিই সফল হয় যা নিজস্ব **সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় (cultural reality)** গভীরভাবে প্রোথিত। **সত্যজিৎ রায়ের 'অপু ট্রিলজি'** আন্তর্জাতিকভাবে সফল হওয়ার প্রধান কারণ ছিল গ্রামীণ বাংলার প্রতি এর নিখুঁত বিশ্বস্ততা। এটি প্রমাণ করে যে **প্রামাণিকতা বা মৌলিকতা (authenticity)** কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, বরং একটি বড় শক্তি।

বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলন — ভারতের জন্য শিক্ষা (Global Best Practices)

- **দক্ষিণ কোরিয়া:** বং জুন-হোর **'প্যারাসাইট' (২০১৯)** অস্কার জয় করে প্রমাণ করেছে যে, গভীর **সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (cultural specificity)** বজায় রেখেই বিশ্বজয় সম্ভব। দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ও বেসরকারি শিল্প যৌথভাবে আন্তর্জাতিক ডিস্ট্রিবিউশন কাঠামো এবং চলচ্চিত্র উৎসবের প্রচারণায় বিপুল বিনিয়োগ করেছে।
- **ফ্রান্স:** এখানে CNC (Centre national du cinéma) এবং সহ-প্রযোজনা চুক্তির একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা রয়েছে। এটি স্বাধীন নির্মাতাদের সৃজনশীল স্বাধীনতা বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থিক সহায়তা পেতে সাহায্য করে।
- **ইরান:** অভ্যন্তরীণ নানা বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও আসগর ফারহাদির মতো নির্মাতারা আন্তর্জাতিক উৎসব এবং সহ-প্রযোজনার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে **শৈল্পিক প্রামাণিকতা (artistic authenticity)** রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করতে পারে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ — সৃজনশীল স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ভারসাম্য

১. **জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার**

- অস্কার নির্বাচন কমিটির গঠন ও মানদণ্ডে সংস্কার আনতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে স্বচ্ছ, **যোগ্যতা-ভিত্তিক নির্বাচন (merit-based selection)** নিশ্চিত করতে হবে যেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ভাষাগত শিল্পের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

- AMPAS-এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একটির বদলে **বহু-চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার কৌশল (multi-film submission strategy)** গ্রহণ করা উচিত, যাতে ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়।

২. **প্রচার ও ডিস্ট্রিবিউশন কাঠামো তৈরি**

- NFDC এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে আন্তর্জাতিক প্রচারের জন্য একটি **নিবেদিত তহবিল (dedicated fund)** গঠন করতে হবে। এটি কান, বার্লিন বা টরন্টোর মতো বিশ্ববাজারে ছবির প্রচার ও প্রদর্শনীতে সহায়তা করবে।
- ফরাসি CNC মডেলের মতো ভারতের উচিত **আন্তর্জাতিক সহ-প্রযোজনা চুক্তি (co-production treaties)** বৃদ্ধি করা, যাতে স্বাধীন চলচ্চিত্রগুলো বিদেশি অর্থায়ন পায় কিন্তু নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় বজায় রাখে।
- স্বাধীন চলচ্চিত্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে OTT **প্ল্যাটফর্মের (Netflix, MUBI)** ভূমিকা শক্তিশালী করতে হবে।

৩. **সৃজনশীল স্বাধীনতা রক্ষা — সেন্সরশিপের ভারসাম্য**

- CBFC-কে একটি সেন্সরশিপ বডির বদলে কেবল **শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থায় (certification body)** রূপান্তর করতে হবে।
- **শ্যাম বেনেগাল কমিটির (২০১৬)** সুপারিশগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, যেখানে বলা হয়েছিল CBFC কেবল বয়সের ভিত্তিতে ছবির রেটিং দেবে, শৈল্পিক বা রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর বিচার করবে না।
- **১৯(১)(ক) ধারার** অধীনে শৈল্পিক প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে এবং **১৯(২) ধারার** অধীনে 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' যেন প্রশাসনিক বাড়াবাড়িতে পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। একটি **ফিল্ম ওমবাডসম্যান (Film Ombudsman)** বা স্বাধীন আপিল সংস্থা তৈরি করা জরুরি।

৪. **স্বাধীন চলচ্চিত্রের বাস্তুসংস্থান (Ecosystem) গড়ে তোলা**

- রাজ্য সরকারগুলোকে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র উন্নয়ন তহবিল গঠনে উৎসাহিত করতে হবে। ভারতের অস্কার সম্ভাবনা তার **বৈচিত্র্যের (diversity)** মধ্যে নিহিত, অভিন্নতার (uniformity) মধ্যে নয়।
- FTII এবং SRFTI-এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তর্জাতিক উৎসব কৌশল এবং সহ-প্রযোজনা সংক্রান্ত কর্মশালা চালু করতে হবে।
- ইতালি, যুক্তরাজ্য বা জার্মানির মতো দেশগুলোর সাথে ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত সহ-প্রযোজনা চুক্তিগুলোকে বড় বাণিজ্যিক ছবির বদলে স্বাধীন ছবিতে বেশি ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

- অস্কারের নতুন নির্দেশিকা এটিই প্রমাণ করে যে আজকের সিনেমা **জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে (transnational)**। এর কারণ এই নয় যে এটি সাংস্কৃতিক সীমানা মুছে দেয়, বরং এর কারণ হলো **মৌলিক গল্প (authentic stories)** সব দেশের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। 'প্যারাসাইট'-এর শিক্ষা পরিষ্কার—সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে বিচ্যুতি নয়, বরং সেই **শেকড়ে প্রোথিত (rootedness)** থাকাই বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা এনে দেয়।
- ভারতের জন্য এটি একটি অপার সম্ভাবনার মুহূর্ত। তবে এটি তখনই সফল হবে যখন দেশ একটি শক্তিশালী **প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তুসংস্থান (institutional ecosystems)** এবং সৃজনশীল স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারবে, যা ভারতের অসাধারণ চলচ্চিত্র বৈচিত্র্যকে গ্রামের পর্দা থেকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাবে।

Q. Independent cinema plays a crucial role in strengthening democratic discourse and preserving cultural diversity in India. Evaluate. (10 Marks)

1.1.2. জাতীয় জাতিশুমারি (CASTE CENSUS) এবং জাতিহীন সমাজের বিতর্ক

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি **সুপ্রিম কোর্ট** (Supreme Court) ২০২৭ সালের জনশুমারির অধীনে প্রস্তাবিত জাতিশুমারি বন্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।
- আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কতজন **অনগ্রসর** (Backward) মানুষ রয়েছেন এবং কার কল্যাণমূলক সহায়তা প্রয়োজন, তা সরকারের জানা উচিত।
- ২০২৫ সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৩১ সালের পর প্রথমবারের মতো জনশুমারিতে **জাতিভিত্তিক গণনা** (Caste Enumeration) অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জাতিশুমারি কী?

- জাতিশুমারি হলো জাতীয় জনশুমারির অংশ হিসেবে জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে জনসংখ্যার **পদ্ধতিগত তথ্য সংগ্রহ** (Systematic collection of data)। প্রথাগত জনশুমারিতে সাক্ষরতা বা পেশার তথ্য নেওয়া হলেও, জাতিশুমারিতে ব্যক্তি ও পরিবারের সুনির্দিষ্ট জাতি চিহ্নিত করা হয়।
- এটি শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সাথে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক তথ্য (Socioeconomic data) তৈরিতে সাহায্য করে। এই তথ্য **প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ** (Evidence-based policymaking) এবং সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে জাতিভিত্তিক গণনার ঐতিহাসিক বিবর্তন

১. **ঔপনিবেশিক আমল:**

- **১৮৮১ থেকে ১৯৩১:** ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিটি জনশুমারিতে বিস্তারিত জাতিভিত্তিক গণনা করা হতো। **১৯৩১ সালের জনশুমারি**, যাতে ৪,১৪৭টি জাতিগোষ্ঠী নথিভুক্ত ছিল, তা আজও অনগ্রসর শ্রেণি সংক্রান্ত নীতির প্রধান ভিত্তি।
- **১৯৪১ সালের জনশুমারি:** তথ্য সংগ্রহ করা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং **দেশভাগের** (Partition) কারণে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে তথ্যের বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়।

২. **স্বাধীন ভারতের সিদ্ধান্ত:**

- **১৯৫১ সালের জনশুমারি:** স্বাধীনতার পর সরকার **তফসিলি জাতি** (SC) এবং **তফসিলি উপজাতি** (ST) ছাড়া অন্য কোনো জাতির গণনা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি একটি **জাতিহীন সমাজ** (Casteless society) গঠনের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করেছিল।
- ফলে, **অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির** (OBC) তথ্য ১৯৩১ সালের তথ্যের ওপরই থমকে যায়।

৩. **গুরুত্বপূর্ণ কমিশন ও তথ্যের অভাব:**

- **কাকা কালেলকর কমিশন (১৯৫৩):** প্রথম অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন হিসেবে এটি ২,৩৯৯টি অনগ্রসর গোষ্ঠী চিহ্নিত করলেও ১৯৩১ সালের তথ্যের ওপরই নির্ভরশীল ছিল।
- **মন্ডল কমিশন (১৯৭৮-৮০):** ১৯৩১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ওবিসি জনসংখ্যা ৫২% নির্ধারণ করে এবং সরকারি চাকরিতে **২৭% সংরক্ষণের** (27% Reservation) সুপারিশ করে।
- **ইন্দ্র সাহানি মামলা (১৯৯২):** সুপ্রিম কোর্ট ২৭% ওবিসি সংরক্ষণ বহাল রাখে এবং সংরক্ষণের মোট ঊর্ধ্বসীমা **৫০%** (50% Ceiling) নির্ধারণ করে দেয়।

৪. SECC ২০১১ এবং বিহার জাতি সমীক্ষা ২০২৩:

- **আর্থ-সামাজিক ও জাতিভিত্তিক জনশুমারি (SECC) ২০১১:** স্বাধীনতার পর জাতি গণনার প্রথম বড় প্রচেষ্টা হলেও একটি **মানসম্মত জাতি তালিকা (Standardised caste list)** না থাকায় তথ্যে প্রচুর ভুল থেকে যায় এবং তা প্রকাশিত হয়নি।
- **বিহার জাতি সমীক্ষা ২০২৩:** বিহার প্রথম রাজ্য হিসেবে বিস্তারিত জাতি সমীক্ষা প্রকাশ করে। এতে দেখা যায় ওবিসি এবং **অতি অনগ্রসর শ্রেণি (EBC)** মিলিয়ে মোট জনসংখ্যার **৬৩.১৩%**, যা জাতীয় স্তরে জাতিশুমারির দাবিকে নতুন করে জোরালো করে।

জাতিশুমারি বিতর্কে সাংবিধানিক দ্বন্দ্ব

ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো জাতির প্রতি এক দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। একদিকে এটি সমতা ও জাতিহীন সমাজ চায়, অন্যদিকে কল্যাণের জন্য জাতির ওপর নির্ভর করে।

১. **এক পক্ষ: জাতিহীন সমাজের সাংবিধানিক লক্ষ্য**

- সংবিধান সমতা, মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ গড়তে চায়। দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো জাতিভিত্তিক বৈষম্য দূর করে একটি **জাতিহীন সামাজিক ব্যবস্থা (Casteless social order)** গড়ে তোলা।
- **জাতির বিলোপ (Annihilation of Caste)** তত্ত্ব সামাজিক বর্জন দূর করার ওপর জোর দেয়।

২. **অন্য পক্ষ: জাতিভিত্তিক কল্যাণ ও প্রতিনিধিত্ব**

- তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- সামাজিক ন্যায়বিচার ও **প্রতিনিধিত্ব (Representation)** নিশ্চিত করার জন্য অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করা অপরিহার্য।

২০২৭ সালের জাতিশুমারি (Census 2027)

২০২৭ সালের জনশুমারি হবে স্বাধীন ভারতের প্রথম ব্যাপক জাতিভিত্তিক গণনা।

- **ডিজিটাল রূপান্তর:** এটি হবে প্রথম **সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনশুমারি (Fully digital census)**, যা তথ্যের ভুল কমিয়ে আনবে।
- **পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ:** সরকার বর্তমানে একটি **মাস্টার লিস্ট (Master list)** তৈরি করছে যাতে হাজার হাজার উপজাতিকে সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়।

জাতিশুমারির গুরুত্ব

- **সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (ধারা ১৫ ও ১৬):** সুপ্রিম কোর্ট এম. নাগরাজ এবং জার্নাইল সিং মামলায় **পরিমাণযোগ্য অভিজ্ঞতাগত তথ্য (Quantifiable empirical data)** প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। **ধারা ১৬(৪)** অনুযায়ী সংরক্ষণ বজায় রাখতে প্রতিনিধিত্বের অপর্যাপ্ততা প্রমাণ করতে এই তথ্য জরুরি।
- **বৈজ্ঞানিক কল্যাণমূলক লক্ষ্যমাত্রা:** এটি প্রান্তিক উপ-গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে, যা **উপ-শ্রেণিবিন্যাস (Sub-categorization)** বা রোহিনী কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
- **৫০% ঊর্ধ্বসীমা যুক্তিযুক্ত করা:** ইন্দ্র সাহানি মামলার ৫০% সংরক্ষণের সীমা পরিবর্তন বা পুনর্বিবেচনা করতে সঠিক **জনতাত্ত্বিক তথ্যের (Demographic data)** প্রয়োজন।
- **উন্নয়নের সামাজিক অডিট (Social Audit):** গত ৭৫ বছরের সংরক্ষণের ফলে কোন গোষ্ঠী এগিয়েছে এবং কারা আজও **আন্তঃপ্রজন্ম দারিদ্র্যে (Inter-generational poverty)** আটকে আছে, তার অডিট করা সম্ভব হবে।
- **প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন:** ১৯৩১ সালের সেকেলে তথ্যের বদলে বর্তমান চাহিদার ভিত্তিতে সম্পদ বন্টন এবং **আনুপাতিক প্রয়োজন (Proportional need)** নিশ্চিত করা যাবে।

- **প্রাতিষ্ঠানিক ও কেন্দ্রীয় জবাবদিহিতা:** সপ্তম তফসিল অনুযায়ী জনশুমারি **কেন্দ্রীয় তালিকার** (Union List) বিষয়। একটি জাতীয় জাতিশুমারি তথ্যের অভিন্নতা নিশ্চিত করবে এবং NCBC, NCSC ও NCST-এর মতো সংস্থাগুলোকে সাংবিধানিক সুরক্ষা পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী করবে।

জাতিশুমারি পরিচালনার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **রাজনৈতিক অপব্যবহারের ঝুঁকি** (Risk of political misuse): সমালোচকরা মনে করেন যে, জাতির তথ্য **ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতিকে** (Vote-bank politics) তীব্রতর করতে পারে এবং সামাজিক সংহতির পরিবর্তে জাতিভিত্তিক **রাজনৈতিক মেরুকরণকে** (Caste-based mobilisation) উৎসাহিত করতে পারে।
- **তথ্যের গুণমান এবং শ্রেণিবিন্যাসের সমস্যা** (Data quality and classification issues): ভারতে হাজার হাজার জাতি ও উপজাতি রয়েছে। স্ব-ঘোষণা (Self-declaration), বানানগত পার্থক্য এবং উপরিপাতিত পরিচয়ের (Overlapping identities) কারণে SECC 2011-এর মতো এখানেও **অনির্ভরযোগ্য তথ্য** (Unreliable data) তৈরির সম্ভাবনা থাকে।
- **জাতিগত পরিচয়কে শক্তিশালী করা** (Reinforcing caste identity): বিরোধীদের মতে, নাগরিকদের জাতি চিহ্নিত করতে বাধ্য করা তাদের মধ্যে **জাতিগত চেতনা** (Caste consciousness) বাড়িয়ে দিতে পারে, যা একটি **জাতিহীন সমাজের** (Casteless society) সাংবিধানিক লক্ষ্যের পরিপন্থী।
- **গোপনীয়তা এবং অপব্যবহারের উদ্বেগ** (Privacy and misuse concerns): জাতির তথ্যের সাথে অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত তথ্য যুক্ত করা হলে, সুরক্ষার অভাব থাকলে তা **বৈষম্য** (Discrimination), প্রোফাইলিং বা সংবেদনশীল তথ্যের অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
- **পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ** (Methodological challenges): উপজাতিগত বিরোধ, **আন্তঃজাতি বিবাহ** (Inter-caste marriages) এবং মিশ্র ঐতিহ্যের (Mixed heritage) কারণে পরিচয় নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল ও রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল।

ভবিষ্যৎ পন্থা

- **সংবিধিবদ্ধ গোপনীয়তা রক্ষা:** সরকারকে **জনশুমারি আইন, ১৯৪৮** (Census Act, 1948)-এর ১৫ নম্বর ধারা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে ব্যক্তিগত তথ্য **গোপন** (Confidential) থাকে। এটি রাজনৈতিক প্রোফাইলিং রুখতে এবং জনবিশ্বাস বজায় রাখতে অপরিহার্য।
- **মানসম্মত মাস্টার লিস্ট:** ২০১১ সালের ভুল এড়াতে **ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তরকে** (ORGI) সক্রিয়ভাবে একটি ব্যাপক **জাতির মাস্টার লিস্ট** প্রকাশ করতে হবে। এই স্বচ্ছতা গণনার আগেই আঞ্চলিক নামগত অসঙ্গতি দূর করতে সাহায্য করবে।
- **সমন্বিত আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক:** জাতির তথ্যকে সাক্ষরতা, জমির মালিকানা এবং পেশাগত অবস্থার মতো **আর্থ-সামাজিক সূচকের** (Socio-economic indices) সাথে বৈজ্ঞানিকভাবে মানচিত্রায়িত করতে হবে। এটি অনগ্রসরতাকে কেবল জনসংখ্যার ভিত্তিতে নয়, বরং প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।
- **ডিজিটাল সততা ও সামাজিক অডিট:** ভারতের প্রথম **সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনশুমারি** হিসেবে রিয়েল-টাইম তথ্য যাচাইয়ের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। গণনার পর সামগ্রিক তথ্যকে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা **সামাজিক অডিট** (Social audits) করাতে হবে যাতে তা বিচার বিভাগীয় যাচাইয়ে টিকে থাকতে পারে।
- **'জাতিহীন' পরিচয়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** নাগরিকদের **'জাতিহীন'** (Casteless) হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার বিকল্পটিকে উৎসাহিত করতে হবে। এই বিভাগটি ট্র্যাক করা **আধুনিকায়নের** (Modernization) একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হবে, যা আম্বেদকরের **'জাতির বিলোপ'** (Annihilation of Caste) লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করবে।

উপসংহার

জাতিশুমারি মানে জাতিকে উদযাপন করা নয়, বরং এর অমীমাংসিত ফলাফলগুলোর মোকাবিলা করা। ভারত নয় দশকের পুরনো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে একটি **সুষ্ঠু কল্যাণ রাষ্ট্র** (Fair welfare state) গড়তে পারে না। নির্ভুলভাবে জাতি গণনা করা এবং একই সাথে প্রত্যেক নাগরিকের **'জাতিহীন'** পরিচয় দেওয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখাই হলো একটি সৎ পথ, যা শেষ পর্যন্ত এমন এক সমান সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে এই ধরনের গণনার আর প্রয়োজন থাকবে না।

Q. The demand for a caste census reflects the tension between the constitutional vision of a casteless society and the practical need for caste-based welfare policies. Critically examine. 15 Marks

1.2. ভূগোল

1.2.1. ভারতের আবহাওয়া বিভাগের (IMD) ব্লক-ভিত্তিক মৌসুমি বায়ু পূর্বাভাস ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) ১৫টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে একটি **ব্লক-ভিত্তিক মৌসুমি বায়ু পূর্বাভাস ব্যবস্থা** চালু করেছে। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ভারতের **৩,১৯৬টি ব্লকের** জন্য পৃথক পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

নতুন এই পূর্বাভাস ব্যবস্থাটি কী?

- **ক্ষুদ্র স্তরে বিশ্লেষণ** (Granular Scale): এটি প্রথাগত জেলা-ভিত্তিক পূর্বাভাসের গণ্ডি পেরিয়ে ৩,১৯৬টি ব্লকের জন্য পৃথক তথ্য প্রদান করে।
- **সংকর প্রযুক্তি** (Hybrid Technology): এই ব্যবস্থাটি একটি **'ব্লেন্ডেড' বা মিশ্র কাঠামো** ব্যবহার করে, যেখানে প্রথাগত পদার্থবিজ্ঞান-ভিত্তিক মডেলের সাথে **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা** (AI) এবং গত এক শতাব্দীর আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যকে মিলিয়ে দেখা হয়।
- **কার্যকর সময়সীমা** (Actionable Windows): এটি আগামী **চার সপ্তাহের** জন্য একটি সম্ভাব্য পূর্বাভাস দেয়, যা কৃষকদের সঠিক সময়ে বীজ বপন এবং সেচ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- **উচ্চ-রেজোলিউশন ফোকাস:** এটি মূলত **'মৌসুমি বায়ুর মূল অঞ্চল'** (Monsoon Core Zone)-কে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা মৌসুমি বায়ুর সামান্য পরিবর্তনেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

ব্লক-ভিত্তিক পূর্বাভাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- **বৃষ্টির অসমতা দূর করা:** এটি একটি জেলার অভ্যন্তরীণ বৃষ্টির তারতম্যকে চিহ্নিত করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় জেলার এক প্রান্তে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে অথচ অন্য প্রান্তের গ্রামগুলো শুকনো রয়ে গেছে।
- **সঠিক সময়ে বপন** (Precision Sowing): এর ফলে কৃষকরা জেলার গড় বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর না করে নিজের ব্লকের মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী সঠিক সময়ে **বীজ বপন** করতে পারেন।
- **ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কমানো:** অতি-স্থানীয় (Hyper-local) তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এটি বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি অঞ্চলে বিনিয়োগের ঝুঁকি ও ফসলের ক্ষতি কমিয়ে আনে।
- **কৃষি সিদ্ধান্ত গ্রহণে উন্নতি:** এটি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষকদের জন্য একটি ব্যবহারিক সরঞ্জামে পরিণত করে।
- **বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘনঘন ঘটে যাওয়া অতি-স্থানীয় **চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি** মোকাবিলায় এটি একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

ব্লক-ভিত্তিক পূর্বাভাসের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **দুর্বল মৌসুমি বায়ুর জটিলতা: এল নিনো** (El Niño)-র প্রভাবে যখন মৌসুমি বায়ু অনিয়মিত বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়, তখন ব্লক স্তরে সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
- **তথ্যের ঘনত্বের অভাব** (Data Density Gap)**:** ভারত জুড়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক **পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র** না থাকায় বর্তমানে দেশের মাত্র অর্ধেক অংশে এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- **আন্তঃরাজ্য তথ্য আদান-প্রদান:** উচ্চ-রেজোলিউশন মডেলগুলো (যেমন উত্তরপ্রদেশের ১ কিমি স্কেল) সফল করার জন্য রাজ্য সরকারগুলোর পক্ষ থেকে স্থানীয় স্টেশনের তথ্য আবহাওয়া বিভাগকে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
- **প্রযুক্তিগত উত্তরণ:** প্রথাগত মডেলের সাথে **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার** (AI) মিশ্রণকে নিখুঁত রাখতে নিয়মিত প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়।
- **পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা:** সারা দেশে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে বিপুল সংখ্যক **স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন** (AWS) স্থাপন করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **পরিকাঠামো বিস্তার:** ব্লক স্তরে নির্ভুল তথ্য পেতে সব রাজ্যে স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশনের নেটওয়ার্ক বাড়ানো প্রয়োজন।
- **রাজ্যগুলোর সাথে সহযোগিতা:** উত্তরপ্রদেশের মতো অন্যান্য রাজ্যগুলোকেও তাদের স্থানীয় তথ্য শেয়ার করতে উৎসাহিত করতে হবে যাতে **১ কিমি স্কেলের** অতি-নির্ভুল মডেল তৈরি করা যায়।
- **AI ও ফিজিক্স মডেলের সমন্বয়:** চরম আবহাওয়া বা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সঠিক ফলাফল পেতে হাইব্রিড মডেলগুলোর নিয়মিত মানোন্নয়ন প্রয়োজন।
- **কৃষি ব্যবস্থার সাথে সমন্বয়:** ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক এবং কৃষি মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে যাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সরাসরি কৃষকদের জন্য কার্যকরী পরামর্শে রূপান্তরিত হয়।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি:** স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের এবং কৃষকদের এই আধুনিক তথ্য বুঝতে এবং তার ওপর ভরসা করতে শেখানো প্রয়োজন।

উপসংহার

এই ব্লক-ভিত্তিক ব্যবস্থাটি ভারতের **জলবায়ু সহনশীলতার** ক্ষেত্রে এক **যুগান্তকারী পরিবর্তন**। এটি **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার** নির্ভুলতাকে কাজে লাগিয়ে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যকে **খাদ্য নিরাপত্তা** এবং **গ্রামীণ অর্থনীতির** একটি **কৌশলগত বর্ম** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

Q. How can Artificial Intelligence and high-resolution meteorological data transform monsoon forecasting in India? Discuss the opportunities and challenges. 15 Marks

1.3. সংস্কৃতি

1.3.1. বন্দে মাতরম বিতর্ক এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা

ভূমিকা

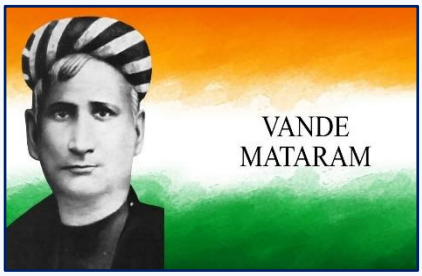

সম্প্রতি সরকারি অনুষ্ঠানে **বন্দে মাতরম** গাওয়া বাধ্যতামূলক করা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা ভারতের **ধর্মনিরপেক্ষতা**, **সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ**, **সাংবিধানিক মূল্যবোধ** এবং **অন্তর্ভুক্তি** নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই বিষয়টি সংখ্যাগুরুবাদী জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের **বহুত্ববাদী পরিচয়ের** মধ্যে এক ধরনের টানাপোড়েনকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

বন্দে মাতরমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

- **সাহিত্যিক উৎস:** এটি ১৮৭০-এর দশকে **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** রচনা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর ১৮৮২ সালের উপন্যাস **'আনন্দমঠ'**-এ অন্তর্ভুক্ত করেন। এই উপন্যাসের পটভূমি ছিল **সন্ন্যাসী বিদ্রোহ**।
- **রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ:** ১৮৯৬ সালের **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** যখন প্রথমবার এটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গেয়েছিলেন, তখন গানটি দেশজুড়ে পরিচিতি পায়।
- **প্রতিরোধের প্রতীক:** ১৯০৫ সালের **বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের** সময় এটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান স্লোগান এবং সংগীতে পরিণত হয়।
- **১৯৩৭ সালের ঐকমত্য:** গানের পরবর্তী স্তবকগুলো নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীলতা দূর করতে জওহরলাল নেহরু ও মাওলানা আজাদকে নিয়ে গঠিত কংগ্রেস কমিটি শুধুমাত্র **প্রথম দুটি স্তবক** গাওয়ার সুপারিশ করেছিল, যা মূলত জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়।
- **গণপরিষদের স্বীকৃতি:** ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ একে **'জাতীয় সংগীত'** (National Song) হিসেবে ঘোষণা করেন এবং 'জন গণ মন'-এর মতোই **সমান মর্যাদা** প্রদান করেন।

বন্দে মাতরমের সাংবিধানিক ও আইনি দিক

- **১৯৫০ সালের রাষ্ট্রপতির বিবৃতি:** সংবিধানে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীতের সমান মর্যাদা দেন।
- **আইনি শাস্তির অভাব:** জাতীয় সংগীত (National Anthem) যেমন **'প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার অ্যাক্ট, ১৯৭১'** দ্বারা সুরক্ষিত, বন্দে মাতরম বা জাতীয় সংগীতের (National Song) ক্ষেত্রে এমন কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় আইন নেই যা গানটি না গাইলে বা না দাঁড়ালে শাস্তির বিধান দেয়।
- **৫১এ অনুচ্ছেদ (মৌলিক কর্তব্য):** সংবিধানে নাগরিকদের "জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে (National Anthem) শ্রদ্ধা করার" কথা বলা হলেও, **জাতীয় সংগীত (National Song)** সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। ফলে এটি বাধ্যতামূলক কি না, তা নিয়ে আইনি বিতর্ক রয়েছে।

জাতীয় সংগীত (National Anthem) বনাম জাতীয় গান (National Song)

আলোচনার দিক	জাতীয় সংগীত (National Anthem)	জাতীয় গান (National Song)
অফিসিয়াল নাম	**জন গণ মন**	**বন্দে মাতরম**
সাংবিধানিক স্বীকৃতি	আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত	সমান মর্যাদা থাকলেও সংবিধানে সরাসরি উল্লেখ নেই
শ্রদ্ধা জানানো	আইন এবং প্রচলিত রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত	বাধ্যতামূলক করার মতো কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই
চরিত্র	অন্তর্ভুক্তিমূলক **নাগরিক জাতীয়তাবাদ**	**সাংস্কৃতিক-জাতীয়** প্রতীকবাদ

বন্দে মাতরম কেন বিতর্কিত?

- **ধর্মীয় চিত্রকল্প:** গানের পরবর্তী স্তবকগুলোতে জন্মভূমিকে **দুর্গা ও লক্ষ্মী** দেবীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা অনেকের মতে ইসলাম বা অন্য একেশ্বরবাদী ধর্মের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে।
- **সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট:** 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কাহিনীতে গানটি মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে **সন্ন্যাসী বিদ্রোহের** প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে, যা সমালোচকদের মতে মুসলিম বিরোধী ঐতিহাসিক পক্ষপাত বহন করে।
- **সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীলতা:** প্রথম দুই স্তবকে কেবল প্রকৃতির বর্ণনা থাকলেও, পুরো গানটির সাথে **হিন্দু জাতীয়তাবাদের** ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকায় এটি দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল্যবোধ:** বিরোধী দলগুলোর যুক্তি হলো, সরকারি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকা গান বাধ্যতামূলক করা ভারতের সংবিধানের **ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদী** কাঠামোর পরিপন্থী।
- **বাধ্যতামূলক চাপ:** ২০২৬ সালে ভারত সরকারের নতুন নির্দেশিকা, যা গানের **পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ** গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে, তা দেশপ্রেমকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা নাকি রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া প্রথা হওয়া উচিত—সেই বিতর্ককে পুনরায় উস্কে দিয়েছে।

সামনের পথ

- **১৯৩৭ সালের ঐকমত্য মেনে চলা:** শুধুমাত্র **প্রথম দুটি স্তবক** গাওয়ার নীতি অগ্রাধিকার দিলে এটি জন্মভূমির প্রতি এক ঐক্যবদ্ধ শ্রদ্ধা হিসেবে বজায় থাকবে এবং ধর্মীয় বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে।
- **স্বেচ্ছামূলক বনাম বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ:** দেশপ্রেমকে রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া নিয়মের পরিবর্তে একটি **স্বেচ্ছামূলক নাগরিক গুণ** হিসেবে উৎসাহিত করা উচিত, যা সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত **'বিবেকের স্বাধীনতা'** রক্ষা করবে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতীক:** জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন **বহুত্ববাদী প্রতীক** ব্যবহার করলে তা 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' হিসেবে ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করবে।
- **শিক্ষা ও ঐতিহাসিক সচেতনতা:** উনিশ শতকের উপন্যাসের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে এই গানের রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যকার পার্থক্য সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে জানানো প্রয়োজন।
- **প্রোটোকল নিয়ে বিচার বিভাগীয় স্পষ্টতা:** জাতীয় এবং রাজ্য সংগীতের প্রোটোকল সম্পর্কে **সুপ্রিম কোর্টের** নির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকলে তা বিভিন্ন সরকারের ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ এবং কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ কমাতে সাহায্য করবে।

উপসংহার

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে **ঐতিহাসিক প্রতীক** এবং **সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার** মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর। একটি **বহুত্ববাদী** দৃষ্টিভঙ্গি, যা একইসাথে **ফেডারেল বা আঞ্চলিক পরিচয়** এবং **জাতীয় ঐতিহ্যকে** সম্মান করবে, তাই পারে সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করতে এবং ভারতের **বহু-সাংস্কৃতিক** ভিত্তি রক্ষা করতে।

Q. "The debate surrounding Vande Mataram reflects the larger tension between cultural nationalism and constitutional secularism in India." Discuss. 15 Marks

***

Scan to attempt more questions...

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি **দিল্লি হাইকোর্ট** "ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি অনেক সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ছাড়িয়ে **প্রকাশ্যে অপমান করার হাতিয়ার** হয়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম কী?

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে সাধারণ নাগরিকরা ডিজিটাল মাধ্যম—প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে—এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এবং **"শাস্তি"** দেওয়ার চেষ্টা করে, যাদের তারা কোনো আইনি বা নৈতিক অপরাধে দোষী বলে মনে করে। সাধারণ ভিজিল্যান্টিজমে শারীরিক সংঘাত হতে পারে, কিন্তু ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম মূলত **তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার** করে কাজ করে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের মূল বৈশিষ্ট্য

- **ক্রাউডসোর্সড অ্যাকশন (Crowdsourced Action):** এতে প্রায়ই "পাইল-অন" প্রভাব দেখা যায়, যেখানে হাজার হাজার অপরিচিত মানুষ একটি অভিযোগ শেয়ার করে, মন্তব্য করে এবং সেটিকে ছড়িয়ে দেয়।
- **ডক্সিং (Doxxing):** এটি একটি সাধারণ কৌশল যেখানে লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য (বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর, কর্মস্থল) ইন্টারনেটে ফাঁস করে দেওয়া হয় যাতে তাকে বাস্তবে হয়রানি করা যায়।
- **পাবলিক শেমিং (Public Shaming):** এর মূল লক্ষ্য থাকে প্রায়ই **"সামাজিক মৃত্যু"**—অর্থাৎ একজন ব্যক্তির সম্মান, জীবিকা বা সামাজিক অবস্থান ধ্বংস করা।
- **আইনি প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া (Bypassing Due Process):** এটি প্রচলিত আইনি ব্যবস্থার বাইরে কাজ করে এবং একই সাথে তদন্তকারী, বিচারক ও জল্লাদের ভূমিকা পালন করে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের আইনি ও সাংবিধানিক দিক

- **মৌলিক অধিকার:** সংবিধানের **ধারা ১৯(১)(এ)** অনলাইনে মতপ্রকাশের অধিকার দেয়, তবে **ধারা ১৯(২)** রাষ্ট্রকে মানহানি, জনশৃঙ্খলা রক্ষা বা নৈতিকতার স্বার্থে এই অধিকারের ওপর **"যৌক্তিক বিধিনিষেধ"** আরোপ করার অনুমতি দেয়।
- **সম্মানের অধিকার:** সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে যে, একজন ব্যক্তির সম্মান বা খ্যাতি **ধারা ২১**-এর অধীনে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাকে যথেচ্ছ সামাজিক অপমান থেকে রক্ষা করে।
- **প্রাকৃতিক ন্যায়ের নীতি (Principles of Natural Justice):** এটি অভিযুক্তের **পক্ষ সমর্থনের সুযোগ** এবং **দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ** গণ্য হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। ডিজিটাল জনতা (Mob) তাৎক্ষণিক "রায়" দিয়ে এই নীতিগুলো লঙ্ঘন করে।
- **প্রাসঙ্গিক আইনি বিধান:** IPC-**এর ৪৯৯-৫০০ ধারা** মানহানির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার দেয়। অন্যদিকে, IT Act বা তথ্যপ্রযুক্তি আইন প্ল্যাটফর্মগুলোর দায়বদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবৈধ কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম কেন সৃষ্টি হয়?

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম মূলত **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার** একটি উপজাত (Byproduct) হিসেবে আবির্ভূত হয়। যখন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা সময়মতো বা কার্যকর সমাধান দিতে পারে না, তখন জনগণ নিজেরাই বিচার করতে রাস্তায় (বা ইন্টারনেটে) নামে।

- **পদ্ধতিগত উদাসীনতা:** পুলিশ, বিচার বিভাগ বা বড় সংস্থাগুলোর ওপর মানুষের আস্থার অভাব। মানুষ মনে করে যে যৌন হয়রানি বা দুর্নীতির মতো অভিযোগের প্রতিকার তারা দ্রুত বা সঠিকভাবে পাবে না।
- **জবাবদিহিতার অভাব:** যেখানে আইনি ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এটি পাবলিক শেমিং বা সামাজিক অপমানের মাধ্যমে ধীরগতির প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।
- **যৌথ অসহায়ত্ব:** সাধারণ মানুষ ব্যবস্থার কাছে নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করে; ডিজিটাল "মব" বা জনতা তাদের মধ্যে একটি ক্ষমতায়নের অনুভূতি এবং তাৎক্ষণিক মানসিক প্রশান্তি তৈরি করে।
- **প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতা:** ইন্টারনেটের ছদ্মনাম, গতি এবং বিশাল পরিধি প্রচলিত বাধাগুলোকে এড়িয়ে খুব কম খরচে বড় ধরনের **"প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা"** নেওয়ার সুযোগ করে দেয়।
- **সংহতির সন্ধান:** যখন ভুক্তভোগীরা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে অবহেলিত বা দোষারোপের শিকার হন, তখন তারা ডিজিটাল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমর্থন এবং স্বীকৃতি খোঁজেন।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের ইতিবাচক দিক

- **নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর:** এটি বিচারের গণতন্ত্রীকরণ করে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষজন পক্ষপাতদুষ্ট আইনি বাধা এড়িয়ে সরাসরি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে পারে। এই **"বিশাল সমতাকারী" (Great Equalizer)** ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করে যে, যাদের সামাজিক প্রতিপত্তি নেই তারাও যেন জনসাধারণের সমর্থন ও স্বীকৃতি পায়।
- **জবাবদিহিতার কৌশল:** ইন্টারনেটে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে প্রতিষ্ঠানের সুনামের ঝুঁকি তৈরি হয়। এটি উদাসীন কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থাগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। যেখানে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ সেল বা তদারকি কমিটি ব্যর্থ হয়, সেখানে এটি সেই শূন্যতা পূরণ করে।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো জনসমক্ষে আনার ফলে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও বৈষম্যের মতো পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো নিয়ে সমাজে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়। এই **যৌথ দৃশ্যমানতা** অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী নীতি পরিবর্তন এবং আইনি সংস্কারের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
- **গতি:** যেখানে আইনি লড়াই শেষ হতে বছরের পর বছর সময় লাগে, সেখানে **"জনসাধারণের আদালত"** তাৎক্ষণিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেয়। এই দ্রুত প্রতিক্রিয়া ভুক্তভোগীকে মানসিক শান্তি দেয় এবং রিয়েল-টাইমে অপরাধ বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **প্রাকৃতিক ন্যায়ের লঙ্ঘন:** এতে প্রায়ই **"Audi alteram partem"** (অপর পক্ষের কথা শোনা) নীতিটি উপেক্ষা করা হয়। ইন্টারনেট এখানে একপাক্ষিক ট্রাইব্যুনাল হিসেবে কাজ করে যেখানে অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় না। এর ফলে একটি "প্রমাণিত হওয়ার আগেই দোষী" পরিবেশ তৈরি হয়, যা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে।
- **মিডিয়া ট্রায়াল:** জনমত এবং ইন্টারনেটের ক্ষোভ কার্যকরভাবে আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রক্রিয়ার জায়গা দখল করে নেয়। কোনো তথ্য আইনত পরীক্ষা করার আগেই "রায়" দিয়ে দেওয়া হয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং সমাজের চোখে আগেভাগেই একজনকে অপরাধী বানিয়ে ফেলে।
- **মিথ্যা অভিযোগ:** সোশ্যাল মিডিয়ায় সঠিক যাচাইকরণ ব্যবস্থার অভাবে ভিত্তিহীন বা বিদ্বেষমূলক দাবিগুলো অবাধে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে **অপূরণীয় সম্মানের হানি** হওয়ার ঝুঁকি থাকে, কারণ পরে যদি কোনো ভুল সংশোধনও করা হয়, তা মূল ভাইরাল হওয়া মিথ্যার মতো সমান সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায় না।

- **উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতা:** অনলাইন ক্ষোভ দ্রুত **"ডিজিটাল লিঞ্চিং"** বা গণপিটুনিতে রূপ নিতে পারে। যেখানে যৌথ ক্রোধ শেষ পর্যন্ত হয়রানি, পিছু নেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকিতে পরিণত হয়। এই আক্রমণাত্মক পরিবেশ গঠনমূলক বিচারের চেয়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
- **গোপনীয়তা লঙ্ঘন (Privacy Violations): "ডক্সিং"** (Doxxing) বলতে কারও ব্যক্তিগত তথ্য যেমন—বাড়ির ঠিকানা বা ব্যক্তিগত কন্টাক্ট নম্বর ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করাকে বোঝায়। ব্যক্তিগত তথ্যের এই অপব্যবহার ব্যক্তি ও তার পরিবারকে শারীরিক ঝুঁকির মুখে ফেলে এবং গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।
- **বাক-স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব:** ডিজিটাল মব বা "সামাজিক অপমানের" শিকার হওয়ার ভয়ে অনেকে ভিন্নমত বা অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে সাহস পান না। এর ফলে মানুষ নিজের ওপর নিজেই সেন্সরশিপ আরোপ করে, যা উন্মুক্ত আলোচনাকে স্তব্ধ করে দেয় এবং সুস্থ সামাজিক বিতর্কের জায়গা সংকুচিত করে।

কেস স্টাডি

বিমান পরিষেবা বিভ্রাট (২০২২): এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটের বিজনেস ক্লাসে একজন পুরুষ যাত্রী এক বৃদ্ধার গায়ে প্রস্রাব করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনরোষ তৈরি হওয়ার পরই কেবল বিমান সংস্থাটি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল।

পথনির্দেশ

- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকার শক্তিশালী করা:** ভুক্তভোগীরা যেন সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারস্থ না হয়, সেজন্য প্রতিটি সংস্থায় শক্তিশালী ও সময়োপযোগী অভিযোগ কেন্দ্র (যেমন- **অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি** বা **"নো-ফ্লাই" লিস্ট**) কার্যকর করা প্রয়োজন।
- **বিচার বিভাগ ও পুলিশ সংস্কার:** আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করতে হবে এবং পুলিশ বাহিনীকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। এতে বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ফিরবে এবং আদালতই বিচারের প্রধান জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
- **ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা:** গণমাধ্যম এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের উচিত কোনো অভিযোগ প্রচার করার আগে তা ভালভাবে যাচাই করা (Verification-First)। এতে ভুল তথ্য ছড়ানো এবং কারও সম্মানহানি রোধ করা সম্ভব হবে।
- **DPDP আইন ও RTBF-এর প্রয়োগ: ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন (DPDP Act, 2023)** এবং **"ভুলে যাওয়ার অধিকার" (Right to be Forgotten)** কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে, যাতে মানুষ মিথ্যা বা পুরনো অপমানজনক তথ্য ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।
- **ধারা ১৯ এবং ২১-এর মধ্যে ভারসাম্য:** রাষ্ট্রকে এমন নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে যা বৈধ অনলাইন সক্রিয়তা এবং ক্ষতিকর ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নিশ্চিত করতে হবে যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (ধারা ১৯) কারও ন্যায্য বিচারের অধিকারকে (ধারা ২১) নষ্ট না করে।

উপসংহার

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম হলো প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতার একটি লক্ষণ। আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে আমাদের অবশ্যই আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, দ্রুত এবং সহানুভূতিশীল করতে হবে, যাতে **"মব জাস্টিস"** বা গণবিচার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

Q. "Digital vigilantism is less a problem of social media excess and more a reflection of institutional failure." Critically examine. 15 Words

2.1.2. দলত্যাগ বিরোধী আইনের সংকট: দশম তফসিলের পুনর্মূল্যায়ন

ভূমিকা

- সম্প্রতি **রাজ্যসভায়** একটি রাজনৈতিক দলের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি প্রতিনিধির অন্য দলে যোগদানের ঘটনা **দশম তফসিলের** কার্যকারিতা নিয়ে একটি গভীর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনাটি এমন একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে তুলে ধরে যেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা **সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলিকে** আইনি চতুরতার মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা আদতে **গণতান্ত্রিক জনম্যান্ডেটের** (Democratic Mandate) পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করছে।

ভারতের দশম তফসিলের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

১. দশম তফসিল কী?

- **দশম তফসিল** হল একটি সাংবিধানিক বিধান যা **১৯৮৫ সালের ৫২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের** মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছিল। একে সাধারণত **দলত্যাগ বিরোধী আইন** (Anti-Defection Law) বলা হয়।
- এই তফসিলটি সংসদের উভয় কক্ষের পাশাপাশি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- সহজ কথায়, দশম তফসিলে সেই নিয়মগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে যার অধীনে একজন নির্বাচিত আইনপ্রণেতাকে **দলত্যাগের অভিযোগে** অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে; অর্থাৎ, যদি তারা সেই দলটিকে ত্যাগ করেন বা বিশ্বাসভঙ্গ করেন যার টিকিটে তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই অযোগ্যতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কক্ষের **প্রিসাইডিং অফিসার** (Presiding Officer) নির্ধারণ করেন।

২. দলত্যাগ বিরোধী আইনের প্রেক্ষাপট

- **রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং "আয়া রাম, গয়া রাম":** দলত্যাগ বিরোধী আইনের উৎস ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে অনেক ভারতীয় রাজ্যে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নিহিত। **"আয়া রাম, গয়া রাম"** বাক্যাংশটি এই যুগের প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানার একজন বিধায়ক এক দিনেই তিনবার তার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেন, যা প্রমাণ করে যে আইনপ্রণেতারা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্যকে জনসেবার বদলে ব্যক্তিগত উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিলেন।
- **দলত্যাগের ফলাফল এবং মাত্রা:** অনিয়ন্ত্রিত দলত্যাগের ফলে সরকার পতন, বারবার **রাষ্ট্রপতি শাসন** জারি এবং আইনসভার বিশ্বস্ততা নষ্ট হতে থাকে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে প্রায় ১৪০টিরও বেশি দলত্যাগের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছিল।
- **কমিটির সুপারিশ এবং আইনি প্রতিক্রিয়া:** ১৯৬৮ সালের **ওয়াই.বি. চ্যবন কমিটি** (Y.B. Chavan Committee) শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থার সুপারিশ করে। এর ফলে ১৯৮৫ সালে ৫২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দশম তফসিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **৯১তম সংশোধনীর (২০০৩) মাধ্যমে শক্তিশালীকরণ:** ২০০৩ সালের **৯১তম সংবিধান সংশোধনী আইন** এই আইনটিকে আরও কঠোর করে তোলে। এটি 'বিভাজন' (Split) বা এক-তৃতীয়াংশের দলত্যাগের নিয়মটি বাতিল করে এবং একটি বৈধ একীভূতকরণের (Merger) জন্য আইনসভা দলের **দুই-তৃতীয়াংশ** সদস্যের সম্মতির সীমা নির্ধারণ করে।

৩. সাংবিধানিক বিধানসমূহ (Constitutional Provisions)

দশম তফসিল সংবিধানের আরও কয়েকটি ধারার সাথে একত্রে কাজ করে যা দলত্যাগ বিরোধী আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গঠন করে:

- **ধারা ১০২(২):** সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে যদি তারা দশম তফসিলের অধীনে অযোগ্য হন।
- **ধারা ১৯১(২):** রাজ্য বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সদস্যদের জন্য একই ধরনের অযোগ্যতার বিধান দেয়।
- **ধারা ১৩৬:** অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে স্পিকার বা চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার জন্য **বিশেষ লিভ পিটিশন** (Special Leave Petition) মঞ্জুর করার ক্ষমতা দেয়।
- **ধারা ২২৬:** প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘন বা সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘনের ভিত্তিতে দশম তফসিলের অধীনে নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর হাইকোর্টকে **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার** (Judicial Review) ক্ষমতা প্রদান করে।

৪. **৯১তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০০৩**

এই সংশোধনীটি 'বিভাজন' (Split)-এর ব্যতিক্রমটি বিলুপ্ত করে এবং একীভূতকরণের (Merger) সীমা আইনসভা দলের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে বাড়িয়ে **দুই-তৃতীয়াংশ** করে দলত্যাগ বিরোধী আইনকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও, এটি মন্ত্রীসভার আকার সংশ্লিষ্ট কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার **১৫% শতাংশের** মধ্যে সীমাবদ্ধ করার নিয়ম চালু করে।

দলত্যাগ বিরোধী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিল)

১. **অযোগ্যতার শর্তাবলি:** কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য যদি **স্বেচ্ছায়** তার দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, তবে তিনি আইনসভার সদস্যপদ হারাবেন। এ ছাড়াও, যদি কোনো সদস্য দলের নির্দেশ বা **হুইপ** (Whip) অমান্য করে ভোট দেন অথবা ভোটদান থেকে বিরত থাকেন (দলের আগাম অনুমতি ছাড়া), তবে তিনি **অযোগ্য** বলে বিবেচিত হবেন। তবে দলটি যদি ১৫ দিনের মধ্যে ওই সদস্যকে ক্ষমা বা **মার্জনা** (Condone) করে, তবে সদস্যপদ বহাল থাকে।

২. **স্বতন্ত্র সদস্যদের জন্য নিয়ম:** একজন **স্বতন্ত্র সদস্য**, যিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি নির্বাচনের পর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে সদস্যপদ হারাবেন।

৩. **মনোনীত সদস্যদের জন্য নিয়ম:** একজন **মনোনীত সদস্য** আইনসভায় আসন গ্রহণের দিন থেকে **ছয় মাসের** মধ্যে যেকোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন। তবে এই ছয় মাস সময়সীমা পার হওয়ার পর কোনো দলে যোগ দিলে তিনি **অযোগ্য** ঘোষিত হবেন।

৪. **অযোগ্যতা যেখানে প্রযোজ্য নয় (ব্যতিক্রমসমূহ):**

- **দলের একীভূতকরণ:** যদি কোনো দলের অন্তত **দুই-তৃতীয়াংশ** (Two-thirds) সদস্য অন্য কোনো দলের সাথে একীভূত হতে রাজি হন, তবে তাদের দলত্যাগের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না।
- **প্রিসাইডিং অফিসার:** যদি কোনো সদস্য হাউসের **স্পিকার বা চেয়ারম্যান** (Presiding Officer) নির্বাচিত হন, তবে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সাময়িকভাবে নিজের দল ত্যাগ করতে পারেন। পদ ছাড়ার পর তিনি পুনরায় দলে ফিরতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তাকে অযোগ্য করা হবে না।

৫. **সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ:** দশম তফসিলের অধীনে অযোগ্যতা সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন সংশ্লিষ্ট কক্ষের **স্পিকার বা চেয়ারম্যান**। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেন না এবং এটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলে না।

৬. **নিয়ম তৈরির ক্ষমতা:** প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর করার জন্য নিয়ম তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। তবে প্রিসাইডিং অফিসার নিজে থেকে কোনো মামলা শুরু করতে পারেন না; হাউসের অন্য কোনো সদস্য **লিখিত অভিযোগ** জমা দিলেই কেবল ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

৭. **হুইপের ভূমিকা: হুইপ** হলেন সেই ব্যক্তি যিনি দলের সদস্যদের কাছে দলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান পৌঁছে দেন এবং নির্দেশ অনুযায়ী ভোটদান নিশ্চিত করেন। যদি কোনো সদস্য হুইপ অমান্য করেন, তবে তার বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনের অধীনে **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা** নেওয়া যেতে পারে।

দলত্যাগ বিরোধী আইন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় রায়

- **কিহোটো হোল্লোহান বনাম জাচিলু (১৯৯২):** সুপ্রিম কোর্ট দশম তফসিলের **সাংবিধানিক বৈধতা** বহাল রাখে। আদালত স্পষ্ট করে যে, স্পিকারের সিদ্ধান্ত **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার** (Judicial Review) আওতাধীন। তবে স্পিকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই কেবল আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে।
- **রাজেন্দ্র সিং রানা বনাম স্বামী প্রসাদ মৌর্য (২০০৭):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, স্পিকার অযোগ্যতার আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত নিতে **অনির্দিষ্টকাল দেরি** করতে পারেন না। এই ধরনের অযৌক্তিক বিলম্ব সাংবিধানিক কর্তব্য পালনে অবহেলা হিসেবে গণ্য হবে।
- **সুভাষ দেশাই বনাম প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (২০২৩):** আদালত **আইনসভা দল** (Legislature Party) এবং **রাজনৈতিক দলের** (Political Party) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে। এতে বলা হয়, রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তই আইনপ্রণেতাদের ওপর বাধ্যতামূলক এবং আইনসভা দলের মধ্যে বিদ্রোহ মানেই 'একীভূতকরণ' বা মার্জার নয়।
- **জি.ভি. কৃষ্ণমূর্তি বনাম ভারত সরকার (২০২৩):** সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় জোর দিয়ে বলে যে, অযোগ্যতার মামলাগুলো **যুক্তিসঙ্গত সময়ের** মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা গ্রহণযোগ্য নয়।

দশম তফসিলের গুরুত্ব

- **স্থিতিশীল সরকার নিশ্চিতকরণ:** ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারকে আইনসভায় **সংখ্যাগরিষ্ঠতা** (Majority) বজায় রাখতে হয়। দলত্যাগকে সীমিত করার মাধ্যমে দশম তফসিল রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধ করতে সাহায্য করে এবং নির্বাচিত সরকারকে অন্যায়ভাবে **ক্ষমতাচ্যুত** (Toppled) হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **রাজনৈতিক দুর্নীতি হ্রাস:** ভারতে দলত্যাগ প্রায়শই বিভিন্ন **প্রলোভন** (Inducements)—যেমন আর্থিক সুবিধা, মন্ত্রী পদ, আইনি প্রক্রিয়া থেকে সুরক্ষা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত লাভের সাথে জড়িত থাকে। **দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন** (2nd ARC, 2008) এই ধরনের প্রলোভন-ভিত্তিক দলত্যাগকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির অন্যতম দূষিত প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দলত্যাগ বিরোধী আইন এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি **সাংবিধানিক প্রতিরোধক** (Constitutional Deterrent) হিসেবে কাজ করে।
- **রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ:** একটি সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলো শাসনের **সাংগঠনিক মেরুদণ্ড** (Organisational Backbone) গঠন করে। যখন আইনপ্রণেতারা তাদের দলের ইশতেহার বা প্ল্যাটফর্মের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন, তখন দলগুলো সুসংগত এবং **জবাবদিহিমূলক** (Accountable) অবস্থান বজায় রাখতে উৎসাহিত হয়। এটি শেষ পর্যন্ত সুশাসন এবং সঠিক নীতি নির্ধারণে (Policy-making) সহায়তা করে।
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য রক্ষা:** এই আইনটি বহিরাগত রাজনৈতিক প্রভাবে রাজ্য সরকারগুলোকে অস্থিতিশীল করার অপব্যবহার রোধ করতে সাহায্য করে। এটি ভারতের **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে** (Federal Structure) সমর্থন করে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে।

দলত্যাগ বিরোধী আইনের সমালোচনা

- **বাক-স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা (ভিন্নমত দমন):** এই আইন আইনপ্রণেতাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি এবং **বিবেক** (Conscience) অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে। সদস্যরা প্রায়শই দলের নির্দেশ বা **দলীয় লাইন** (Party Line) মেনে চলতে বাধ্য হন, এমনকি যখন সেটি তাদের নিজস্ব বিশ্বাস বা নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়।
- **দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের দুর্বলতা** (Weakening of Intra-Party Democracy)**:** দলত্যাগের জন্য শাস্তির বিধান রেখে এই আইন সদস্যদের ওপর দলীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্তিশালী করে। এটি আইনপ্রণেতাদের নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বা অভ্যন্তরীণ মতভেদ প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত করে, যার ফলে দলের ভেতরে **গণতান্ত্রিক বিতর্ক** (Democratic Debate) হ্রাস পায়।

- **রাজনৈতিক দলের খণ্ডিতকরণকে উৎসাহিত করা (Encouragement of Party Fragmentation):** অযোগ্যতা থেকে বাঁচতে রাজনীতিবিদরা নতুন দল গঠন করতে পারেন বা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হতে পারেন, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার **খণ্ডিতকরণ (Fragmentation)** ঘটায়। এর ফলে স্থিতিশীল সরকার গঠন এবং কার্যকর নীতি রূপায়ন কঠিন হয়ে পড়ে।
- **প্রিসাইডিং অফিসারের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ (Concerns Regarding the Role of the Presiding Officer):** স্বচ্ছতার অভাব এবং সম্ভাব্য **পক্ষপাতদুষ্টতার (Bias)** কারণে স্পিকার বা চেয়ারম্যানের ভূমিকা সমালোচিত হয়েছে। যেহেতু আইনের বিধানগুলো ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়, তাই নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—বিশেষ করে যখন বিচার চলাকালীন **বিচার বিভাগীয় তদারকি (Judicial Oversight)** সীমিত থাকে।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন

- **যুক্তরাজ্য (United Kingdom):** যুক্তরাজ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক দলত্যাগ বিরোধী আইন নেই। পরিবর্তে, আইনপ্রণেতাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে তারা শক্তিশালী **রাজনৈতিক কনভেনশন (Political Conventions)**, দলীয় শৃঙ্খলা এবং ভোটারদের প্রতি **জবাবদিহিতার (Accountability)** ওপর নির্ভর করে।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa):** দক্ষিণ আফ্রিকায় আগে নিয়ন্ত্রিত শর্তে 'ফ্লোর ক্রসিং' বা দলবদলের অনুমতি ছিল; তবে এর ব্যাপক অপব্যবহারের কারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই বিধানটি শেষ পর্যন্ত **বাতিল (Abolished)** করা হয়।
- **বাংলাদেশ (Bangladesh):** বাংলাদেশে অত্যন্ত **কঠোর দলত্যাগ বিরোধী আইন** রয়েছে। সেখানে দলের নির্দেশনার বিরুদ্ধে ভোটদান থেকে বিরত থাকলেও সদস্যপদ বাতিল বা অযোগ্য ঘোষণা হতে পারে, যা দলের অভ্যন্তরে কঠোর শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে।
- **জার্মানি – কনস্ট্রাকটিভ ভোট অফ নো কনফিডেন্স:** জার্মান সংবিধানের (Basic Law) **ধারা ৬৭** এর অধীনে, একটি সরকারকে কেবল তখনই ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব যদি আইনসভা একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে একজন নতুন চ্যান্সেলর নির্বাচিত করে। এটি **সুবিধাবাদী দলত্যাগ (Opportunistic Defections)** রোধ করে এবং কেবল একটি কার্যকর বিকল্প সরকার থাকা সাপেক্ষে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ দিয়ে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যৎ পথ: দলত্যাগ বিরোধী আইনকে শক্তিশালীকরণ

- **সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে একীভূতকরণ (Merger) সংক্রান্ত ধারা স্পষ্ট করা:** সংসদের উচিত আইনটি সংশোধন করে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যে, একটি বৈধ একীভূতকরণ বা মার্জার অবশ্যই **সমগ্র রাজনৈতিক দলের (Political Party)** অনুমোদিত বডি দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কেবল আইনসভা দলের (Legislature Party) দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা নয়। এটি বর্তমানে বিদ্যমান আইনি ফাঁকফোকরগুলি বন্ধ করতে সাহায্য করবে।
- **অযোগ্য ঘোষণার ক্ষমতা একটি স্বাধীন সংস্থার হাতে অর্পণ:** অযোগ্যতা সংক্রান্ত মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা স্পিকার বা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সরিয়ে একটি **স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের** হাতে দেওয়া উচিত। ল কমিশন (১৭০তম রিপোর্ট, ১৯৯৯) এবং সংবিধানের কার্যকারিতা পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কমিশন (২০০২) উভয়ই এই ভূমিকা **ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI)** বা একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে দেওয়ার সুপারিশ করেছে।
- **সময়াবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা:** একটি আইনি বিধান থাকা উচিত যেখানে সমস্ত অযোগ্যতার আবেদন **৩ মাসের নির্দিষ্ট সময়ের** মধ্যে নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক হবে। যদি প্রিসাইডিং অফিসার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন, তবে মামলাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন কমিশন বা ট্রাইব্যুনালের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া উচিত।
- **দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রসার:** দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (২০০৮)-এর পরামর্শ অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে **অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র (Intra-Party Democracy)** প্রয়োগের জন্য নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা থাকলে জোরপূর্বক দলত্যাগের প্রবণতা হ্রাস পাবে।

- **কঠোর নির্বাচনী প্রতিবন্ধক (Electoral Deterrent) তৈরি:** দলত্যাগের কারণে অযোগ্য ঘোষিত সদস্যদের অন্তত **৫ বছরের জন্য** নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে নিষিদ্ধ করা উচিত। এটি দলত্যাগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে এবং সুবিধাবাদী দলবদলকে নিরুৎসাহিত করবে।
- **সময়োপযোগী বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ:** ভারতের সুপ্রিম কোর্টের উচিত **ধারা ১৪২ (Article 142)** এর অধীনে তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে এই ধরনের মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা এবং স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা।

উপসংহার

দশম তফসিল একটি **সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional Guarantee)** হিসেবে কাজ করে যাতে নির্বাচনের পরবর্তী সুবিধাবাদের মাধ্যমে ভোটারের ম্যান্ডেট বা রায় বিশ্বাসঘাতকতার শিকার না হয়। তবে ভুল ব্যাখ্যা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কারণে এর যে অবক্ষয় ঘটছে, তা নিরসনে জরুরি ও অর্থবহ সংস্কার প্রয়োজন। ভারতের গণতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বমূলক রাখতে আইনি স্পষ্টতা, একটি **স্বতন্ত্র বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা (Independent Adjudicatory Mechanism)** এবং দ্রুত বিচারিক হস্তক্ষেপ এখন আর বিকল্প নয়—এগুলি এখন **অপরিহার্য (Indispensable)**।

Q. While the Anti-Defection Law under the Tenth Schedule was enacted to ensure political stability, it has increasingly come under criticism for weakening democratic principles. Critically examine. (15 Marks)

2.1.3. ভারতে অনলাইন বাকস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ: গণতান্ত্রিক উদ্বেগ এবং আইনি টানাপোড়েন

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অনলাইন কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ কঠোর ও দৃঢ় হয়েছে। Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021-এর সংশোধন এবং Information Technology Act, 2000-এর বিভিন্ন ধারার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র ডিজিটাল আলোচনার ওপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে।

যদিও এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো **ভুল তথ্য (Misinformation)**, অবৈধ কন্টেন্ট এবং **AI-নির্ভর কারসাজি (Deepfakes)**-র মতো উদীয়মান হুমকি মোকাবিলা করা, তবে এর প্রয়োগের ধরণ **বাকস্বাধীনতা (Freedom of Speech)**, প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

আইনি কাঠামো এবং এর বিবর্তন

অনলাইন কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের আইনি ভিত্তি মূলত দুটি ধারার ওপর নির্ভরশীল:

- **Section 69A:** এটি সরকারকে সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং **জনশৃঙ্খলার (Public Order)** স্বার্থে জনগণের জন্য তথ্যের অ্যাক্সেস ব্লক করার ক্ষমতা দেয়।
- **Section 79(3)(b):** যদি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (Intermediaries) অবৈধ কন্টেন্ট সম্পর্কে জানার পর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের **"সেফ হারবার" (Safe Harbour)** সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া হয়।

মূলত, এই বিধানগুলো একটি সংকীর্ণ এবং পদ্ধতিগতভাবে সুরক্ষিত কাঠামোর মধ্যে কাজ করার কথা ছিল। সুপ্রিম কোর্ট **শ্রেয়া সিংঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (Shreya Singhal vs Union of India)** মামলায় এটি স্পষ্ট করেছিল যে, মধ্যস্থতাকারীরা কেবলমাত্র তখনই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য যখন তারা পাবে:

১. একটি **আদালতের আদেশ**, অথবা

২. একটি আইনত বৈধ **সরকারি বিজ্ঞপ্তি**।

এই রায়টি যথেচ্ছ সেন্সরশিপ প্রতিরোধ এবং সংবিধানের Article 19(1)(a) রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আইনের শাসন থেকে সরে গিয়ে **নির্বাহী বিভাগ-চালিত** (Executive-driven) প্রয়োগের দিকে ঝুঁকছে, যেখানে আদালতের নির্দেশিত সুরক্ষা কবচগুলো অনেক সময়ই অনুপস্থিত থাকছে।

উদীয়মান সমস্যার প্রকৃতি

১. **প্রতিক্রিয়ার সময় সংক্ষেপণ এবং বাধ্যতামূলক পরিপালন:** মেটা (Meta) এবং এক্স (X)-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে চিহ্নিত কন্টেন্ট অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে (কখনও কখনও মাত্র **৩ ঘণ্টার মধ্যে**) সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে:

- প্ল্যাটফর্মগুলো কন্টেন্টের বৈধতা যাচাই করার বাস্তবসম্মত সুযোগ পায় না।
- **সেফ হারবার** সুরক্ষা হারানো বা **ফৌজদারি দায়বদ্ধতার** (Criminal Liability) ভয়ে তারা অতিরিক্ত কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলে (Over-compliance)। এটি মধ্যস্থতাকারীদের নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্মের বদলে রাষ্ট্রের সেন্সরশিপের এজেন্টে পরিণত করে।

২. **আইনসভার সমর্থন ছাড়াই নির্বাহী ক্ষমতার বিস্তার: 'সহযোগ পোর্টাল'** (Sahyog portal)-এর মতো ব্যবস্থাগুলো, যা দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কন্টেন্ট সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ পাঠানোর অনুমতি দেয়, তা কার্যকরভাবে সেন্সরশিপের পরিকাঠামোকে বিস্তৃত করেছে। এর মূল সমস্যা হলো:

- এই ক্ষমতাগুলো সংসদের সুস্পষ্ট অনুমোদন ছাড়াই ব্যবহার করা হচ্ছে।
- এটি **ক্ষমতার পৃথকীকরণ** (Separation of Powers) নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে, যেখানে আইন প্রণয়ন কেবল আইনসভার এক্তিভুক্ত হওয়া উচিত।

৩. **অস্বচ্ছতা এবং স্বচ্ছতার অভাব:** সবচেয়ে গুরুতর গণতান্ত্রিক ঘাটতি হলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে প্রকাশ্য তথ্যের অভাব:

- কতগুলো কন্টেন্ট সরানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে।
- অপসারিত কন্টেন্টের ধরণ।
- কোন যুক্তিতে এগুলো সরানো হয়েছে। এই গোপনীয়তা তথ্যের ভারসাম্যহীনতা এবং জবাবদিহিতার অভাব তৈরি করে, যা বিচার বিভাগীয় বা জনসাধারণের নিরীক্ষাকে কঠিন করে তোলে।

৪. **বাকস্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব** (Chilling Effect): এই পদক্ষেপগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে একটি **"চিলিং ইফেক্ট"** তৈরি হচ্ছে, যেখানে ব্যক্তিরা ভয়ের কারণে তাদের সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকছে। তারা ভয় পায়:

- অ্যাকাউন্ট স্থগিত হওয়ার।
- আইনি পরিণতির।
- জীবিকা হারানোর (বিশেষ করে ডিজিটাল নির্মাতাদের ক্ষেত্রে)। এটি কেবল অবৈধ বক্তব্যকেই নয়, বরং বৈধ রাজনৈতিক ভিন্নমত, ব্যঙ্গ এবং **অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকেও** (Investigative Journalism) ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক উদ্বেগ এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিক্রিয়া:** উদ্বেগ বাড়ছে যে:

- নিম্ন আদালতগুলো অনেক সময় **শ্রেয়া সিংঘল** মামলার নজির কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।
- নির্বাহী বিভাগ গভীর পর্যালোচনা এবং বিতর্ক এড়াতে আনুষ্ঠানিক আইনের বদলে নিয়মনীতি ব্যবহার করছে। এর ফলে সাংবিধানিক সুরক্ষা তাত্ত্বিকভাবে থাকলেও বাস্তবে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

রাজনৈতিক অপব্যবহারের ঝুঁকি

এই ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি কাঠামোগতভাবে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হলেও ব্যবহারিকভাবে অপব্যবহারযোগ্য। আজকের শাসক দল হয়তো এর মাধ্যমে জনমত নিয়ন্ত্রণ করে সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু আগামীকালের বিরোধী দল ক্ষমতায় এলে একই ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে। তাই এটি কোনো বিশেষ দলের নয়, বরং একটি **পদ্ধতিগত সমস্যা (Systemic Issue)**, যা দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার জন্য উদ্বেগের।

সরকারের যুক্তি: একটি প্রয়োজনীয় প্রতিপক্ষ

এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রের উদ্বেগগুলো একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বর্তমান ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে:

- ভুল তথ্য এবং **ডিপফেকের (Deepfakes)** দ্রুত বিস্তার।
- জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি।
- অনলাইন উগ্রবাদ এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা।

এই প্রেক্ষাপটে সরকার যুক্তি দেয় যে:

- কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণে **দ্রুততা (Speed)** অপরিহার্য।
- ঐতিহ্যগত আইনি প্রক্রিয়া ডিজিটাল ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত ধীরগতির হতে পারে।

তবে মূল সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব নিয়ে নয়, বরং এর **প্রয়োগের ধরন ও পরিধি** নিয়ে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সাংবিধানিকভাবে সুসংগত পদ্ধতির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো প্রয়োজন:

- **আইনসভার সমর্থন (Legislative Backing):** ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ক্ষমতার যেকোনো প্রসারণ অবশ্যই **সংসদে (Parliament)** বিতর্কিত এবং অনুমোদিত হতে হবে, যা এর গণতান্ত্রিক বৈধতা নিশ্চিত করবে।
- **বিচার বিভাগীয় তদারকি শক্তিশালী করা (Strengthening Judicial Oversight):** কন্টেন্ট সরিয়ে নেওয়ার (Takedown) ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:
  - **স্বতন্ত্র পর্যালোচনা (Independent review)**
  - **সময়সীমাবদ্ধ আপিল প্রক্রিয়া (Time-bound appellate processes)**
- **স্বচ্ছতা এবং প্রকাশ (Transparency and Disclosure):** নিয়মিতভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রকাশ করতে হবে:
  - কন্টেন্ট সরানোর পরিসংখ্যান।
  - আইনি ভিত্তি বা কারণ।
  - পরিপালন রিপোর্ট (Compliance reports)।
- **যথাযথ প্রক্রিয়ার সাথে প্ল্যাটফর্মের দায়বদ্ধতা:** মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত:
  - অন্ধভাবে সরকারি নির্দেশ পালন না করা।
  - দৃঢ় অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- **ডিজিটাল অধিকার কাঠামো (Digital Rights Framework):** ভারতের একটি ব্যাপক ভিত্তিক কাঠামোর প্রয়োজন যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে:
  - নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ।
  - **মৌলিক অধিকার (Fundamental rights)**।
  - প্রযুক্তিগত বাস্তবতা।

উপসংহার

অনলাইন বাকস্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, আইন এবং গণতন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ডিজিটাল ক্ষতি মোকাবিলায় রাষ্ট্রের একটি বৈধ ভূমিকা থাকলেও, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ সেই **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই** ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি তৈরি করে যা রাষ্ট্র রক্ষা করতে চায়।

যদি এই প্রবণতাগুলো নিরসন না করা হয়, তবে ভারতের ডিজিটাল পাবলিক স্ফেয়ার ধীরে ধীরে একটি নিয়ন্ত্রিত এবং একঘেয়ে স্থানে পরিণত হতে পারে, যা **বহুত্ববাদ (Pluralism)** এবং ভিন্নমতকে ধ্বংস করবে। অতএব, চ্যালেঞ্জটি হলো এমন একটি কাঠামো তৈরি করা যা কার্যকর কিন্তু সংযত, শক্তিশালী কিন্তু দায়বদ্ধ এবং দৃঢ় কিন্তু সাংবিধানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

Q. Regulation of online speech in India increasingly reflects a tension between security and liberty." Discuss. (10 Marks)

2.1.4. বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬

প্রেক্ষাপট

এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, ২০০৬ সালের **বন অধিকার আইন** আগের সমস্ত বিরোধী আদালতের নির্দেশকে বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। আদালত **থারু উপজাতিদের** দাবি খারিজের সিদ্ধান্তকে বাতিল করেছে এবং বনবাসীদের অধিকার ক্ষুণ্নকারী বর্তমান প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করেছে।

বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬ সম্পর্কে

তফসিলি জনজাতি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত বনবাসী (বন অধিকার স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬-এর মূল লক্ষ্য হলো বনবাসী সম্প্রদায়ের ওপর যুগ যুগ ধরে চলা **"ঐতিহাসিক অন্যায়"** দূর করা।

বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬-এর উদ্দেশ্য

- বনবাসী **তফসিলি জনজাতি** এবং ঐতিহ্যগত বনবাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা ভোগ করা **ঐতিহাসিক অন্যায়** সংশোধন করা।
- জমি এবং সম্পদের ওপর বনের অধিকার (ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত) **স্বীকৃতি** দেওয়া এবং তাদের হাতে অর্পণ করা।
- বনজ সম্পদ এবং জমির অধিকারের মাধ্যমে তাদের **জীবিকার সুরক্ষা** নিশ্চিত করা।
- জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে **টেকসই বন সংরক্ষণ** ত্বরান্বিত করা।
- **গ্রাম সভার** নেতৃত্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে **বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা** শক্তিশালী করা।
- বনবাসীদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ এবং **উদ্বাস্তু** হওয়া থেকে রক্ষা করা।
- **পরিবেশগত ভারসাম্য** এবং **সামাজিক ন্যায়বিচারের** মধ্যে সমতা রক্ষা করা।

বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬-এর মূল ধারাগুলি

১. **যোগ্যতার মাপকাঠি**

- **তফসিলি জনজাতি (FDST):** তাদের মূলত বনভূমিতে বসবাস করতে হবে এবং জীবিকার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।
- **অন্যান্য ঐতিহ্যগত বনবাসী (OTFD):** তাদের ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫-এর আগে অন্তত **তিন প্রজন্ম (৭৫ বছর)** বনে বসবাস এবং তার ওপর নির্ভরশীল থাকার প্রমাণ দিতে হবে।

২. **স্বীকৃত অধিকারের ধরণ**

- **মালিকানা স্বত্ব (Title Rights):** আদিবাসী বা বনবাসীদের চাষ করা জমির মালিকানা (সর্বোচ্চ **৪ হেক্টর**)। কোনো নতুন জমি দেওয়া হয় না; কেবল বর্তমানে দখলে থাকা জমির স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- **ব্যবহারিক অধিকার (Use Rights): লঘু বনজ সম্পদ (MFP)** (যেমন- মধু, মোম, কেন্দু পাতা), গবাদি পশুর চারণভূমি এবং জলাশয় ব্যবহারের অধিকার।
- **বন ব্যবস্থাপনা অধিকার:** যেকোনো **গোষ্ঠীগত বন সম্পদ**, যা তারা ঐতিহ্যগতভাবে রক্ষা করে আসছে, তা রক্ষা এবং পুনরুৎপাদন করার অধিকার।

৩. **সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (প্রক্রিয়া)**

১. **গ্রাম সভা:** এটি হলো **প্রাথমিক কর্তৃপক্ষ**। এটি একটি প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে সুপারিশ করে যে কার কার অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত।

২. **মহকুমা স্তরের কমিটি (SDLC):** গ্রাম সভা কর্তৃক পাস করা প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করে দেখে।

৩. **জেলা স্তরের কমিটি (DLC):** এটি হলো **চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ** যা দাবিগুলি অনুমোদন বা খারিজ করার ক্ষমতা রাখে।

বন অধিকার আইন (FRA) ২০০৬-এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **উচ্চ প্রত্যাখ্যানের হার:** জেলা স্তরের কমিটি (DLC) প্রায়ই কারিগরি খুঁটিনাটি বা **"অপর্যাপ্ত প্রমাণের"** অজুহাতে দাবিগুলো খারিজ করে দেয়। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের আপিল করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না।
- **প্রশাসনিক বাধা:** বন বিভাগ প্রায়ই আধুনিক বন অধিকার আইনের চেয়ে **ঔপনিবেশিক আমলের আইনগুলোকে** বেশি প্রাধান্য দেয়। তারা আদিবাসীদের অধিকার স্বীকার করাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় হিসেবে দেখে।
- **সম্মতির লঙ্ঘন:** বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও খনি প্রকল্পের জন্য বনভূমি ব্যবহারের সময় গ্রাম সভার বাধ্যতামূলক **"বাধাহীন এবং আগাম সম্মতি"** নেওয়া হয় না।
- **অন্যান্য ঐতিহ্যগত বনবাসীদের (OTFD) প্রমাণের বোঝা:** অ-আদিবাসীদের ক্ষেত্রে **"তিন প্রজন্ম" (৭৫ বছর)** বসবাসের প্রমাণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এর ফলে বিপুল সংখ্যক বনবাসী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।
- **প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা:** গ্রাম সভাগুলোর কাছে অনেক সময় **জিপিএস (GPS)**-এর মতো কারিগরি সরঞ্জাম বা আইনি দক্ষতা থাকে না, যার ফলে তারা সঠিকভাবে নিজেদের অধিকার দাবি বা রক্ষা করতে পারে না।
- **মানচিত্র ও সীমানা নিয়ে বিরোধ:** ডিজিটাল নথির অভাব এবং অস্পষ্ট সীমানার কারণে সাধারণ মানুষের জমি ও **"সংরক্ষিত বনাঞ্চলের"** মধ্যে প্রায়ই আইনি জটিলতা তৈরি হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- **ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তির ব্যবহার:** গ্রাম সভাগুলোকে সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করতে **উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট ইমেজ** এবং জিপিএস ম্যাপিং ব্যবহার করতে হবে, যাতে বন বিভাগের ওপর নির্ভরতা কমে।
- **গ্রাম সভাকে শক্তিশালী করা:** স্থানীয় সংস্থাগুলোকে আইনি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারে এবং তাদের **"সম্মতি প্রদানের ক্ষমতা"** প্রয়োগ করতে পারে।
- **আপিল প্রক্রিয়া সহজ করা:** একটি স্বচ্ছ এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে জেলা কমিটির (DLC) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা কোনো **স্বাধীন ট্রাইব্যুনালের** কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।
- **আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো:** বন ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের 'শাসক' মনে না করে আদিবাসী অধিকারের **'সহযোগকারী'** হিসেবে কাজ করেন।
- **সমন্বিত শাসন ব্যবস্থা:** বন অধিকারের সাথে অন্যান্য সরকারি প্রকল্প যেমন—**MGNREGA (১০০ দিনের কাজ)** এবং মিশন অন্ত্যোদয়কে যুক্ত করতে হবে, যাতে জমির অধিকারের পাশাপাশি বনবাসীদের জীবিকাও নিশ্চিত হয়।

উপসংহার

বন অধিকার আইন (FRA) হলো **সামাজিক ন্যায়বিচারের** একটি ঐতিহাসিক হাতিয়ার। এর সাফল্য নির্ভর করছে আদালতের রায়কে আইনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে মেলানো, গ্রাম সভাকে শক্তিশালী করা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপর। তবেই কাগজের আইন ও মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান কমানো সম্ভব হবে।

Q. "Despite the progressive intent of the Forest Rights Act, 2006, its implementation remains fraught with legal and administrative challenges." Critically examine in the light of recent judicial developments. (15 Marks)

2.1.5. বুলডোজার বিচার: যখন রাষ্ট্র আইনকে উপেক্ষা করে

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, **"বুলডোজার বিচারে"র** (Bulldozer Justice) প্রকাশ্য মহিমান্বয়—যা রাজনৈতিক নেতাদের শিশুদের খেলনা বুলডোজার উপহার দেওয়ার মতো প্রতীকী ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে—তা **বহির্ভূত বিচারিক শাস্তির** (Extrajudicial Punishment) একটি উদ্বেগজনক স্বাভাবিকীকরণকে নির্দেশ করে। এখানে সম্পত্তির ধ্বংসসাধনকে একটি **সাংবিধানিক লঙ্ঘন** (Constitutional Violation) হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ করার পরিবর্তে, তাকে **সুনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থার** (Decisive Governance) নিদর্শন হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে।

বুলডোজার বিচার সম্পর্কে সম্যক ধারণা

১. **সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি**

- **বুলডোজার বিচার** (Bulldozer Justice) বলতে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি **বহির্ভূত বিচারিক উচ্ছেদকে** (Extrajudicial Demolition) বোঝায়, যা প্রায়শই আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।
- এটি অভিযোগ → তদন্ত → বিচার → শাস্তি—এই প্রতিষ্ঠিত আইনি ধারাকে লঙ্ঘন করে এবং এর ফলে **ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার** (Criminal Justice System) মূল নীতিগুলো ক্ষুণ্ণ হয়।
- এই চর্চাটি প্রশাসনিক পদক্ষেপকে একটি **দণ্ডমূলক প্রদর্শনীতে** (Punitive Spectacle) পরিণত করে, যেখানে আইনি জবাবদিহিতার বিকল্প হিসেবে ধ্বংসলীলাকেই বেছে নেওয়া হয়।

২. **ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বিবর্তন**

- রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে বুলডোজারের ব্যবহার নতুন নয়; ১৯৭৫-৭৭ সালের **জরুরি অবস্থার** (Emergency Period) সময় তুর্কমান গেটের মতো এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরবর্তীতে **রাষ্ট্রীয় বাড়াবাড়ি** (State Excesses) হিসেবে সমালোচিত হয়েছিল।
- তবে পূর্ববর্তী সমালোচনার বিপরীতে, বর্তমান প্রবণতাটি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে **সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা** (Strong Governance) এবং দুর্নীতির প্রতি **শূন্য সহনশীলতার** (Zero Tolerance) প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।
- নিন্দা থেকে এই সমর্থনের দিকে রূপান্তর **নির্বাহী ক্ষমতার অতিপ্রয়োগের** (Executive Overreach) একটি বিপজ্জনক স্বাভাবিকীকরণকে নির্দেশ করে।

৩. **বর্তমান সময়ে এই চর্চার নেপথ্যে থাকা প্রভাবকসমূহ**

- **বিচারের মন্থর গতি এবং ব্যাকলগ:** ভারতের বিচার ব্যবস্থা ৫.৫ কোটিরও বেশি মামলার ভারে জর্জরিত। শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টেই ৯০,০০০-এর বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মনে বিচার পেতে **অত্যধিক বিলম্বের** (Perception of Delay) ধারণা তৈরি করে।
- **বিচারকের ঘাটতি:** 'ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট ২০২৫' অনুসারে, ভারতে প্রতি দশ লক্ষ মানুষের বিপরীতে মাত্র ১৫ জন বিচারক রয়েছেন—যা ১৯৮৭ সালের ল কমিশনের সুপারিশকৃত **প্রতি দশ লক্ষে ৫০ জন বিচারকের** তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ, বিচারবিভাগীয় বিলম্ব কোনো আপস্মিক ঘটনা নয়, এটি একটি **কাঠামোগত সমস্যা** (Structural Issue)।
- **মামলার দীর্ঘসূত্রতা:** দেশের ২৫টি রাজ্যের মধ্যে ২২টিতেই অধস্তন আদালতগুলোতে ৩ বছরের বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা মামলার হার মোট মামলার ২৫%। ২৫টি হাইকোর্টের ক্ষেত্রে ৫ বছরের বেশি পুরনো মামলাগুলো মোট অমীমাংসিত মামলার ৫১%।
- **তাৎক্ষণিক ফলের প্রত্যাশা:** দ্রুত পরিষেবা প্রদানের এই যুগে শাসনব্যবস্থাও দ্রুত ফলাফলের চাপের সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে **যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার** (Due Process) পরিবর্তে 'শর্টকাট' বা দ্রুত পথ বেছে নেওয়া হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ: শাস্তিমূলক উচ্ছেদকে অসাংবিধানিক ঘোষণা

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে একটি ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের **১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদের** (Article 142) অধীনে তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সারা ভারতের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে। কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, শাস্তিমূলক উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া **অসাংবিধানিক** (Unconstitutional)।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা:

- **বাধ্যতামূলক পূর্ব নোটিশ** (Mandatory Prior Notice): উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করার আগে সম্পত্তির মালিককে অন্তত **১৫ দিনের** (15 days) একটি লিখিত নোটিশ পাঠাতে হবে। এটি রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠাতে হবে যাতে ব্যক্তিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় পান।
- **শুনানির অধিকার** (Right to be Heard): উচ্ছেদ আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে **শুনানির সুযোগ** (Personal Hearing) দিতে হবে। কর্তৃপক্ষকে একটি **যৌক্তিক লিখিত আদেশ** (Reasoned Written Order) প্রদান করতে হবে, যেখানে উল্লেখ থাকবে কেন উচ্ছেদই একমাত্র বিকল্প।
- **জবাবদিহিতা ও ভিডিও রেকর্ডিং** (Accountability and Video Recording): স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে পুরো উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটি **ভিডিও রেকর্ডিং** (Video Recording) করা বাধ্যতামূলক।
- **আধিকারিকদের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা** (Personal Liability of Officials): যদি কোনো সরকারি আধিকারিক এই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেন, তবে তাকে **আদালত অবমাননার** (Contempt of Court) সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা **পুনরুদ্ধারের** (Restitution) খরচ সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে তার নিজের বেতন থেকে দিতে হবে।
- **ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র** (Exception): সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে, রাস্তা, ফুটপাত, রেললাইন বা নদীর ধারের মতো **জনসাধারণের জায়গায়** (Public Places) অবৈধ দখলদারিত্বের ক্ষেত্রে এবং আদালতের সরাসরি নির্দেশে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত বিচারবিভাগীয় রায়

- **মানেকা গান্ধী মামলা, ১৯৭৮** (Maneka Gandhi Case): সুপ্রিম কোর্ট 'আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি'র ব্যাপ্তি বাড়িয়ে জানায় যে, এই পদ্ধতি অবশ্যই **ন্যায়সঙ্গত, নিরপেক্ষ এবং যুক্তিসঙ্গত** (Just, Fair, and Reasonable) হতে হবে। এটি ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় **'আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া'** (Due Process of Law) ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করে।

- **ওলগা টেলিস মামলা, ১৯৮৫** (Olga Tellis Case): আদালত রায় দেয় যে, **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ** (Article 21) বা জীবনের অধিকারের মধ্যে **জীবিকা এবং আশ্রয়ের অধিকারও** (Right to Livelihood and Shelter) অন্তর্ভুক্ত। তাই আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া মৌলিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন।
- **কেটি প্ল্যান্টেশন (পি) লিমিটেড মামলা, ২০১১** (KT Plantation Case): আদালত নির্দেশ দেয় যে, **৩০০-এ অনুচ্ছেদের** (Article 300-A) অধীনে কোনো ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে হলে সেই প্রক্রিয়া অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

মূল উদ্বেগ: কেন "বুলডোজার বিচার" আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ণ করে?

১. **আইনের শাসন এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার লঙ্ঘন**

- বুলডোজার বিচার সাংবিধানিক আইনি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। এটি তদন্ত বা বিচার ছাড়াই সরাসরি অভিযোগ থেকে শাস্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়—যেখানে **রাষ্ট্র একইসাথে তদন্তকারী, বিচারক এবং জল্লাদের** (Investigator, Judge, and Executioner) ভূমিকা পালন করে।
- ক্ষমতার এই একীকরণ **ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির** (Separation of Powers) পরিপন্থী, যা ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক কাঠামো। নির্বাহী বিভাগ কখনোই বিচারবিভাগের কাজ নিজের হাতে নিতে পারে না।
- এই চর্চাটি আদতে **ক্ষমতার অপপ্রয়োগ** (Colourable Exercise of Power)—যেখানে একটি বৈধ পৌর আইনকে (অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ) রাজনৈতিক বা অন্য কোনো অনভিপ্রেত উদ্দেশ্যে (অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া) ব্যবহার করা হয়।

২. **মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী**

- **আশ্রয়ের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১):** জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয়ের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। হঠাৎ শাস্তিমূলক উচ্ছেদ একটি পরিবারের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবিকা ধ্বংস করে দেয়।
- **সম্পত্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩০০-এ):** সংবিধান নির্দেশ দেয় যে, আইনের কর্তৃত্ব ছাড়া কাউকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- **সাম্যের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪):** যখন কর্তৃপক্ষ বেছে বেছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ভিন্নমতাবলম্বীদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে এবং অন্যদের একই অপরাধ এড়িয়ে যায়, তখন তা আইনের **সমান সংরক্ষণের** (Equal Protection of Laws) চরম লঙ্ঘন।
- **নির্দোষতার অনুমান** (Presumption of Innocence): বিচারের আগে কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আদালতের রায় ছাড়াই উচ্ছেদ এই মৌলিক আইনি নীতিকে পদদলিত করে।

৩. **যৌথ শাস্তির সমস্যা**

- যৌথ বসতবাড়ি ভেঙে দেওয়া মানে একজনের কথিত অপরাধের জন্য তার পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ ও নির্দোষ সদস্যদের শাস্তি দেওয়া। এটি **ব্যক্তিগত অপরাধমূলক দায়বদ্ধতার** (Individual Criminal Liability) ধারণার পরিপন্থী।
- এই ধরণের **যৌথ শাস্তি** (Collective Punishment) জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯) এবং আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর মতো আন্তর্জাতিক আইনেরও বিরোধী।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয়**

- এটি সমাজে এই ধারণা গেঁথে দেয় যে, নির্বাহী ক্ষমতা আইনি সুরক্ষা উপেক্ষা করতে পারে। ফলে নাগরিকরা আইনি প্রক্রিয়ার চেয়ে রাজনৈতিক শক্তির ওপর বেশি বিশ্বাস করতে শুরু করে, যা একটি **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার** (Democratic Norms) জন্য ক্ষতিকর।

ভবিষ্যৎ পথ: আইনের শাসনকে পাশ কাটিয়ে নয়, বরং শক্তিশালী করে

১. বিচার বিভাগীয় ও আইনি সুরক্ষা

- হাইকোর্ট এবং জেলা আদালতগুলোকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে **'সুয়ো মোটো'** (Suo Motu) ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা প্রতিবাদের পর লক্ষ্যবস্তু করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো না হয়।
- পৌর আইন সংশোধন করে **আনুপাতিকতার নীতি** (Proportionality Doctrine) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেখানে উচ্ছেদ হবে একেবারে চূড়ান্ত বা শেষ বিকল্প।
- জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা বহির্ভূত বিচারিক উচ্ছেদের প্রকাশ্য সমর্থনকে **নির্বাচনী অসদাচরণ** (Corrupt Electoral Practice) হিসেবে গণ্য করার জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

২. কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- শূন্যপদ পূরণ করে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং 'দ্রুত বিচারের' চাহিদা মেটাতে **ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট** (Fast-Track Courts) গঠন করা জরুরি, যাতে বিচারিক বিলম্বের কারণে মানুষকে 'শর্টকাট' খুঁজতে না হয়।
- একটি স্বাধীন **পৌর সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল** (Municipal Property Tribunal) গঠন করা উচিত, যাতে উচ্ছেদ আদেশের বৈধতা কোনো আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা দ্বারা যাচাই করা যায়।

৩. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড গ্রহণ

- ভারতের উচিত জাতিসংঘের **উন্নয়ন-ভিত্তিক উচ্ছেদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা (২০০৭)** গ্রহণ করা, যা শাস্তিমূলক উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে এবং উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসনের ওপর জোর দেয়।
- তদন্ত ও প্রসিকিউশন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করলে আইনি দীর্ঘসূত্রতা কমবে, যা মানুষকে 'তাৎক্ষণিক বিচার' বা 'বুলডোজার বিচারে'র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপসংহার

- যদিও **বুলডোজার বিচার** (Bulldozer Justice) একটি দ্রুত এবং সুনিশ্চিত শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে, কিন্তু এটি মৌলিকভাবে **আইনের শাসন** (Rule of Law), সাংবিধানিক শৃঙ্খলা এবং **যথাযথ আইনি প্রক্রিয়াকে** (Due Process) ক্ষুণ্ণ করে।
- এর ফলে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং, প্রকৃত বৈধতা দণ্ডের দ্রুততার মধ্যে নয়, বরং ন্যায়পরায়ণতা, বৈধতা এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিহিত। তাই ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং জনবিশ্বাস নিশ্চিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করা অপরিহার্য।

Q. Judicial delays are often cited as a justification for 'instant justice'. Evaluate whether bulldozer justice can be seen as a consequence of systemic weaknesses in India's judicial system. (15 Marks)

2.1.6. আইনি কল্পনা এবং দশম তফশিলের অধীনে দলীয় একীভূতকরণ: চ্যালেঞ্জ এবং আগামীর পথ

ভূমিকা

- আইন মাঝেমধ্যে **আইনি কল্পনা** (Legal Fiction) ব্যবহার করে, যা মূলত একটি সচেতন ভান যা আইনকে একটি **সুষ্ঠু ফলাফল** (Fair Result) অর্জনে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নিবন্ধিত কোম্পানিকে একজন **জীবন্ত ব্যক্তি** (Living Person) হিসেবে গণ্য করা, যে মামলা করতে পারে বা যার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে, যদিও কোম্পানি স্পষ্টতই কোনো মানুষ নয়।

- তবে, যখন একটি আইনি কল্পনাকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এটি একটি দরকারী হাতিয়ার হওয়ার পরিবর্তে **ক্ষমতার বিপজ্জনক অপব্যবহার** (Dangerous Grant of Power) হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে ভারতে **দলত্যাগ বিরোধী আইনের** (Anti-defection Law) একীভূতকরণ বা **মার্জার ক্লজ** (Merger Clause) যেভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটছে।

প্রেক্ষাপট: দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ (Mergers) সম্পর্কে সংবিধান কী বলে

ক. দশম তফশিল — ভারতের দলত্যাগ বিরোধী আইন

- **দশম তফশিল কী?** ১৯৮৫ সালে **৫২তম সংবিধান সংশোধনীর** মাধ্যমে এটি যুক্ত করা হয়। এতে বলা হয়েছে যে, কোনো বিধায়ক বা সাংসদ যদি নিজ দল ত্যাগ করেন বা দলের নির্দেশ অমান্য করে ভোট দেন, তবে তিনি তার পদ হারাবেন। ব্যক্তিগত লোভ বা চাপের মুখে রাজনৈতিক **ঘোড়া-কেনাবেচা** (Horse-trading) এবং দলত্যাগ বন্ধ করার জন্যই এই আইন করা হয়েছিল।
- **একীভূতকরণের** (Mergers) **ব্যতিক্রম কী?** দশম তফশিলের **৪ নম্বর প্যারাগ্রাফ** অনুযায়ী, কোনো বিধায়ক অযোগ্য ঘোষিত হবেন না যদি তার **মূল রাজনৈতিক দল** (Original political party) অন্য একটি দলের সাথে একীভূত হয়। এর যুক্তি হলো—একটি প্রকৃত একীভূতকরণ দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, এটি কোনো একক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা নয়।
- **'অনুমানকৃত একীভূতকরণ' (Deemed Merger) বলতে কী বোঝায়?** প্যারাগ্রাফ ৪(২)-এ একটি **ডীমিং ক্লজ** (Deeming Clause) বা অনুমানমূলক ধারা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, একটি একীভূতকরণ তখনই ঘটেছে বলে 'ধরে নেওয়া হবে' যদি এবং কেবলমাত্র যদি বিধানসভার বা সংসদের ওই দলের অন্তত **দুই-তৃতীয়াংশ** (Two-thirds) সদস্য এতে সম্মত হন।
  - মূল বিষয়টি হলো—এই দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাটি হলো দলীয় স্তরে প্রকৃত একীভূতকরণ হয়েছে কি না তা যাচাই করার একটি মাধ্যম; এটি নিজেই একীভূতকরণ নয়।
  - একীভূতকরণের প্রকৃত সিদ্ধান্তটি আসতে হবে মূল রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সংগঠন (নেতৃত্ব, সাধারণ পরিষদ বা সংবিধান) থেকে—দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন কেবল তার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

খ. ভারতে আইনি কল্পনার মতবাদের (Doctrine of Legal Fiction) বিবর্তন

- **বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ বনাম বিহার রাজ্য (১৯৫৫):** সুপ্রিম কোর্টের সাত বিচারপতির একটি সংবিধান বেঞ্চের এই যুগান্তকারী রায় ভারতে 'আইনি কল্পনা' ব্যাখ্যার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছিল।
  - এই মামলাটি ছিল একটি কর সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে, যেখানে বিহার রাজ্য আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর কর আরোপের জন্য সংবিধানের একটি ডীমিং ক্লজ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট তা নাকচ করে দেয়, কারণ **ডীমিং ক্লজগুলোর** একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত উদ্দেশ্য থাকে এবং তার বাইরে একে প্রসারিত করা যায় না।
  - ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এস.আর. দাস মূল নিয়মটি দিয়েছিলেন: **"একটি আইনি কল্পনা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য তৈরি করা হয়, এটিকে সেই উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং এর বৈধ ক্ষেত্রের বাইরে প্রসারিত করা যাবে না।"**
- **রাজেন্দ্র সিং রানা বনাম স্বামী প্রসাদ মৌর্য (২০০৭):** সুপ্রিম কোর্টের একটি সংবিধান বেঞ্চ এই যুক্তিটি দশম তফশিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তারা স্পষ্ট করে বলেন যে, কোনো একীভূতকরণকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পিকারের কোনো **স্বাধীন ক্ষমতা** (Independent power) নেই এবং আইনপ্রণেতাদের ভোট কখনোই মূল রাজনৈতিক দলের প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিকল্প হতে পারে না।
- **রেজিস্ট্রার কেন কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ বনাম গুরদীপ সিং নারওয়াল (১০ মার্চ, ২০২৬):** সুপ্রিম কোর্ট আবারও **বেঙ্গল ইমিউনিটি নীতিটি** পুনর্ব্যক্ত করেছে—একটি ডীমিং ক্লজ শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করে যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে এবং এমন কোনো বিষয়কে নষ্ট করার জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে না যা স্পর্শ করার উদ্দেশ্য এর ছিল না।

ভারতীয় গণতন্ত্রে 'আইনি কল্পনা'র (Legal Fiction) শৃঙ্খলা কেন গুরুত্বপূর্ণ

- **দলত্যাগ বিরোধী আইনের মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করা:** সংবিধানে দশম তফশিল যুক্ত করার প্রধান কারণ ছিল ব্যক্তিগত লাভের জন্য জনপ্রতিনিধিদের দলবদল রোধ করা। যদি একদল বিধায়ক বা সাংসদ তাদের মূল দলের অনুমতি ছাড়াই নিজেদের 'একীভূত' বা **মার্জার (Merger)** বলে ঘোষণা করতে পারেন, তবে এই আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।
- **একীভূতকরণকে দলের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা:** একটি প্রকৃত একীভূতকরণের অর্থ হলো পুরো দলীয় সংগঠন (নেতৃত্ব ও সদস্যবৃন্দ) অন্য দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো একটি উপদলের দলত্যাগকে 'একীভূতকরণ' বলা অনেকটা গাছের কয়েকটা ডাল নিজেকে পুরো গাছ বলে দাবি করার মতো।
- **আইনসভার সততা ও মর্যাদা বজায় রাখা:** যখন জনপ্রতিনিধিরা ভুয়া একীভূতকরণের আড়ালে দল পরিবর্তন করেন, তখন **কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Manufactured majorities)** তৈরি করা সম্ভব হয়। এর ফলে জনমতের ভিত্তিতে নয়, বরং পরিকল্পিত দলবদলের মাধ্যমে সরকার গঠন বা পতন ঘটে, যা **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের (Representative democracy)** পরিপন্থী।
- **আইনি কল্পনাকে সৎ রাখা:** দার্শনিক লন ফুলার (Lon Fuller) সতর্ক করেছিলেন যে, একটি কল্পনা তখনই দরকারী যখন মানুষ জানে যে এটি একটি কল্পনা মাত্র। যখন কোনো ভানকে প্রকৃত সত্য বলে গণ্য করা হয়, তখন তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনকেই 'একীভূতকরণ' হিসেবে গণ্য করা এই ধরনের একটি ভুল।

বাস্তবে আইনি কল্পনার ভুল ব্যাখ্যা

- **বোম্বে হাইকোর্ট (গোয়া বেঞ্চ):** আদালত দুবার শুধুমাত্র দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একীভূতকরণের আদেশ বহাল রেখেছে, যেখানে মূল দলের স্তরে একীভূতকরণের কোনো প্রমাণের প্রয়োজন মনে করা হয়নি। ২০২৫ সালের জানুয়ারির এই সিদ্ধান্তটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।
- **প্রিসাইডিং অফিসারদের একীভূতকরণকে স্বীকৃতি দান:** আম আদমি পার্টির (AAP) সাতজন সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তা গ্রহণ করেন। এটি শুধুমাত্র সাংসদদের সংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছিল, রাজনৈতিক দল হিসেবে AAP-এর কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই। AAP এর বিরুদ্ধে অযোগ্যতার আবেদন করেছে, যা **বেঙ্গল ইমিউনিটি** এবং **রানা** মামলার নীতির ভিত্তিতে বিচার করলে বাতিল হওয়ার কথা।
- **মতবাদগত বিপদ — কল্পনার তথ্যে রূপান্তর:** যখন একটি **ডীমিং ক্লজকে (Deeming clause)** একীভূতকরণের প্রমাণ হিসেবে দেখার পরিবর্তে একীভূতকরণ তৈরির মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়, তখন আইনটি একটি হাতিয়ার হওয়ার বদলে একদল জনপ্রতিনিধির হাতে **অন্যায্য ক্ষমতা (Substantive grant of power)** তুলে দেয়।
- **রাজনৈতিক চাপে স্পিকারের দুর্বলতা:** যেহেতু স্পিকাররা নিজেরাও কোনো না কোনো দলের সদস্য হন, তাই একীভূতকরণ সংক্রান্ত আইনি স্বচ্ছতার অভাবে অযোগ্যতা পিটিশনগুলোর রায় পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটি দশম তফশিলের সাংবিধানিক কাঠামোকে দুর্বল করে।
- **সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট রায়ের অভাব:** যদিও বেঙ্গল ইমিউনিটি এবং রানা মামলা একটি স্পষ্ট কাঠামো প্রদান করে, তবুও সুপ্রিম কোর্ট এখনও দশম তফশিলের প্যারাগ্রাফ ৪(২)-এর ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করেনি। এই ফাঁকফোকরের কারণেই হাইকোর্ট এবং প্রিসাইডিং অফিসারদের রায়ে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলন: অন্যান্য গণতন্ত্রে দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ যেভাবে পরিচালিত হয়

১. **দক্ষিণ আফ্রিকা — স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল মডেল:** দক্ষিণ আফ্রিকার **নির্বাচনী আদালত (Electoral Court)** একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় সংস্থা যা সংসদ থেকে আলাদা। এটি দলের সদস্যপদ, দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করে। এটি স্পিকারের হাত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সরিয়ে নেয় এবং নিরপেক্ষ ও সময়োপযোগী রায় নিশ্চিত করে, যা ক্ষমতাসীন দল দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

- ভারতের **ল কমিশন (১৭০তম এবং ২৫৫তম রিপোর্ট)** স্পিকারের বিচারিক ভূমিকার পরিবর্তে একটি স্বাধীন ট্রাইব্যুনাল গঠনের সুপারিশ করেছে—দক্ষিণ আফ্রিকার মডেলটি এর একটি কার্যকর উদাহরণ।

২. **জার্মানি — একীভূতকরণের জন্য কঠোর দলীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা:** জার্মানিতে রাজনৈতিক দলগুলোর একীভূতকরণ তখনই বৈধ হয় যখন প্রতিটি দলের নিজস্ব সংবিধান অনুসারে নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে দলের **জাতীয় কংগ্রেসের (National Congress)** আনুষ্ঠানিক ভোট অন্তর্ভুক্ত, যা শুধুমাত্র আইনপ্রণেতাদের ভোটের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটি নিশ্চিত করে যে কেবল নির্বাচিত সদস্যরাই নয়, বরং পুরো দলীয় সংগঠন এই সিদ্ধান্তের অংশীদার।

- এটি ঠিক সেই পার্থক্য যা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট **রানা (২০০৭)** মামলায় তুলে ধরেছিল। জার্মানি তার **পলিটিক্যাল পার্টি অ্যাক্ট, ১৯৬৭**-এর মাধ্যমে একে আইনি রূপ দিয়েছে, যা জালিয়াতি করা কঠিন করে তোলে।

একীভূতকরণের সাংবিধানিক ব্যাখ্যা শক্তিশালী করার পথ

- **সুপ্রিম কোর্টকে প্যারাগ্রাফ ৪(২) এর ওপর একটি স্পষ্ট রায় দিতে হবে:** একটি সংবিধান বেঞ্চকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে হবে যে প্যারাগ্রাফ ৪(২)-এর **দুই-তৃতীয়াংশ (Two-thirds)** সীমাটি শুধুমাত্র একটি **যাচাইকরণ প্রক্রিয়া (Verification mechanism)**। মূল রাজনৈতিক দলকে নথিপত্র ও প্রমাণের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করতে হবে যে তারা একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- **নির্বাচন কমিশনের উচিত একীভূতকরণের প্রমাণের নির্দেশিকা তৈরি করা:** ভারতের নির্বাচন কমিশনের উচিত স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা, যাতে কোনো একীভূতকরণের স্বীকৃতির জন্য দলের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এবং দলীয় সংবিধান অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।
- **অযোগ্যতা মামলার জন্য স্পিকারের পরিবর্তে স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠন:** ল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সমস্ত দলত্যাগ এবং একীভূতকরণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি **স্বাধীন সাংবিধানিক ট্রাইব্যুনাল (Independent constitutional tribunal)** গঠন করা উচিত যাতে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণ দূর হয়।
- **অযোগ্যতা পিটিশন নিষ্পত্তির জন্য সময়সীমা নির্ধারণ:** সুপ্রিম কোর্টের উচিত একীভূতকরণ সংক্রান্ত সমস্ত অযোগ্যতা পিটিশন **৯০ দিনের মধ্যে** নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক করা। দেরি হওয়ার ফলে দলত্যাগীরা নিজেদের অবস্থান শক্ত করার সুযোগ পায়।
- **স্পষ্টতার জন্য সংসদের উচিত দশম তফশিল সংশোধন করা:** সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে প্যারাগ্রাফ ৪-এ একটি ব্যাখ্যা যুক্ত করা উচিত। এতে স্পষ্টভাবে বলা থাকবে যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যা কেবল দলীয় স্তরে সম্পন্ন হওয়া একটি একীভূতকরণকে যাচাই করে, এটি নিজে থেকে কোনো একীভূতকরণ তৈরি করে না।

উপসংহার

- **আইনি কল্পনার মতবাদ (Doctrine of legal fiction)** হলো একটি সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ, যা কোনো বিশেষ বিধানের (Deeming provisions) সীমিত এবং সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের কল্পনাকে তার উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বাইরে প্রসারিত করা **সাংবিধানিক শাসন (Constitutional governance)** এবং **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতাকে (Democratic accountability)** দুর্বল করে দেয়।
- যতক্ষণ না আদালত এবং সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষসমূহ দশম তফশিলের ক্ষেত্রে আইনি কল্পনার এই নীতিগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করছে, ততক্ষণ **দলত্যাগ বিরোধী আইন (Anti-defection law)** দলত্যাগ প্রতিরোধের পরিবর্তে সেটিকে **বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ারে (Instrument for legitimising defections)** পরিণত হতে পারে।

Q. The misuse of legal fiction under the merger exception of the Tenth Schedule threatens the very purpose of the anti-defection law. Critically examine. (15 Marks)

2.1.7. আদর্শ আচরণবিধি এবং ভারতের নির্বাচনী গণতন্ত্রের সততা

প্রেক্ষাপট

- **অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন** হলো একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। **আদর্শ আচরণবিধি** (MCC) হলো ভারতের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা কবচ, যা নিশ্চিত করে যে নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যেন কখনই ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়।
- তবে, সম্প্রতি একটি নির্বাচনের সক্রিয় চলাকালীন সময়ে **সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত সংবাদমাধ্যম**—দূরদর্শন, সংসদ টিভি এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে একজন উচ্চপদস্থ সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের **সরাসরি সম্প্রচারকে** কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। উক্ত সম্প্রচারে নির্দিষ্ট বিরোধী দলগুলোর নাম নেওয়া হয়েছিল এবং একটি বিশেষ ভোটার গোষ্ঠীকে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
- এই ঘটনাটি আদর্শ আচরণবিধির পরিধি, এর **প্রয়োগযোগ্যতা** এবং **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১**-এর অধীনে বিধিবদ্ধ কাঠামোর পেছনের প্রাতিষ্ঠানিক সদিচ্ছা নিয়ে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে।

প্রেক্ষাপট: আদর্শ আচরণবিধি (MCC) এবং এর বিবর্তন বোঝা

ক. আদর্শ আচরণবিধি (MCC) কী?

আদর্শ আচরণবিধি হলো ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত একগুচ্ছ **অ-বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা** (non-statutory guidelines), যা সাধারণ নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং ক্ষমতাসীন দলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে এটি কার্যকর হয় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এটি সরাসরি কোনো আইন থেকে নয়, বরং **সাংবিধানিক নীতি** (constitutional principles) থেকে এর কর্তৃত্ব লাভ করে।

- **প্রয়োগযোগ্যতা** (Applicability): নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দল, তাদের প্রার্থী, **তারকা প্রচারক** (star campaigners) এবং তৎকালীন সরকার — কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই — এই বিধির আওতায় চলে আসে।
- **অ-বিধিবদ্ধ কিন্তু কার্যকর প্রকৃতি:** আদর্শ আচরণবিধি সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আনুষ্ঠানিক আইন নয়; তবে, এটি **ধারা ৩২৪** (Article 324) এর অধীনে নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকা সাংবিধানিক ক্ষমতা থেকে এর প্রয়োগযোগ্যতা লাভ করে। এই বিধি লঙ্ঘনের ফলে তিরস্কার, নিষেধাজ্ঞার আদেশ এবং চরম ক্ষেত্রে **নির্বাচনী প্রতীক আদেশ, ১৯৬৮** (Election Symbols Order, 1968) এর অনুচ্ছেদ ১৬এ (Paragraph 16A) অনুযায়ী দলের স্বীকৃতি স্থগিত করার মতো গুরুতর পরিণতি হতে পারে।

আদর্শ আচরণবিধির উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কোডটি অন্যায্য প্রভাব প্রতিরোধ করে **অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন** (free and fair elections) নিশ্চিত করতে চায়।

২. এটি ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য একটি **সমান ক্ষেত্র** (level playing field) তৈরি করতে চায়।

৩. এর লক্ষ্য সরকারি সম্পদ, জনগণের অর্থ এবং দাপ্তরিক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা।

৪. এটি **নৈতিক রাজনৈতিক আচরণ** (ethical political conduct) এবং জবাবদিহিতা প্রচার করে।

খ. আদর্শ আচরণবিধির বিবর্তন

- **কেরালার উদ্যোগ (১৯৬০):** আদর্শ আচরণবিধির সূত্রপাত ১৯৬০ সালে কেরালা সরকার কর্তৃক প্রথম খসড়া করা একটি আচরণবিধি থেকে — যা স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় স্তরে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী আচরণের নিয়মগুলো সংজ্ঞায়িত করার প্রাচীনতম প্রচেষ্টা।

- **নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিকীকরণ (১৯৬৮ এবং ১৯৭৪):** ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৯৬৮ সালে আদর্শ আচরণবিধিকে একটি জাতীয় দলিল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ ও প্রচার করে এবং ১৯৭৪ সালে এটি সংশোধন করে, যা একে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং সরকারের জন্য একটি সার্বজনীন মানের রূপ দেয়।
- **সপ্তম খণ্ড সংযোজন (১৯৭৯):** ১৯৭৯ সালে **সপ্তম খণ্ড** (Part VII) সংযোজনের মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সংস্কারটি আসে, যা বিশেষভাবে **'ক্ষমতাসীন দল'** (party in power) এর আচরণ পরিচালনা করে। সপ্তম খণ্ডের ১(ক), ১(খ) এবং ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাসীন দলের সরকারি সফরের সাথে নির্বাচনী প্রচারকে যুক্ত করা, প্রচারের কাজে সরকারি যন্ত্রপাতি বা কর্মীদের ব্যবহার করা এবং নির্বাচনের সময় পক্ষপাতদুষ্ট বা একতরফা রাজনৈতিক প্রচারের জন্য **সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গণমাধ্যম** (publicly funded mass media) ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।
- **কঠোর প্রয়োগের যুগ (১৯৯১ থেকে পরবর্তী):** সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার **টি.এন. শেষান** (T.N. Seshan)-এর আমলে আদর্শ আচরণবিধি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। ১৯৯১ সাল থেকে তাঁর কার্যকাল এই আচরণবিধিকে একটি প্রতীকী দলিল থেকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে, যা ভারতে শক্তিশালী নির্বাচনী শাসনের সূচনা করে।

আদর্শ আচরণবিধি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহ

- **ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩২৪:** এই ধারাটি ভারতের নির্বাচন কমিশনকে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে। এটি কমিশনকে এমন পরিস্থিতিতে কাজ করার সুযোগ দেয় যেখানে সংবিধিবদ্ধ আইন (Statutory Law) নীরব থাকে।
- **মহিন্দর সিং গিল বনাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (১৯৭৮):** সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় ধারা ৩২৪-কে ক্ষমতার একটি **'আধার'** (Reservoir of power) হিসেবে বর্ণনা করেছে। আদালত জানায়, যে সকল ক্ষেত্রে সংসদ সুনির্দিষ্টভাবে আইন প্রণয়ন করেনি, সেখানে নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ নিতে পারে। এটিই আদর্শ আচরণবিধির (MCC) প্রয়োগযোগ্যতার প্রধান সাংবিধানিক ভিত্তি।
- **হরবংশ সিং জালাল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৯৭):** পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট এই মামলায় স্পষ্ট করে দেয় যে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই আদর্শ আচরণবিধি আইনিভাবে কার্যকর হয়—যা এর কার্যকর হওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ বিধানসমূহ

আদর্শ আচরণবিধি একটি প্রশাসনিক এবং আধা-আইনি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করলেও, **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১** নির্বাচনী আচরণের ক্ষেত্রে দুর্নীতিমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে:

- **ধারা ১২৩(৩) এবং পরিচয়-ভিত্তিক আবেদন:** এই বিধান অনুযায়ী ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা ভাষার ভিত্তিতে ভোটারদের কাছে আবেদন করা একটি **'দুর্নীতিমূলক আচরণ'** (corrupt practice)। তবে এটি কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সব ধরনের রাজনৈতিক বার্তাকে কভার করে না।
- **ধারা ১২৩(৭) এবং সরকারি যন্ত্রপাতির ব্যবহার:** এই বিধানটি প্রার্থীদের নির্বাচনী সুবিধার জন্য সরকারি কর্মচারীদের সহায়তা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে। যখন নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তাদের ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে, তখন এই ধারাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়।

আদর্শ আচরণবিধির গুরুত্ব

- **নির্বাচনী নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা:** এই বিধি নিশ্চিত করে যে নির্বাচনের সময় শাসনব্যবস্থা নিরপেক্ষ থাকে, যাতে ক্ষমতাসীন দল কোনো অন্যায্য সুবিধা না পায়।
- **সমান সুযোগ (Level Playing Field) বজায় রাখা:** রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ করার মাধ্যমে এটি সকল রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে শক্তিশালী করে।

- **নৈতিক রাজনৈতিক আচরণ উৎসাহিত করা:** এটি রাজনৈতিক দলগুলোকে সততা ও সংযমের মানদণ্ড মেনে চলতে উৎসাহিত করে, যার ফলে নির্বাচনী আলোচনার মান উন্নত হয়।
- **আইনি কাঠামোর শূন্যতা পূরণ করা:** যেহেতু সংবিধিবদ্ধ আইন সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে না, তাই আদর্শ আচরণবিধি গণমাধ্যম প্রচারের মতো উদীয়মান বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে একটি নমনীয় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
- **নির্বাচনে জনআস্থা শক্তিশালী করা:** যখন এটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।
- **প্রচারণার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ:** এটি অর্থ, গণমাধ্যম এবং প্রভাবের অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করে, যাতে নির্বাচন সুবিধার পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

আদর্শ আচরণবিধি (MCC) প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **নির্বাচনের সময় সরকারি সম্পদের ব্যবহারে অস্পষ্টতা:** সাম্প্রতিক বিতর্কটি সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গণমাধ্যমের অপব্যবহারের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জকে সামনে এনেছে।
   - আদর্শ আচরণবিধির **সপ্তম খণ্ড (Part VII)** ক্ষমতাসীন দলকে প্রচারের কাজে সরকারি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বাধা দিলেও, সরকারি সম্প্রচার এবং দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকার অভাবে ব্যাখ্যার ফাঁক থেকে যায়।
   - এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রচার 'সুশাসন' নাকি 'নির্বাচনী প্রচারের' আওতায় পড়ছে, তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **দাপ্তরিক যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক বার্তার সংমিশ্রণ:** যখন রাষ্ট্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেওয়া দাপ্তরিক ভাষণে এমন উপাদান থাকে যা ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে, তখন একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমের বার্তায় বৈধ প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং পরোক্ষ নির্বাচনী আবেদনের মধ্যে পার্থক্য করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৩. **উদীয়মান সমস্যা মোকাবিলায় সংবিধিবদ্ধ আইনের সীমাবদ্ধতা: জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১** মূলত ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় এবং ভাষার মতো নির্দিষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতে করা নির্বাচনী আবেদনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
   - তবে বর্তমান সময়ে নির্বাচনী বার্তাগুলো লিঙ্গভিত্তিক বা নীতি-ভিত্তিক প্ররোচনার মতো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে, যা এই আইনের সরাসরি আওতার বাইরে। এটি আইনি বিধান এবং বিবর্তিত প্রচার কৌশলের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করে।

৪. **সরকারি কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা:** রাজনৈতিক বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম বা দাপ্তরিক কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা নির্বাচনী সহায়তা হিসেবে গণ্য হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদিও আইন নির্বাচনী লাভের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, তবে মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগযোগ্যতা অস্পষ্ট থেকে যায়, যা আইনি অস্পষ্টতা তৈরি করে।

৫. **অ-বিধিবদ্ধ প্রকৃতি এবং সীমিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:** আদর্শ আচরণবিধির কোনো **আইনি প্রয়োগযোগ্যতা (Legal enforceability)** নেই, যা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিধিকে সীমিত করে দেয়। নির্বাচন কমিশন সতর্কবার্তা বা তিরস্কার করতে পারে, কিন্তু কঠোর শাস্তির অভাব এই বিধির কার্যকারিতা বা ভয় দেখানোর ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৬. **গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্তৃত পরিধি:** গণমাধ্যম এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নজরদারিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই আচরণবিধিটি এমন এক সময়ে তৈরি করা হয়েছিল যখন যোগাযোগের পরিবেশ ছিল ভিন্ন; বর্তমানের আধুনিক প্রচার কৌশল এবং বৃহৎ পরিসরের সম্প্রচার যন্ত্রপাতির সাথে তাল মেলাতে এর বিধানগুলো প্রায়ই হিমশিম খায়।

নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক সেরা অনুশীলনসমূহ (Global Best Practices)

- **যুক্তরাজ্য — সংবিধিবদ্ধ কাঠামো এবং কঠোর প্রয়োগ:** যুক্তরাজ্য 'পলিটিক্যাল পার্টিস, ইলেকশনস অ্যান্ড রেফারেন্ডাম অ্যাক্ট'-এর অধীনে একটি সম্পূর্ণ সংবিধিবদ্ধ নির্বাচনী কাঠামো অনুসরণ করে। তাদের নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং দণ্ড প্রদানের স্পষ্ট আইনি কর্তৃত্ব রয়েছে, যা শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

- **জার্মানি — রাষ্ট্র এবং দলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন:** জার্মানি রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে কঠোর বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। প্রচারের জন্য সরকারি কর্মী, জনতহবিল বা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এটি লঙ্ঘন করলে আইনি ও ফৌজদারি পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা — ক্ষমতাধর স্বাধীন নির্বাচনী সংস্থা:** দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, যার মধ্যে জরিমানা আরোপ, প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা এবং প্রসিকিউশন বা মামলা শুরু করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। এটি কার্যকর এবং সময়োপযোগী প্রয়োগ নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যতের পথ: আদর্শ আচরণবিধি শক্তিশালীকরণ

১. **আদর্শ আচরণবিধিকে আইনি মর্যাদা প্রদান:** সংসদের উচিত আদর্শ আচরণবিধিকে একটি সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক বিধানসহ আইনে রূপান্তরিত করা। এটি কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করবে এবং স্বেচ্ছায় মান্য করার ওপর নির্ভরতা কমাবে। ২. **নির্বাচনী আইনে সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমের অবস্থান স্পষ্ট করা:** দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও-র মতো সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমগুলো নির্বাচনী আইনের অধীনে 'সরকারি কর্মচারী' হিসেবে গণ্য হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। এটি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের অপব্যবহারের দায়বদ্ধতা নির্ধারণে সহায়তা করবে। ৩. **নির্বাচনের সময় দাপ্তরিক সম্প্রচারের জন্য পূর্বানুমতি:** নির্বাচনের সময় সরকারি প্ল্যাটফর্মে কোনো দাপ্তরিক ভাষণ সম্প্রচারের আগে নির্বাচন কমিশনের বাধ্যতামূলক অনুমোদন প্রয়োজন। এটি নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে এবং পরোক্ষ প্রচারণা রোধ করবে। ৪. **নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সংস্কার:** নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও স্বাধীন হওয়া উচিত। একাধিক প্রতিষ্ঠানকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করলে এর গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ৫. **নির্বাচনী বিরোধের জন্য দ্রুত নিষ্পত্তি ব্যবস্থা:** নির্বাচনী অভিযোগগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য একটি নিবেদিত ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত, যাতে নির্বাচনের চলাকালীনই সময়মতো বিচার নিশ্চিত করা যায়। ৬. **ডিজিটাল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যন্ত বিধির বিস্তার:** আদর্শ আচরণবিধির আওতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ডিজিটাল প্রচারণা এবং নতুন প্রযুক্তিকে আনা উচিত। ভুল তথ্য এবং তথ্যের অপব্যবহার রোধে স্পষ্ট নিয়ম প্রয়োজন।

উপসংহার

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সততা রক্ষার জন্য আদর্শ আচরণবিধি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভঙ্গুর একটি হাতিয়ার। এর কার্যকারিতা শেষ পর্যন্ত এর বিধানগুলোর উৎকর্ষতার চেয়ে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করার স্বাধীনতা এবং সংকল্পের ওপর বেশি নির্ভর করে। সংবিধিবদ্ধ কোডিফিকেশন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বিচার বিভাগীয় তদারকির মাধ্যমে MCC-কে শক্তিশালী করা কেবল একটি প্রযুক্তিগত নির্বাচনী সংস্কার নয় — এটি ভারতের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি মৌলিক শর্ত।

Q. The Model Code of Conduct acts as a moral and administrative framework rather than a legal instrument. Critically analyse its effectiveness and suggest measures to strengthen its enforcement in India's electoral system. (15 Marks)

2.1.8. ভারতের জলশাসন

ভূমিকা

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় **১৮%** ভারতে বাস করলেও, বিশ্বের মোট ব্যবহারযোগ্য সুপেয় জলের মাত্র **৪%** ভারতের কাছে রয়েছে। এই কারণে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক স্থিতিশীলতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় জল সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের বর্তমান জলশাসন কাঠামো

১. **সাংবিধানিক বিধানসমূহ**

সপ্তম তফসিল (ক্ষমতার বন্টন):

- **রাজ্য তালিকা (এন্ট্রি ১৭):** জল সরবরাহ, সেচ, খাল, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বাঁধ, জল সঞ্চয় এবং জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে **রাজ্যগুলোর** পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে।
- **কেন্দ্রীয় তালিকা (এন্ট্রি ৫৬):** সংসদ যদি জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে **আন্তঃরাজ্য নদী** এবং নদী উপত্যকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ক্ষমতা **কেন্দ্রের** হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।
- **অনুচ্ছেদ ২৬২ (বিরোধ নিষ্পত্তি):** আন্তঃরাজ্য নদী বা নদী উপত্যকার জলের ব্যবহার, বন্টন বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যেকোনো বিরোধের মীমাংসার জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সংসদ চাইলে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাও সীমিত করতে পারে।

২. **প্রধান বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ:**

- **কেন্দ্রীয় জল কমিশন (CWC):** ভূপৃষ্ঠের জলের (Surface Water) জন্য এটি দেশের শীর্ষ প্রযুক্তিগত সংস্থা। এটি বন্যা পূর্বাভাস, নদী সংরক্ষণ এবং সেচ প্রকল্পের নকশা তৈরির কাজ করে।
- **কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল বোর্ড (CGWB):** সারা দেশে **ভূগর্ভস্থ জলের স্তর** এবং এর গুণমান পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করে।
- **জাতীয় জল উন্নয়ন সংস্থা (NWDA):** এটি প্রধানত **নদী সংযোগ (Interlinking of Rivers)** প্রকল্পের কাজ দেখাশোনা করে (যেমন: কেন-বেতওয়া সংযোগ প্রকল্প)।
- **জাতীয় স্বচ্ছ গঙ্গা মিশন (NMCG):** এটি "নমামী গঙ্গে" প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী শাখা, যার লক্ষ্য হলো গঙ্গা নদীর পুনরুজ্জীবন।

৩. **আইনি কাঠামো**

জল ব্যবহার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন কার্যকর রয়েছে:

- **আন্তঃরাজ্য নদী জল বিরোধ আইন, ১৯৫৬:** নদী-জল বন্টন সংক্রান্ত বিরোধ মেটানোর জন্য **ট্রাইব্যুনাল** বা বিচারিক পর্ষদ গঠনের আইনি ব্যবস্থা প্রদান করে।
- **জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪:** জলের দূষণ রোধে এটি কেন্দ্রীয় (CPCB) এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (SPCB) গঠন করেছে।
- **পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬:** এটি একটি "ছাতা আইন" (Umbrella Legislation), যার অধীনে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন নিয়ন্ত্রণের জন্য **কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল কর্তৃপক্ষ (CGWA)** গঠন করা হয়েছে।

জল ব্যবস্থাপনায় সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ

- **জল জীবন মিশন (গ্রামীণ ও শহর):** ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় এবং ২০২৬ সালের মধ্যে শহুরে এলাকায় প্রতিটি পরিবারে **ট্যাপের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল** পৌঁছে দেওয়া এই মিশনের লক্ষ্য।
- **অটল ভূজল যোজনা (ATAL JAL):** এটি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্প, যা ভারতের সাতটি রাজ্যের জল-সংকটে থাকা এলাকাগুলোতে **জনসাধারণের অংশগ্রহণে** টেকসই ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়।
- **প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চায়ি যোজনা (PMKSY):** "হর খেত কো পানি" (প্রতিটি জমিতে জল) এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে **"প্রতি ফোঁটা জলে অধিক ফসল"** (Per Drop More Crop) উৎপাদন ও জলের ব্যবহার দক্ষতা বাড়ানোই এর লক্ষ্য।
- **নমামী গঙ্গে কর্মসূচি:** গঙ্গা নদীর দূষণ কমানো এবং নদীটির সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের জন্য এটি একটি সমন্বিত সংরক্ষণ মিশন।

- **জাতীয় জলস্তর ম্যাপিং ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (NAQUIM):** এটি ভারতের ভূগর্ভস্থ জলস্তরের মানচিত্র তৈরির একটি বিশাল প্রকল্প, যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলের পুনর্ভরণ (Recharge) এবং বিকেন্দ্রীভূত জল ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়।

ভারতে জল ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত প্রধান সমস্যাসমূহ

১. **ভূগর্ভস্থ জলের অত্যধিক ব্যবহার:** ভারত বিশ্বের বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারকারী দেশ। আমেরিকা এবং চীনের সম্মিলিত ব্যবহারের চেয়েও ভারত বেশি জল উত্তোলন করে। মূলত **ভর্তুকিযুক্ত বিদ্যুৎ** এবং ব্যক্তিগত টিউবওয়েল নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো শক্তিশালী **আইনি কাঠামো না থাকাই** এর প্রধান কারণ।

২. **অদক্ষ সেচ ব্যবস্থা:** ভারতের মোট জলের প্রায় ৯০% কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। তা সত্ত্বেও এখনও **প্লাবন সেচ (Flood Irrigation)** পদ্ধতিই বেশি প্রচলিত, যার ফলে জলের ব্যাপক অপচয় ঘটে। বৈশ্বিক ড্রিপ-ইরিগেশন বা বিন্দু সেচ পদ্ধতির তুলনায় ভারতের **"প্রতি ফোঁটা জলে ফসল"** উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম।

৩. **খণ্ডিত প্রাতিষ্ঠানিক শাসন:** জল ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থার মধ্যে (যেমন- CWC, CGWB এবং রাজ্য জল দপ্তর) বিভক্ত। এই **প্রশাসনিক বিভাজন** একটি সমন্বিত "উৎস থেকে ট্যাপ" (Source-to-tap) জল কৌশল বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৪. **জলের গুণমান এবং দূষণ:** শিল্পবর্জ্য, অপরিশোধিত শহরের নর্দমার জল এবং কৃষি খামারের রাসায়নিক মিশ্রিত জল প্রধান নদী ও ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে দূষিত করেছে। ভারী ধাতু, **আর্সেনিক এবং নাইট্রেটের** উপস্থিতির কারণে প্রাপ্ত জলের একটি বড় অংশ পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

৫. **আন্তঃরাজ্য নদী বিরোধ:** রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় তালিকার মধ্যে সাংবিধানিক অস্পষ্টতার কারণে নদী-জল বন্টন নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আইনি লড়াই চলছে (যেমন- **কাবেরী ও যমুনা**)। এটি প্রশাসনিক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিকভাবে নদী অববাহিকা উন্নয়নের পথে অন্তরায়।

৬. **জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলতাত্ত্বিক অস্থিরতা:** বর্ষার খামখেয়ালিপনা এবং হিমালয়ের হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে **"চরম আবহাওয়া"** বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বিধ্বংসী বন্যা এবং দীর্ঘায়িত খরা একটি চক্রের মতো ফিরে আসছে, যা আমাদের বর্তমান পরিকাঠামোর সহনক্ষমতার বাইরে।

কার্যকর জল ব্যবস্থাপনার জন্য ভারত যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারে

১. **চাহিদা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর:** কেবল জলের জোগান বাড়ানো (বাঁধ/খাল) থেকে সরে এসে চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিতে হবে। **জল ব্যবহার অডিট** এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প ও ঘরোয়া ক্ষেত্রে জলের অপচয় কমানো সম্ভব।

২. **"সহি ফসল" এবং শস্য বহুমুখীকরণ:** ধান ও আখের মতো প্রচুর জল লাগে এমন ফসলের বদলে কৃষকদের জলবায়ু-সহনশীল **মিলেট (বাজরা/জোয়ার)** এবং ডাল উৎপাদনে উৎসাহিত করতে হবে। এটি কৃষিতে ব্যবহৃত ৮৯% জলের চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেবে।

৩. **"স্পঞ্জ সিটি" (Sponge Cities) ধারণার প্রয়োগ:** শহরের পরিকল্পনায় জলভেদ্য ফুটপাথ, কৃত্রিম জলাভূমি এবং 'বায়োসোয়েল' অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি একদিকে যেমন শহরের বন্যা কমাবে, তেমনি প্রাকৃতিকভাবে **ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণ** করতে সাহায্য করবে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক একত্রীকরণ (জাতীয় জল কমিশন):** মিহির শাহ কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় জল কমিশন (CWC) এবং কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল বোর্ডকে (CGWB) একীভূত করে একটি **একক সংস্থা** গঠন করতে হবে। এতে ভূপৃষ্ঠের জল ও ভূগর্ভস্থ জলকে সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা যাবে।

৫. **প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (NbS):** বড় আকারে জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা, বনায়ন এবং প্রাচীন জলধারা বা জলাশয় (যেমন- **জোহাদ এবং বাউলি**) পুনর্দ্ধার করতে হবে। গ্রামীণ এলাকাকে খরা-মুক্ত করার জন্য এটি একটি স্বল্প-ব্যয়ী ও বিকেন্দ্রীভূত সমাধান।

৬. **চক্রাকার জল অর্থনীতি এবং বাধ্যতামূলক পুনর্ব্যবহার:** শহরের ব্যবহৃত জলকে বাধ্যতামূলকভাবে শোধন করে অ-পানীয় কাজে (যেমন- শিল্পে ব্যবহার বা বাগানে জল দেওয়া) ব্যবহার করতে হবে। এটি সুপেয় জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

উপসংহার

ভারতকে অবশ্যই একটি **চক্রাকার জল অর্থনীতির** (Circular Water Economy) দিকে অগ্রসর হতে হবে, যেখানে ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামোর সমন্বয় ঘটিয়ে ভারত স্থায়ী জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, যা দেশটিকে একটি টেকসই বিশ্বশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

Q. "India's water crisis is fundamentally a crisis of governance rather than mere scarcity." Examine the current water governance framework in India and discuss the major challenges associated with sustainable water management. (15 marks)

2.1.9. NTA-র 'জিরো এরর' নীতির ব্যর্থতা: ভারতের পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা

ভূমিকা

- সম্প্রতি, ২০২৬ সালের NEET-UG পরীক্ষায় প্রায় **২২.৭৯ লক্ষ চিকিৎসা প্রত্যাশী** শিক্ষার্থী বসার নয় দিন পর, **ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি** (NTA) ঘোষণা করেছে যে পরীক্ষাটির গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ **পুনরায় পরীক্ষা** (Full Re-test) নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যা নিট-এর ইতিহাসে একটি **নজিরবিহীন** ঘটনা।
- এই সিদ্ধান্ত দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। **ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন** (FAIMA) সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে NTA-র আমূল **কাঠামোগত সংস্কার** অথবা এই সংস্থাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে। এই ঘটনা ভারতের পরীক্ষা পরিচালনা বা **শাসনব্যবস্থার** (Governance framework) গভীর ফাটলগুলোকে প্রকাশ্যে এনেছে।

NTA-র ভূমিকা এবং আস্থার ক্রমবর্ধমান সংকট বোঝা

A. ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) কী?

- **ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি** (NTA) ২০১৭ সালে **শিক্ষা মন্ত্রক** কর্তৃক একটি **স্বায়ত্তশাসিত** (Autonomous) এবং বিশেষায়িত পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ভারতের উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে **স্বচ্ছ, দক্ষ, মানসম্মত এবং প্রযুক্তি-নির্ভর** পরীক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল।

B. NTA-র দায়িত্ব:

- NTA জাতীয় স্তরের প্রধান পরীক্ষাগুলো পরিচালনা করে, যেমন:
  - চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভর্তির জন্য NEET-UG।
  - ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির জন্য JEE Main।
  - স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য CUET।
  - UGC-NET এবং অন্যান্য প্রবেশিকা পরীক্ষা।
- ২০২৬ সালে, ৫,৪৩২টি কেন্দ্রে প্রায় **২২.৭৯ লক্ষ শিক্ষার্থী** পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল, যা এটিকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরিণত করেছে।

- এই পরীক্ষার গুরুত্ব বা **স্টেক** (Stakes) অত্যন্ত বেশি কারণ:
  - চিকিৎসাবিদ্যার আসন অত্যন্ত **সীমিত**।
  - পরীক্ষার্থীদের ওপর প্রবল **সামাজিক চাপ** থাকে।
  - বছরের পর বছর প্রস্তুতি এবং কোচিংয়ের পেছনে **বিশাল খরচ** জড়িত থাকে।
  - এই পরীক্ষা সরাসরি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ারের গতিপথ নির্ধারণ করে।

C. নিট (NEET) ফলাফল বিতর্ক:

২০২৪ সালে:

- শীর্ষ ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে **৬৭ জন পূর্ণ নম্বর** পেয়েছিলেন, যেখানে ২০২৩ সালে মাত্র ২ জন এবং ২০২২ সালে কেউ পূর্ণ নম্বর পাননি।
- এর ফলে ব্যাপক **র‍্যাঙ্ক ইনফ্লেশন** (Rank inflation) ঘটে, যা শীর্ষ মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।
- সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় **১.১ লক্ষ** MBBS আসনের বিপরীতে প্রায় ১৩ লক্ষ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় প্রতিযোগিতা চরম আকার ধারণ করে।
- তদন্তে জানা গেছে যে প্রায় ১৫৫ জন শিক্ষার্থী **প্রশ্নপত্র ফাঁসের** (Leaked question papers) মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। তাসত্ত্বেও পুনরায় পরীক্ষার দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল, যা সংস্থার **জবাবদিহিতার অভাব** (Lack of accountability) এবং দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার একটি ধারণা তৈরি করে।

২০২৬ সালে:

- NTA-র ঘোষিত **'জিরো এরর, জিরো টলারেন্স'** (Zero Error, Zero Tolerance) নীতি এবং ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, রাজস্থান পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে যে পরীক্ষার প্রায় এক মাস আগেই ১২০টি আসল প্রশ্ন সম্বলিত একটি **'গেজ পেপার'** (Guess paper) ছড়িয়ে পড়েছিল।
- শেষ পর্যন্ত NTA নিজেই এই ত্রুটি স্বীকার করে এবং **পুনরায় পরীক্ষার** (Re-test) ঘোষণা দেয়, যা নিট-এর ইতিহাসে প্রথম।

কেন NTA-র 'জিরো এরর' প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হলো

A. প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল — কিন্তু নেতৃত্বের অস্থিরতা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছে

- ২০২৪ সালের কেলেঙ্কারির পর, তৎকালীন NTA মহাপরিচালক, আইএএস (IAS) অফিসার সুবোধ কুমার সিংকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং সংস্থাটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে **পূর্ণকালীন প্রধান** (Full-time chief) ছাড়াই চলেছিল, যা একটি বিপজ্জনক প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি করে।
- ২০২৬ সালের মার্চ মাসে, 'ইন্ডিয়া-এআই' (IndiaAI) মিশনের প্রাক্তন সিইও অভিষেক সিং দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি কঠোর **'জিরো এরর, জিরো টলারেন্স'** (Zero Error, Zero Tolerance) নীতি ঘোষণা করেন।
- নতুন নেতৃত্ব এবং জোরালো জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, NTA ২০২৬ সালের **প্রশ্নপত্র ফাঁস** (Paper leak) রোধ করতে পারেনি। এটি প্রমাণ করে যে ব্যবস্থার সংস্কার না করে কেবল কর্মী পরিবর্তন করলে মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

B. গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা — যা সফল হয়নি

- NEET-UG ২০২৬-এর জন্য মোতায়েন করা **শারীরিক ও প্রযুক্তিগত সুরক্ষা** (Physical and Technological Safeguards) ব্যবস্থার মধ্যে ছিল:

- কঠোর প্রোটোকলের অধীনে গোপনীয় পরীক্ষা সামগ্রীর সিল করা হ্যান্ডলিং।
- প্রশ্নপত্র পরিবহনের জন্য পুলিশি প্রহরাসহ **GPS-সংযুক্ত যানবাহন**।
- সমস্ত ৫,৪৩২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে **CCTV নজরদারি**, যার ফিড ১,৫০,০০০টি ক্যামেরাসহ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সংযুক্ত ছিল।
- জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ দূর করতে **আধার-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন** (Aadhaar-based biometric authentication)।
- মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি এবং কেন্দ্রীয় সিস্টেমের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ।
- জাল প্রশ্নপত্র ছড়ানোর অভিযোগে ১২০টি **টেলিগ্রাম** (Telegram) চ্যানেল বন্ধ করা।

- এই সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে আসল প্রশ্নের বড় অংশ সম্বলিত একটি **'গেজ পেপার'** (Guess paper) ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, **উৎস-স্তরের নিরাপত্তা** (Source-level security) এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগের ব্যর্থতা নির্দেশ করে।

NTA পরীক্ষা পরিচালনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা** (Infrastructural Bottleneck): NTA-র **CBT** (Computer Based Test) সক্ষমতা প্রতিদিন ৫৫২টি কেন্দ্রে মাত্র ১.৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য। অন্যদিকে, প্রতি বছর প্রায় ২২-২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET-UG পরীক্ষায় বসে। ২০২৪ সালে কম্পিউটার ল্যাব সম্প্রসারণের জন্য একটি **টেন্ডার** (Tender) ডাকা হলেও তা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।
- **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থবিরতা** (Political and Bureaucratic Inertia): NEET-কে CBT মোডে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উভয় মন্ত্রকের অনুমোদনের প্রয়োজন। অন্তত পাঁচ বছর ধরে প্রস্তাবটি ঝুলে থাকলেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, যা **রাজনৈতিক সদিচ্ছার** (Political will) অভাবকেই প্রতিফলিত করে।
- **সংগঠিত ফাঁস চক্র** (Organised Leak Networks): প্রশ্নপত্র ফাঁস ক্রমবর্ধমানভাবে **অপরাধী চক্র** (Criminal networks) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যারা এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ, আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার এবং **দুর্নীতিগ্রস্ত অন্তর্ঘাতকদের** (Corrupt insiders) মাধ্যমে কাজ করে। এটি মোকাবিলা করা NTA-র প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বাইরে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **দুর্বল আইনি প্রতিরোধ** (Weak Legal Deterrence): যদিও **পাবলিক এক্সামিনেশন অ্যাক্ট** (Public Examinations Act) বিদ্যমান, তবে এর প্রয়োগ সীমিত। ২০২৪ সালের ঘটনায় সিবিআই (CBI) ৪৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিলেও এখনো কোনো **প্রকাশ্য সাজা** (Public conviction) ঘোষণা করা হয়নি।
- **নেতৃত্বের অস্থিরতা:** দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ণকালীন প্রধানের অভাব এবং ঘনঘন নেতৃত্ব পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের গতিকে ব্যাহত করে।
- **পরীক্ষার্থীদের ওপর মানবিক প্রভাব:** পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে **মানসিক চাপ** (Psychological distress) সৃষ্টি করে, যা বিশেষভাবে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করে। প্রতিটি শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতা এখানে একটি **সামাজিক ন্যায়বিচারের** (Social justice) ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

২০২৪-এর সংকটের পর রাধাকৃষ্ণন কমিটির প্রধান সুপারিশসমূহ

২০২৪ সালের NEET-UG বিতর্কের পর, শিক্ষা মন্ত্রক ইসরোর (ISRO) প্রাক্তন চেয়ারম্যান **কে. রাধাকৃষ্ণনের** নেতৃত্বে একটি উচ্চ-স্তরের কমিটি গঠন করে। রাধাকৃষ্ণন কমিটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে তার প্রতিবেদন জমা দেয় এবং পরীক্ষা পরিচালনায় আমূল সংস্কারের সুপারিশ করে।

- **প্রধান সুপারিশসমূহ:**
  - **কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা (CBT)-তে রূপান্তর:** প্যানেলটি প্রচলিত পেন-অ্যান্ড-পেপার (PPT) মডেলকে একটি বড় **নিরাপত্তা ঝুঁকি** হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারা JEE Main-এর মতো **CBT ফরম্যাটে** পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করেছে, যা সফলভাবে প্রতি বছর ১৩-১৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ৪-৫ দিনে সম্পন্ন করে।
  - **কম্পিউটার-সহায়ক সুরক্ষিত PPT (Computer-Assisted Secure PPT):** অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্যানেলটি **ডিজিটালি এনক্রিপ্টেড (Digitally encrypted)** প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে পাঠানোর সুপারিশ করেছে। এই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার ঠিক আগে স্থানীয়ভাবে প্রিন্ট করা হবে, যাতে মুদ্রণ ও পরিবহনের সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বন্ধ হয়।
  - **পরিকাঠামো সম্প্রসারণ:** বিদ্যমান সীমিত পরিকাঠামোর বাইরে **CBT কেন্দ্রের সক্ষমতা** উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর প্যানেলটি জোর দিয়েছে।

বিশ্বের সেরা অনুশীলন যা ভারত শিখতে পারে

A. **চিনের উন্নত নজরদারি এবং AI মনিটরিং**
   - **চিন ব্যবহার করে:**
     - **AI-চালিত নজরদারি,**
     - **বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন,**
     - **সিগন্যাল জ্যামার,** এবং
     - 'গাওকাও' (Gaokao)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় **রিয়েল-টাইম ডিজিটাল মনিটরিং**।
   - কঠোর আইনি শাস্তি সংগঠিত জালিয়াতি রোধে একটি শক্তিশালী **প্রতিরোধক (Deterrent)** হিসেবে কাজ করে।

B. **যুক্তরাজ্যের স্বাধীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা**
   - যুক্তরাজ্য পরীক্ষা পরিচালনা এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রণকে আলাদা রাখে (যেমন **Ofqual**)।
   - **স্বাধীন অডিটিং** এবং স্বচ্ছ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর জনগনের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে।

একটি নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ার ভবিষ্যতের পথ

- **অবিলম্বে CBT-র দিকে যাত্রা:** NTA-কে তিন বছরের মধ্যে প্রতিদিন ২০-২৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার মতো **CBT পরিকাঠামো** তৈরির নির্দিষ্ট সময়সীমা ও বাজেট দিতে হবে।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান হিসেবে সুরক্ষিত PPT:** সম্পূর্ণ CBT সক্ষমতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণন প্যানেলের সুপারিশ অনুযায়ী **ডিজিটালি এনক্রিপ্টেড ও স্থানীয়ভাবে মুদ্রিত** প্রশ্নপত্র ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে।
- **স্বাধীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ গঠন:** আমেরিকার NBME বা যুক্তরাজ্যের GMC-এর মতো একটি **সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন সংস্থা** গঠন করতে হবে যা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে সমস্ত জাতীয় পরীক্ষা তদারকি করবে।
- **আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা: পাবলিক এক্সামিনেশন অ্যাক্ট** কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রশ্ন ফাঁসের মামলার জন্য **ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট** গঠন করে দ্রুত সাজা নিশ্চিত করতে হবে।
- **বৃহৎ ও পরিবর্তনশীল কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক:** নিট-কে একটি **অ্যাডাপ্টিভ টেস্টিং মডেল (Adaptive testing model)** গ্রহণ করতে হবে যেখানে হাজার হাজার প্রশ্নের ভাণ্ডার থাকবে, যাতে কোনো একটি সেট ফাঁস হওয়া অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।
- **স্বচ্ছ ফলাফলের সাথে সিবিআই (CBI) তদন্ত:** জনগনের আস্থা ফেরাতে পরীক্ষা ফাঁসের তদন্তগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে **প্রকাশ্য সাজা (Public convictions)** প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
- **পরীক্ষার্থীদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা:** ব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারকে **মানসিক স্বাস্থ্য হেল্পলাইন** এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা চালু করতে হবে।

উপসংহার

- পরীক্ষার সততা নষ্ট হওয়া কেবল একটি প্রশাসনিক ভুল নয়; এটি একটি **শাসনতান্ত্রিক সংকট** (Governance crisis) যা ভারতের মেধা, সমান সুযোগ এবং শিক্ষার অধিকারের অঙ্গীকারকে আঘাত করে।
- নিট-কে একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে স্বচ্ছতা ও আস্থার মডেলে রূপান্তর করতে **রাজনৈতিক সদিচ্ছা**, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ এবং **আইনি জবাবদিহিতা** একান্ত প্রয়োজন।

এখানে আপনার প্রদান করা সম্পাদকীয় ভূমিকার অংশটির নির্ভুল এবং মার্জিত বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোকে **বোল্ড** (Bold) করে হাইলাইট করা হয়েছে।

Q. Evaluate the effectiveness of the National Testing Agency (NTA) in conducting large-scale examinations in India. What reforms are necessary to restore public trust in the examination system? 15 Marks

2.1.10. সরকার গঠনে রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা

প্রেক্ষাপট

- সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বেশ কিছু ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে: একজন **রাজ্যপাল কি এমন কোনো শর্ত আরোপ করে একটি বৈধভাবে নির্বাচিত সরকারের গঠনে বিলম্ব করতে পারেন**, যা ভারতের সংবিধানে উল্লেখ নেই?
- শপথ গ্রহণের আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ চাওয়া, সদ্য শপথ নেওয়া সরকারকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আস্থাভোটের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া এবং সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলোকে বেছে বেছে প্রয়োগ করা—এই ধরণের কর্মকাণ্ড রাজ্যপালের পদটিকে ভারতের বর্তমান **যুক্তরাষ্ট্রীয় বিতর্কের** (federal debate) কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

রাজ্যপালের পদ: সাংবিধানিক অবস্থান, ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা

- **রাজ্যপালের সাংবিধানিক অবস্থান:** ভারতীয় সংবিধানের **১৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাজ্যপাল হলেন একটি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। **১৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন এবং **১৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির (pleasure of the President) ওপর ভিত্তি করে পদে বহাল থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাজ্যপাল রাজ্যের জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন না, তাই তাঁর কোনো স্বাধীন জনমত বা ম্যান্ডেট থাকে না।
- **নির্বাহী ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধ ভূমিকা: ১৫৪ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত। তবে **১৬৩ নম্বর অনুচ্ছেদ** স্পষ্ট করে দেয় যে, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শে (aid and advice) তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ফলে রাজ্যপালের ব্যক্তিগত বিবেচনামূলক ক্ষমতার (discretion) পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং তা সংবিধান ও প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ।
- **সরকার গঠন এবং ১৬৪ নম্বর অনুচ্ছেদ: ১৬৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। এখানে রাজ্যপালের ভূমিকা হলো এমন একজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যিনি বিধানসভার আস্থা অর্জনে সক্ষম এবং তাঁকে শপথ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো। রাজ্যপাল এখানে কোনো গাণিতিক পরীক্ষক নন।
  - মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি শপথ গ্রহণের আগে পর্যাপ্ত সমর্থনের স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি জমা দিয়েছেন কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই।

- **বিধানসভাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের একমাত্র স্থান: ১৬৪(২) নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ। সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের স্থান হলো বিধানসভার কক্ষ (floor of the House), রাজ্যপালের খাসকামরা নয়। এটিই সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথা, যেখানে একটি সরকার আইনসভার ভোটে টিকে থাকে বা পড়ে যায়, কোনো সাংবিধানিক মনোনীত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মূল্যায়নে নয়।

সরকার গঠন সংক্রান্ত সাংবিধানিক রীতিনীতি এবং রাজ্যপালের ত্রুটিসমূহ

- **বিশেষজ্ঞ কমিশনগুলোর অভিন্ন সুপারিশ: সরকারিয়া কমিশন (১৯৮৮), ভেঙ্কটচালাইয়া কমিশন (২০০২)** এবং **পুঞ্চি কমিশন (২০১০)**—সবগুলোই সরকার গঠনে একই অগ্রাধিকারের ক্রম সুপারিশ করেছে: প্রথমে প্রাক-নির্বাচন জোটকে (single largest pre-poll alliance) ডাকতে হবে, এরপর একক বৃহত্তম দল যারা স্থিতিশীল সরকার গঠনের দাবি জানায়। প্রাক-নির্বাচন জোটকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কারণ ভোটাররা ভোট দেওয়ার সময় জানতেন তাঁরা ঠিক কাকে বেছে নিচ্ছেন।
- **রীতিনীতির বৈষম্যমূলক প্রয়োগ রাজ্যপালের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করেছে:** এই কমিশনগুলোর সুপারিশ সব রাজ্যে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে একক বৃহত্তম দলকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম জোটকে আগে ডাকা হয়েছে, অথবা সমপর্যায়ের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দলকে ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।
  - এই অসংগতি রাজ্যপালের নিরপেক্ষ সাংবিধানিক অবস্থান সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের ধারণা তৈরি করে।
- **সংখ্যালঘু সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি বৈধ বৈশিষ্ট্য:** ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এমন অনেক সংখ্যালঘু সরকারের উদাহরণ রয়েছে যারা শপথ গ্রহণের আগে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ ছাড়াই বৈধভাবে কাজ করেছে।
  - উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি **শঙ্কর দয়াল শর্মা**, অটল বিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান যদিও বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, এবং তাঁকে সংখ্যা প্রমাণের জন্য ১৩ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল।
  - একইভাবে, **পি.ভি. নরসিমা রাও** পূর্ণ পাঁচ বছর একটি সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকার চালিয়েছিলেন।
  - **এইচ.ডি. দেবেগৌড়া** এবং **আই.কে. গুজরাল** উভয়ই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
  - ২০০৪ সালে প্রথম **মনমোহন সিং** সরকারও সংখ্যালঘু হিসেবে শুরু হয়েছিল এবং বাইরের সমর্থনে পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করেছিল। এই কোনো ক্ষেত্রেই শপথের আগে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলা হয়নি।
- **৭২ ঘণ্টার মধ্যে আস্থাভোটের নির্দেশ দলত্যাগ বিরোধী আইনের পরিপন্থী:** নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আস্থাভোট প্রমাণের নির্দেশ দিলে তা 'ঘোড়া কেনাবেচা' (horse-trading) বা দলত্যাগের সুযোগ করে দেয়। **দশম তফশিল** বা দলত্যাগ বিরোধী আইন যা আটকানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল, এমন সংক্ষিপ্ত সময়সীমা ঠিক সেই বিশৃঙ্খলারই জন্ম দেয়।
- **একমাত্র সঠিক সাংবিধানিক প্রতিকার হলো বিরোধী দলের আনা অনাস্থা প্রস্তাব:** যখন কোনো সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রকৃত সন্দেহ দেখা দেয়, তখন সংবিধান অনুযায়ী একটিই গণতান্ত্রিক পথ খোলা আছে: বিরোধীদের বিধানসভায় **অনাস্থা প্রস্তাব (no-confidence motion)** আনতে হবে, যেখানে জনসমক্ষে বিতর্ক ও ভোটাভুটি হবে।
  - একটি নতুন সরকারকে কাজ শুরুর আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেওয়া গণতান্ত্রিক শাসনের শুরুতেই জনগণের ম্যান্ডেটকে দুর্বল করে দিতে পারে।

রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়

- **এস.আর. বোম্মাই বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৪):** এই ঐতিহাসিক রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কোনো সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের একমাত্র বৈধ সাংবিধানিক স্থান হলো **বিধানসভার কক্ষ (Floor of the Legislative Assembly)**; এর ফলে রাজ্যপালরা নিজেদের **ব্যক্তিগত মূল্যায়নের** ভিত্তিতে কোনো সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন না এবং **৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার বিষয়টি কঠোরভাবে **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার (Judicial Review)** আওতাধীন থাকে।

- **রামেশ্বর প্রসাদ বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০০৬):** আদালত এই নীতিটি পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, রাজ্যপালকে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নয় বরং **সংবিধানের প্রতিনিধি** হিসেবে কাজ করতে হবে; আদালত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, **দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে** রাজ্যপালের কোনো পদক্ষেপ বা রাজ্য বিধানসভা অসাংবিধানিকভাবে ভেঙে দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- **কর্ণাটক সরকার গঠন সংক্রান্ত বিতর্ক (২০১৮):** ফ্লোর টেস্ট বা আস্থাভোটের সময়সীমা কমিয়ে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে **পরিকল্পিত দলত্যাগ** (Engineered Defections) প্রতিরোধের পথ প্রশস্ত করেছিল; এটি এমন একটি নজির তৈরি করেছে যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে **অত্যধিক বিলম্ব এবং অত্যধিক ত্বরান্বিত** হওয়া—উভয় থেকেই রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে সরকার গঠনের জন্য রাজ্যপালের আমন্ত্রণ যেন শাস্তিমূলক না হয়ে **সহায়তামূলক** (Facilitative) হয়।

বৈশ্বিক সেরা চর্চা: উন্নত সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার গঠন প্রক্রিয়া

- **যুক্তরাজ্য:** 'ক্যাবিনেট ম্যানুয়াল' দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র এখানে নিছক একটি **সহায়তামূলক ভূমিকা** পালন করে। শপথ গ্রহণের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো প্রমাণ ছাড়াই হাউজ অফ কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এমন নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়; এর ফলে সরকারের প্রতি আস্থা স্বাভাবিকভাবেই হাউজ অফ কমন্সে **'কিংস স্পিচ' (রাজার ভাষণ)** বিতর্কের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।
- **জার্মানি:** জার্মানির **মৌলিক আইন** (Grundgesetz) অনুযায়ী, ফেডারেল প্রেসিডেন্টের ভূমিকা অত্যন্ত সামান্য কারণ আইনসভা **'কনস্ট্রাকটিভ ভোট অফ নো-কনফিডেন্স' (গঠনমূলক অনাস্থা প্রস্তাব)**-এর মাধ্যমে সরকারের টিকে থাকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে; এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বর্তমান চ্যান্সেলরকে অপসারণ করার আগে আইনসভাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন করতে হয়।
- **কানাডা:** প্রতিষ্ঠিত **সংসদীয় রীতিনীতি** অনুসরণ করে গভর্নর-জেনারেল একক বৃহত্তম দল বা জোটের নেতাকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আস্থার পরীক্ষাটি পরবর্তীতে পার্লামেন্টে **'স্পিচ ফ্রম দ্য থ্রোন' (সিংহাসন থেকে ভাষণ)** বিতর্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়; এখানে শপথ গ্রহণের আগে কোনো শাস্তিমূলক শর্ত আরোপ করা বা তাৎক্ষণিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের কোনো নজির নেই।

ভবিষ্যতের পথ: গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট রক্ষায় সাংবিধানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা

- **সরকার গঠনে সুনির্দিষ্ট বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা:** সুপ্রিম কোর্টকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ, ঝুলন্ত বিধানসভার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ক্রম এবং **আস্থাভোট** (Floor Test) পরিচালনার যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা সম্পর্কে ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক নীতি নির্ধারণ করা উচিত, যাতে সাংবিধানিক **বিবেচনামূলক ক্ষমতার** (Constitutional Discretion) স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা রোধ করা যায়।
- **আস্থাভোটের শ্রেষ্ঠত্ব কঠোরভাবে বজায় রাখা:** সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণের প্রক্রিয়া অবশ্যই শুধুমাত্র **বিধানসভার কক্ষে** (Floor of the Legislative Assembly) সম্পন্ন হতে হবে, কারণ আইনসভার আস্থা যাচাইয়ের জন্য আস্থাভোটই হলো সবচেয়ে স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিকভাবে বৈধ পদ্ধতি।
- **সাংবিধানিক কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** সরকার গঠন এবং রাজ্যপালের আচরণ সম্পর্কে **সরকারিয়া কমিশন, ভেঙ্কটচালাইয়া কমিশন** এবং **পুঞ্চি কমিশনের** সুপারিশগুলো সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবিধানিক অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- **রাজ্যপালের পদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা:** রাজ্যপালদের তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ **নিরপেক্ষতা** এবং সাংবিধানিক সংযমের সাথে পালন করা উচিত, যাতে সংসদীয় গণতন্ত্রে এই পদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকে।
- **বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগে সাংবিধানিক নৈতিকতার অনুসরণ:** বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা বা ব্যক্তিগত মূল্যায়নের পরিবর্তে **সাংবিধানিক নৈতিকতা** (Constitutional Morality), গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং জনগণের ম্যান্ডেটের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

- **সুস্থ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি শক্তিশালী করা:** সরকার গঠন সংক্রান্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলো সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষকে সমুন্নত রাখতে হবে, কারণ ভারতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস এবং **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** (Cooperative Federalism) বজায় রাখতে এই রীতিনীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **রাজ্যপালের ভূমিকাকে সহায়তামূলক কার্যে সীমাবদ্ধ রাখা:** সরকার গঠনের সময় রাজ্যপালকে একজন নিরপেক্ষ **সাংবিধানিক সহায়তাকারী** (Constitutional Facilitator) হিসেবে কাজ করতে হবে এবং এমন কোনো পদক্ষেপ এড়িয়ে চলতে হবে যা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা **সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘনের** (Constitutional Overreach) ধারণা তৈরি করতে পারে।

উপসংহার

সাম্প্রতিক বিতর্কগুলো এই বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে যে, রাজ্যপালের পদটি যেন **সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা**, সংযম এবং গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে পরিচালিত হয়। পরিশেষে, সংসদীয় গণতন্ত্র, সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং ভারতের **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** রক্ষার জন্য সাংবিধানিক রীতিনীতি শক্তিশালী করা, রাজ্যপালের বিবেচনামূলক ক্ষমতার স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং **আস্থাভোটের শ্রেষ্ঠত্ব** বজায় রাখা অপরিহার্য।

Q. The Governor's role in government formation is constitutional and facilitative, not political and discretionary. Examine in the context of recent debates on gubernatorial discretion in India. (15 Marks)

2.1.11. অনলাইন গেমিং নিয়ন্ত্রণ বনাম সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তৈরি হওয়া উভয়সঙ্কট

প্রেক্ষাপট

অনলাইন রিয়েল-মানি গেমের (যেসব খেলায় আসল টাকা জড়িত থাকে) ক্ষতিকর সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক এবং গোপনীয়তা-সংক্রান্ত কুপ্রভাব থেকে তরুণ প্রজন্ম ও দুর্বল সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে **অনলাইন গেমিং প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন (PROG) অ্যাক্ট, ২০২৫** (যা অক্টোবর ২০২৫-এ কার্যকর হয়েছে) প্রণয়ন করা হয়েছিল।

সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার অপ্রত্যাশিত কুফল

- **গ্রাহকদের অবৈধ পথে ঠেলে দেওয়া:** এই নিষেধাজ্ঞা মানুষকে খেলা থেকে বিরত করতে পারেনি, বরং এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের নিরাপদ ও আইনি ভারতীয় অ্যাপ ছেড়ে **অবৈধ ও ট্র্যাক করা অসম্ভব এমন বিদেশি (offshore) ওয়েবসাইটের** দিকে যেতে বাধ্য করেছে।
- **অবৈধ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলির রমরমা বৃদ্ধি:** দেশীয় ওয়েবসাইটগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে মহারাষ্ট্র, দিল্লি এবং তামিলনাড়ুর মতো বড় রাজ্যগুলিতে **অননুমোদিত বিদেশি প্ল্যাটফর্ম** ব্যবহারের হার এক ধাক্কায় প্রচুর বেড়ে গেছে।
- **গুরুতর অপরাধের ঢাল হয়ে ওঠা:** যেহেতু এই বিদেশি ওয়েবসাইটগুলি ভারতীয় আইনের এক্তিয়ারের বাইরে কাজ করে, তাই এগুলি খুব সহজেই **মানি লন্ডারিং (কালো টাকা সাদা করা), সাইবার জালিয়াতি এবং সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের** (terror funding) মতো অপরাধের গোপন আস্তানা হয়ে উঠছে।
- **খেলোয়াড়দের সমস্ত আইনি সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া:** কোনো ব্যবহারকারী যখন এই ধরনের বিদেশি সাইটের দ্বারা প্রতারিত বা ঋণের জালে ফেঁসে যান, তখন দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাহায্য করতে পারে না। ফলে খেলোয়াড়দের হাতে কোনো **আইনি প্রতিকারের উপায় থাকে না**।

- **প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থ হওয়া:** ব্যবহারকারীরা ভিপিএন (VPN), প্রক্সি সার্ভার এবং টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো এনক্রিপ্টেড অ্যাপের গোপন লিঙ্কের সাহায্যে সরকারের দেওয়া **ইউআরএল (URL) ব্লক বা নিষেধাজ্ঞা মাত্র কয়েক সেকেন্ডে এড়িয়ে যাচ্ছে**।

জড়িত থাকা বিভিন্ন হুমকি: নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং সমাজ

১. **নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকি**

- **অবৈধ নেটওয়ার্কে অর্থায়ন:** অনিয়ন্ত্রিত বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলি সরাসরি **মানি Laundering এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থ জোগানোর** সহজ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।
- **সংগঠিত সাইবার জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত:** অপরাধী চক্রগুলি টেলিগ্রামের মতো এনক্রিপ্টেড অ্যাপ ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকদের **নকল বিডিং (Old Coin Purchase Task-এর মতো জাল নিলাম) এবং বিভিন্ন ফেক টাস্কের** ফাঁদে ফেলছে।
- **"মিউল অ্যাকাউন্ট" (Mule Account)-এর ফাঁদ:** অপরাধী চক্রগুলি অল্প কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রামের দরিদ্র ও সরল মানুষদের নামে **স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট** খোলায়। পরবর্তী সময়ে সাইবার অপরাধের মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া টাকা দেশের বাইরে পাচার করার জন্য এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করা হয়।

২. **অর্থনৈতিক হুমকি**

- **বিপুল রাজস্ব বা ট্যাক্স ক্ষতি:** সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার ফলে একটি অত্যন্ত লাভজনক এবং বড় দেশীয় খাত থেকে **সরকার বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স বা রাজস্ব পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে**। একই সাথে পুরো বাজারের লভ্যাংশ অবৈধ বিদেশি অপারেটরদের হাতে চলে যাচ্ছে।
- **দেশের পুঁজি বাইরে চলে যাওয়া:** ভারতের বিশাল অঙ্কের টাকা ট্র্যাক করা অসম্ভব এমন **অন্ধকার বিদেশি আর্থিক চ্যানেলের** মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।

৩. **সামাজিক হুমকি**

- **গ্রাহক সুরক্ষার অভাব:** প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যবহারকারীদের জন্য সরকারের কোনো **অভিযোগ পোর্টাল** (grievance portals) **বা আইনি সহায়তা** পাওয়ার সুযোগ থাকে না।
- **অনিয়ন্ত্রিত জনস্বাস্থ্য সংকট:** সরকারি নজরদারি ও কঠোর নিয়ম না থাকায় গেম খেলার ক্ষেত্রে **টাকা খরচের কোনো নির্দিষ্ট সীমা** (spending limits) **বা সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা** থাকছে না। ফলে মানুষ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে, যা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সেরা কিছু প্রয়াস

- **সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (UAE):** তারা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে একটি অত্যন্ত কঠোর **ফেডারেল লাইসেন্সিং কাঠামো** তৈরি করেছে, যেখানে টাকা খরচের সীমা নির্ধারণ এবং আসক্তি মুক্তির সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা রয়েছে।
- **শ্রীলঙ্কা:** ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে তারা একটি কেন্দ্রীয় **গ্যাম্বলিং রেগুলেটরি অথরিটি** গঠন করতে চলেছে, যাতে অনিয়ন্ত্রিত বিদেশি ডিজিটাল কার্যক্রমকে দেশের আইনি কাঠামোর অধীনে আনা যায়।

উত্তরণের উপায়

- **নিষেধাজ্ঞা বাদ দিয়ে বাস্তবসম্মত নিয়ন্ত্রণ বজায়:** সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে একটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, **দেশীয় লাইসেন্সিং কাঠামো** চালু করা উচিত। এটি এই পুরো খাতটিকে সবার সামনে বা আলোর নিচে নিয়ে আসবে, যার ফলে সবকিছুর ওপর নজরদারি চালানো এবং আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।
- **একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন করা:** গেমারদের কঠোর সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি নির্দিষ্ট ফেডারেল ওয়াচডগ বা **কেন্দ্রীয় নজরদারি সংস্থা** তৈরি করতে হবে। এই সংস্থা বাধ্যতামূলক **কেওয়াইসি (KYC) যাচাইকরণ**, প্রতিদিন টাকা জমা দেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা এবং আসক্তি দূর করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবে।

- **রাজস্বের টাকা জনকল্যাণে ব্যবহার করা:** নিয়ন্ত্রিত দেশীয় গেমিং ব্যবস্থার ওপর ট্যাক্স বসাতে হবে এবং সেই অর্জিত রাজস্ব সরাসরি **উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদেশি সাইটগুলির ওপর নজরদারি চালানোর টুল তৈরি করতে** ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জোরালো প্রচার অভিযানে ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ করতে হবে।
- **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী করা:** কেন্দ্র সরকার (যারা তালিকা-১ এর অধীনে ইন্টারনেট বা আইটি আইন নিয়ন্ত্রণ করে) এবং রাজ্য সরকারগুলির (যারা তালিকা-২ এর অধীনে বাজি বা বেটিং আইন নিয়ন্ত্রণ করে) মধ্যে একটি **যৌথ ও সমন্বিত কাঠামো** তৈরি করতে হবে, যাতে আন্তঃরাজ্য সাইবার জালিয়াতি চক্রগুলিকে কার্যকরভাবে ধ্বংস করা যায়।
- **কঠোর অ্যালগরিদম অডিট করা:** দেশীয় গেমিং অ্যাপ বা অপারেটরদের জন্য **এআই (AI) চালিত প্রযুক্তি** ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করতে হবে, যা কোনো খেলোয়াড়ের অস্বাভাবিক বা ক্ষতিকর জুয়া খেলার আসক্তিকে চিহ্নিত করবে এবং বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হওয়ার আগেই তাকে আটকে দেবে।

উপসংহার

নিষেধাজ্ঞার পথ থেকে সরে এসে **স্মার্ট রেগুলেশন বা বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ** ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতের ডিজিটাল সীমান্ত সুরক্ষিত হবে। সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বদলে একটি **কঠোর লাইসেন্সিং কাঠামো** তৈরি করলে নীতিনির্ধারকেরা একদিকে যেমন বিদেশি অপরাধী চক্র বা সিন্ডিকেটগুলি ধ্বংস করতে পারবেন, অন্যদিকে দেশের **দুর্বল জনগোষ্ঠী** সুরক্ষিত থাকবে এবং সংগৃহীত রাজস্ব **প্রযুক্তি-ভিত্তিক আইন প্রয়োগের** কাজে লাগানো যাবে।

Q. "Blanket bans on online gaming are often counterproductive in the digital age." Discuss in the context of the rise of offshore betting platforms and the need for a robust regulatory framework in India. (15 Marks)

2.1.12. ভারতের বিচার ব্যবস্থার বাজেটে আর্থিক ভারসাম্যহীনতা

প্রেক্ষাপট

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট কোনো আর্থিক বরাদ্দ করা হয়নি। ভারতের ১১টি উচ্চ-জিডিপি (GDP) সম্পন্ন রাজ্যের (যেমন—গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তর প্রদেশ ইত্যাদি) বাজেট বিশ্লেষণ করলে একটি গভীর কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি দেখায় যে, ভারত এখনও ন্যায়বিচারকে মামলার **মীমাংসা বা বিচার** করার চেয়ে আইন **প্রয়োগ ও নজরদারি**র দৃষ্টিকোণ থেকেই বেশি দেখছে।

ভারতে বিচার ব্যবস্থার খরচের বর্তমান পরিস্থিতি

- **রাজ্য স্তরের ব্যয়:** ভারতের ১১টি ধনী বা উচ্চ-জিডিপি রাজ্য তাদের মোট বাজেটের মাত্র গড়ে **৪.৬%** টাকা সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার (পুলিশ, কারাগার, বিচার বিভাগ এবং আইনি সহায়তা) জন্য খরচ করে।
- **বৈশ্বিক তুলনা:** ইউরোপ যেখানে তাদের মোট জিডিপি-র (GDP) প্রায় **০.৩১%** টাকা ন্যায়বিচারের জন্য খরচ করে (যার মধ্যে পুলিশ খরচ অন্তর্ভুক্ত নেই), সেখানে ভারতে রেকর্ড পরিমাণ মামলার চাপ থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগের বাজেট মোট রাজ্য বাজেটের **১%-এরও কম**।
- **মাথাপিছু খরচের অসমতা:**
  - **পুলিশ:** জাতীয় স্তরে ১,৫০০ টাকা | ১১টি উচ্চ-জিডিপি রাজ্যে গড়ে **১,৬১৬ টাকা**।
  - **কারাগার: ১৫০ টাকা**।
  - **বিচার বিভাগ: ৪৫০ টাকা**।

- **বিনামূল্যে আইনি সহায়তা:** মাত্র **৯ টাকা**।

স্তম্ভ-ভিত্তিক কাঠামোগত ঘাটতি

ক) পুলিশিং: আইন প্রয়োগ এবং নজরদারির ওপর অতিরিক্ত জোর

- **অসম বণ্টন:** বড় রাজ্যগুলিতে বিচার ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ করা মোট অর্থের **৮০%-এরও বেশি** একা পুলিশ বিভাগই গ্রাস করে।
- **গুণগত মানের অভাব:** এই তহবিলের বেশিরভাগ টাকাই চলে যায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দিতে এবং প্রতিদিনের প্রশাসনিক সমস্যা সামলাতে। দীর্ঘমেয়াদি গুণগত মান বাড়ানোর ক্ষেত্রগুলি অবহেলিত থেকে যায়:
  - **প্রশিক্ষণ:** পুলিশ বাজেটের **১.৫%-এরও কম** টাকা প্রশিক্ষণের জন্য দেওয়া হয়।
  - **ফরেনসিক (বৈজ্ঞানিক তদন্ত):** পায় মাত্র আনুমানিক **১%** টাকা।

খ) বিচার বিভাগ: বিপুল মামলার চাপ বনাম ক্ষমতার অভাব

- **নিম্ন আদালতের সংকট:** দেশের ৩,৫০০টি জেলা আদালত হাইকোর্টের চেয়ে **৭ গুণ বেশি** মামলা সামলায়, কিন্তু তারা বাজেট পায় হাইকোর্টের তুলনায় মাত্র **৩ গুণ**।
- **জনসংখ্যার তুলনায় বিচারকের ঘাটতি:** বর্তমানে প্রতি ১০ লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে বিচারকের সংখ্যা মাত্র **১৫ জন**। এটি ১৯৮৭ সালের ল কমিশন বা আইন কমিশনের সুপারিশের চেয়ে অনেক কম, যেখানে প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য **৫০ জন বিচারক** রাখার কথা বলা হয়েছিল।
- **প্রশাসনিক ঘাটতি:** জেলা আদালতে প্রতিটি বিচারকের পদের বিপরীতে সাচিবিক ও কেরানির কাজের জন্য অন্তত **৫ থেকে ৯টি অন্য পদের** প্রয়োজন, যা এখনও পূরণ করা হয়নি। এছাড়া বিচার বিভাগের মোট বাজেটের মাত্র ১% টাকা প্রশিক্ষণের জন্য খরচ করা হয়।

গ) কারাগার: অতিরিক্ত ভিড় এবং কম গুরুত্ব

- **কম বরাদ্দ:** কারাগারগুলি রাজ্য বাজেটের মাত্র একটি সামান্য অংশ অর্থাৎ **০.১৪%** টাকা পায়।
- **পরিকাঠামোগত চাপ:** উচ্চ-জিডিপি রাজ্যগুলির কারাগারগুলিতে ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি কয়েদি থাকে, যার গড় হার **১৩৭%** (এটি জাতীয় গড় ১৩১%-এর চেয়েও বেশি)।
- **জনবল সংকট:** কারাগারগুলি অন্তত **৩০% কর্মী শূন্যতা** নিয়ে চলছে এবং কারাগারে কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি ১০০ টাকার মধ্যে মাত্র **০.২৩ টাকা (২৩ পয়সা)** খরচ করা হয়।

ঘ) আইনি সহায়তা এবং স্বাধীন তদারকি সংস্থা: সবচেয়ে দুর্বল লিঙ্ক

- **আইনি সহায়তা:** এটি সবচেয়ে কম তহবিল পায় (মাথাপিছু মাত্র **৯ টাকা**)। ফলে গরিব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সংবিধানের **ধারা ৩৯এ (Article 39A)** অনুযায়ী বিনামূল্যে আইনি সহায়তা ও সমতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মূল মাধ্যমটিই পঙ্গু হয়ে পড়েছে।
- **রাজ্য মানবাধিকার কমিশন (SHRCs):** এই স্বাধীন তদারকি সংস্থাগুলি তীব্র আর্থিক সংকটে ভুগছে। এরা মাথাপিছু পায় মাত্র **৮০ পয়সা** এবং এখানে **৪০%-এরও বেশি কর্মী পদ খালি** পড়ে রয়েছে, যার ফলে এরা মৌলিক কাজগুলো করতেই হিমশিম খাচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **ই-কোর্টস মিশন মোড প্রজেক্ট - তৃতীয় পর্যায় (e-Courts Mission Mode Project - Phase III):** এর উদ্দেশ্য হলো কাগজের ব্যবহার ছাড়া ডিজিটাল আদালত তৈরি করা, ক্লাউড ডেটা স্টোরেজ বাড়ানো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুলে থাকা মামলার পূর্বাভাস দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক করা।
- **টেলি-ল স্কিম (Tele-Law Scheme):** কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC)-এ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রান্তিক নাগরিকদের প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যুক্ত করে একদম তৃণমূল স্তরে আইনি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এর লক্ষ্য।

- **বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামোর জন্য কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম (CSS for Judicial Infrastructure):** রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আধুনিক আদালত ভবন, বিচারকদের জন্য আবাসন এবং সাধারণ মানুষের বসার ঘরের মতো নাগরিক সুবিধা তৈরির জন্য এই প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।
- **ন্যায় বিকাশ পোর্টাল (Nyaya Vikas Portal):** এটি একটি অনলাইন তদারকি ব্যবস্থা, যা দেশের বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং তহবিল ছাড়ের পরিস্থিতি সরাসরি বা রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করে।
- **জাতীয় প্রচার অভিযান - আমাদের সংবিধান আমাদের সম্মান:** এর লক্ষ্য হলো 'সবকো ন্যায়, হর ঘর ন্যায়'-এর মতো স্থানীয় প্রচারের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো।

দুর্বল আইনি সহায়তা ও তদারকি সংস্থার প্রভাব

- **ন্যায়বিচারকে বিলাসবহুল বানিয়ে তোলে:** আইনি সহায়তা দুর্বল হলে ভালো মানের আইনি লড়াই কেবল ধনীদের অধিকার হয়ে দাঁড়ায়, যা গরিবদের নাগালের বাইরে চলে যায়।
- **পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়:** দরিদ্র নাগরিকরা টাকার অভাবে সঠিক সময়ে আইনজীবী পান না এবং সামান্য কারণেও দীর্ঘদিন জেলে পচতে বাধ্য হন।
- **সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে:** দুর্বল আইনি সহায়তার কারণে সংবিধানের ধারা ৩৯এ (বিনামূল্যে আইনি সাহায্য) সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।
- **মানবাধিকার রক্ষাকারীদের পঙ্গু করে:** মাথাপিছু মাত্র ৮০ পয়সা পাওয়ায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনগুলো বড় বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত করতেই পারে না।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ভুলগুলো ঢাকা পড়ে যায়:** তদারকি সংস্থাগুলোতে ৪০% পদ খালি থাকায় সরকারি ব্যবস্থার অন্যায় বা ভুলত্রুটিগুলো কোনো রকম স্বাধীন পরীক্ষা ছাড়াই পার পেয়ে যায়।

ভবিষ্যতের করণীয়

- **বাজেটের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা:** কেবল পুলিশ বা আইন প্রয়োগের ওপর জোর না দিয়ে, বাজেটের একটা বড় অংশ আদালত তৈরি, কারাগার সংস্কার এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তার পেছনে খরচ করতে হবে।
- **শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা:** ল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য ৫০ জন বিচারক নিয়োগের লক্ষ্য পূরণে এবং সহকারী কর্মী নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।
- **মানবসম্পদের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ:** আধুনিক ফরেনসিক ল্যাব তৈরি এবং পুলিশ ও বিচারকদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ অন্তত ৫% বাড়াতে হবে, যাতে তদন্তের মান বাড়ে।
- **আইনি সহায়তার জন্য স্থায়ী তহবিল:** গরিব মানুষের বিনামূল্যে আইনি লড়াইয়ের অধিকার সুরক্ষিত করতে আইনি সহায়তা কেন্দ্রের জন্য একটি স্থায়ী এবং মুদ্রাস্ফীতি-সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।
- **মানবাধিকার কমিশনগুলোকে শক্তিশালী করা:** রাজ্য মানবাধিকার কমিশনগুলির (SHRC) সব শূন্যপদ পূরণ করতে হবে এবং তাদের পর্যাপ্ত স্বাধীন তহবিল দিতে হবে যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

উপসংহার

ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে একটি **সাংবিধানিক ও সুষম পুনর্বিন্যাসকৃত** বিচার বিভাগীয় বাজেট অত্যন্ত জরুরি। **প্রযুক্তি-নির্ভর বিচার ব্যবস্থা** এবং **জনবান্ধব আইনি পরিবেশের** পেছনে বিনিয়োগই ভারতকে স্রেফ বলপ্রয়োগের শাসন থেকে একটি **ভবিষ্যতমুখী ও অধিকার-সচেতন গণতন্ত্রে** রূপান্তরিত করবে।

Q. Critically analyse the impact of underfunding of judiciary, legal aid, and prisons on the constitutional promise of access to justice in India. (15 Marks)

2.1.13. SHANTI আইন, ২০২৫-এর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা: জাতীয় শক্তির চাহিদা এবং জীবন ধারণের অধিকারের ভারসাম্য

প্রেক্ষাপট

- ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act, 2025-এর সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করছে, যা পারমাণবিক খাতে **বেসরকারি অংশগ্রহণ** নিশ্চিত করে।
- আইনি চ্যালেঞ্জের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো—নতুন আইনে প্রদত্ত **আর্থিক দায়বদ্ধতার সীমা** (liability caps) এবং **সরবরাহকারীদের অব্যাহতি** (supplier exemptions) সংবিধানের **২১ নম্বর অনুচ্ছেদে** বর্ণিত মৌলিক **জীবন ধারণের অধিকার** (Right to Life) লঙ্ঘন করে কি না।

ভারতের বর্তমান ও ঐতিহাসিক পারমাণবিক দায়বদ্ধতা কাঠামো

SHANTI আইন প্রবর্তনের আগে, ভারত একটি কঠোর ব্যবস্থা অনুসরণ করত যা মূলত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতাকে অগ্রাধিকার দিত।

- **পারমাণবিক শক্তি আইন, ১৯৬২ (Atomic Energy Act of 1962):** এই ঐতিহাসিক কাঠামোটি পারমাণবিক শক্তিকে একচেটিয়া **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্য** হিসেবে বজায় রেখেছিল, যা মূলত 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড' (NPCIL)-এর মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হতো।
- **সিভিল লায়বিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট (CLNDA), ২০১০:** আগের এই আইনে **"রাইট অফ রিকোর্স"** (Right of Recourse) বা প্রতিকারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা অপারেটরদের ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জামের জন্য সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিত; এই বিধানটি বর্তমানে অত্যন্ত শিথিল করা হয়েছে।
- **বেসরকারি বাজারের দিকে পরিবর্তন:** SHANTI আইনের অধীনে এই রূপান্তরটি সরকারি অর্থায়নে চালিত জ্বালানি নিরাপত্তা থেকে বিশ্বব্যাপী **বেসরকারি পুঁজি** সম্বলিত বাজার-চালিত পদ্ধতির দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

SHANTI আইন, ২০২৫-এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

SHANTI আইন ভারতের পারমাণবিক শক্তি প্রশাসনে একটি আমূল পরিবর্তন এনেছে, যা ১৯৬২ সালের পারমাণবিক শক্তি আইন এবং ২০১০ সালের সিভিল লায়বিলিটি আইনকে কার্যত বাতিল করে। এটি ভারতের **নিট-জিরো নির্গমন** (Net-Zero emissions) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পারমাণবিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইনি কাঠামোকে আধুনিকীকরণ করতে চায়।

- **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান:** প্রথমবারের মতো, এই আইন **বেসরকারি সংস্থা** এবং **বিদেশি কর্পোরেশনগুলিকে** ভারতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মালিকানা এবং পরিচালনার অনুমতি দেয়।
- **স্তরভিত্তিক দায়বদ্ধতা কাঠামো:** এই আইন চুল্লির তাপীয় ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে একটি ধাপে ধাপে দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা চালু করে। বড় চুল্লিগুলির (৩,০০০ মেগাওয়াট থার্মালের উপরে) ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার সীমা প্রায় **৩,০০০ কোটি থেকে ৪,০০০ কোটি টাকা**।
- **সরবরাহকারীর সুরক্ষা (Supplier Indemnity):** ২০১০ সালের আইনের থেকে এটি একটি বড় বিচ্যুতি কারণ এতে সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে **"রাইট অফ রিকোর্স"** বাতিল করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায়, সরবরাহকারীরা সাধারণত দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি পায়, যদি না কোনো লিখিত চুক্তি বা ক্ষতির স্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়।
- **সংহত নিয়ন্ত্রণ:** এই আইন **অ্যাটোমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড**-কে সংবিধিবদ্ধ মর্যাদা দেয় এবং একটি **নিউক্লিয়ার লায়বিলিটি ফান্ড** (Nuclear Liability Fund) গঠন করে।

কেন সরকার SHANTI আইনকে কৌশলগত সমর্থন দিচ্ছে?

- **জ্বালানি নিরাপত্তা ও বিদ্যুতের চাহিদা:** ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং শিল্পের প্রসারের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরি। পারমাণবিক শক্তিকে একটি স্থিতিশীল উৎস হিসেবে দেখা হচ্ছে যা আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাবে এবং **ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা** থেকে ভারতকে রক্ষা করবে।
- **জলবায়ু প্রতিশ্রুতি এবং নিট-জিরো ২০৭০:** ২০৭০ সালের মধ্যে **নিট-জিরো** নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পারমাণবিক শক্তি ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- **বিদেশি বিনিয়োগ এবং উন্নত প্রযুক্তি:** বড় পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন। বিদেশি অংশগ্রহণের মাধ্যমে **আধুনিক চুল্লি** এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **কৌশলগত প্রতিযোগিতা:** ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মতো দেশগুলি বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে সাফল্য পেয়েছে। তাই ভারতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা এবং **কৌশলগত সক্ষমতা** বৃদ্ধিতে এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হচ্ছে।

SHANTI আইন, ২০২৫-এর মূল চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সাংবিধানিক "পরম দায়বদ্ধতা" (Absolute Liability) মানের অবক্ষয়**

- **ওলিউম গ্যাস লিক মামলা (১৯৮৬)-এর প্রেক্ষাপট:** ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর সুপ্রিম কোর্ট Absolute Liability বা পরম দায়বদ্ধতার নীতি তৈরি করে, যেখানে বলা হয়েছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত সংস্থাকে যে কোনো ক্ষতির জন্য **শর্তহীন ক্ষতিপূরণ** দিতে হবে।
- **আইনি সংঘাত:** দায়বদ্ধতাকে **৪,০০০ কোটি টাকার** নিচে সীমাবদ্ধ করে এই আইন "পরম" কর্তব্যকে সীমিত করে দিচ্ছে, যার ফলে বড় কর্পোরেশনগুলো বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্তি পেতে পারে।
- **ডিপ পকেট নীতি (Deep Pocket Principle):** ঐতিহাসিক বিচারিক নীতি অনুযায়ী, সংস্থা যত বড় এবং সমৃদ্ধ হবে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তত বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু এই আইনে সবার জন্য একই নিম্ন সীমা ধার্য করা হয়েছে।

২. **আর্থিক ঝুঁকি এবং "ক্ষতির সামাজিকীকরণ" (Socialization of Losses)**

- **করদাতার ঝুঁকি:** যদি চেরনোবিল বা ফুকুশিমার মতো বড় দুর্ঘটনা ঘটে, তবে ক্ষতির পরিমাণ ৪,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।
- **অবশিষ্ট বোঝা:** অপারেটরের দায় সীমাবদ্ধ হওয়ায়, পরিচ্ছন্নতা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কোটি কোটি টাকা **ভারত সরকার এবং সাধারণ করদাতাদের** বহন করতে হবে।
- **পলিউটার পেস (Polluter Pays) নীতির অবমাননা:** এটি পরিবেশগত আইনের মূল নীতিকে লঙ্ঘন করে, কারণ ঝুঁকির জন্য দায়ী সংস্থা সম্পূর্ণ আর্থিক পরিণাম ভোগ করছে না।

৩. **সরবরাহকারীর অব্যাহতি এবং 'মোরাল হ্যাজার্ড' (Moral Hazard)**

- **প্রতিকারের অধিকার বিলোপ:** সরবরাহকারীদের সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়ার ফলে অপারেটররা ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জামের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না।
- **নিরাপত্তার ঘাটতি:** আইনি পরিণতির ভয় না থাকায় সরবরাহকারীরা **নিরাপত্তার মান বজায় রাখতে** কম উৎসাহিত হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

৪. **বিদেশি বিনিয়োগের (FDI) জন্য "রেশ টু দ্য বটম" (Race to the Bottom)**

- **নিরাপত্তার বিনিময়ে পুঁজি:** সমালোচকদের মতে, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে গিয়ে জননিরাপত্তা এবং **২১ নম্বর অনুচ্ছেদকে** বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।
- **বৈশ্বিক দ্বিমুখী নীতি:** বিদেশি সংস্থাগুলি ভারতে সীমিত দায়বদ্ধতা উপভোগ করলেও তাদের নিজস্ব দেশে অনেক বেশি কঠোর আইনি জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক এবং নিয়ন্ত্রক তদারকির দুর্বলতা**

- **রেগুলেটরি ক্যাপচার (Regulatory Capture):** বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার চাপে নিরাপত্তা পরিদর্শন শিথিল হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **জবাবদিহিতার অভাব:** বেসরকারি সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ করলেও, তাদের **১২ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে "রাষ্ট্র" হিসেবে গণ্য না করায় নাগরিকরা তাদের সরাসরি জবাবদিহি করতে পারে না।

আগামীর পথ

- **লায়বিলিটি ক্যাপ বা দায়ের সীমা সংশোধন:** একটি পারমাণবিক দুর্ঘটনার বাস্তব ক্ষয়ক্ষতির কথা মাথায় রেখে এই সীমাটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।
- **সরবরাহকারীর দায়বদ্ধতা পুনঃস্থাপন:** সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মান বজায় রাখতে সরবরাহকারীদের আইনি ও বাণিজ্যিক জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- **স্বাধীন পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ গঠন:** একটি সম্পূর্ণ **স্বায়ত্তশাসিত এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম** নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরি করতে হবে যা লাইসেন্স প্রদান এবং নিরাপত্তা অডিট পরিচালনা করবে।
- **বীমা এবং ক্ষতিপূরণ পুল:** অপারেটর, সরবরাহকারী এবং সরকারের অংশগ্রহণে একটি নিবেদিত জাতীয় তহবিল গঠন করতে হবে।
- **সংসদীয় পর্যালোচনা:** আইনটিকে একটি **সংসদীয় স্থায়ী কমিটির** কাছে পাঠাতে হবে যেখানে বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের মতামত নেওয়া যায়।
- **আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদান:** ভারত 'Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage' অনুসমর্থন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

উপসংহার

SHANTI আইন, ২০২৫ সংক্রান্ত বিতর্কটি এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, ভারতের **জ্বালানি নিরাপত্তা** এবং **জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা** অর্জনের জন্য পারমাণবিক শক্তির সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ঠিকই, তবে **জননিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা, সাংবিধানিক অধিকার** এবং কঠোর **কর্পোরেট জবাবদিহিতা** অবশ্যই ভারতের পারমাণবিক শাসন কাঠামোর মূল নীতি হিসেবে বজায় থাকতে হবে।

Q. Balancing nuclear energy expansion with public safety remains one of the biggest governance challenges for India. In the light of the SHANTI Act, 2025, analyse the key challenges and suggest suitable reforms. 15 Marks

2.1.14. ভারতের বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা এবং আদালত অবমাননা ক্ষমতার সীমা

প্রেক্ষাপট

একটি গণতন্ত্রে আদালতের বৈধতা কেবল সাংবিধানিক কর্তৃত্ব থেকে আসে না, বরং **জনসাধারণের বিশ্বাসের (Public Trust)** ওপর ভিত্তি করেও গড়ে ওঠে। এই বিশ্বাস তখনই বজায় থাকে যখন প্রতিষ্ঠানগুলো **জনসাধারণের পর্যালোচনার (Public Scrutiny)** জন্য উন্মুক্ত থাকে। আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা বিচারবিভাগের মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হলেও, সাম্প্রতিক কিছু **অলঙ্কারিক আধিক্য (Rhetorical Excesses)** এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ বাকস্বাধীনতার ওপর একটি **ভীতিপ্রদ প্রভাব (Chilling Effect)** সৃষ্টি করার উদ্বেগ তৈরি করেছে।

সাম্প্রতিক বিচারবিভাগীয় বিতর্ক

একটি **"ভীতিপ্রদ প্রভাব"** (Chilling Effect) তখনই ঘটে যখন মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তির ভয়ে তাদের মনের কথা বলতে ভয় পায়।

- **কঠোর ভাষার প্রয়োগ** (Use of Harsh Language): সম্প্রতি একজন আইনজীবীর পদোন্নতি সংক্রান্ত শুনানির সময়, ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্যকান্ত কিছু ব্যক্তি এবং RTI **অ্যাক্ট** ব্যবহারকারী তরুণ আইনজীবীদের বর্ণনা করতে **"পরজীবী"** (Parasites) এবং **"তেলাপোকা"** (Cockroaches) এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। এমনকি এই শব্দগুলি যদি ভুয়ো ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেও বলা হয়ে থাকে, তবুও দেশের সর্বোচ্চ আসন থেকে এই ধরনের তকমা ব্যবহার করা **ভয় এবং অসম্মানের** পরিবেশ তৈরি করে।
- NCERT **পাঠ্যপুস্তক বিতর্ক** (NCERT Textbook Controversy): NCERT স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্কের পর, সুপ্রিম কোর্ট সেই অধ্যায়গুলি খসড়া তৈরিতে সহায়তাকারী **তিনজন শিক্ষাবিদের** প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাঁদের কোনো **পক্ষ সমর্থনের সুযোগ** (Fair Hearing) না দিয়েই সরকারি স্কুলের পাঠ্যক্রমের কাজ থেকে কার্যত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের** (Natural Justice) মৌলিক নীতির পরিপন্থী।
- **বিচারক এবং অভিযোগকারী যখন একই ব্যক্তি** (Aggrieved Party and Arbiter): এই ঘটনাটি আদালতকে একই সাথে **ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এবং বিচারক** (Aggrieved Party and Arbiter) হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এটি সরাসরি "Nemo judex in causa sua" নীতিটি লঙ্ঘন করে (যার অর্থ: কেউ নিজের মামলার বিচারক হতে পারবে না)। ন্যায়বিচার কেবল হওয়াই উচিত নয়, বরং এটি একটি **নিরপেক্ষ পক্ষের** মাধ্যমে হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হওয়া উচিত।
- **গ্যাগ অর্ডার সংক্রান্ত মামলা** (Gag Order Case): আলী খান মাহমুদাবাদ মামলার মতো ঘটনাগুলিতে, আদালত আইনি সুরক্ষা প্রদান করলেও একটি **"গ্যাগ অর্ডার"** (Gag Order) বা নীরব থাকার নির্দেশ জারি করেছে। এটি এমন একটি প্রবণতা দেখায় যেখানে আদালত আইন ভঙ্গ হয়েছে কি না তা বিচার করার পরিবর্তে **জনসাধারণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ** করার চেষ্টা করছে।
- RTI **স্বচ্ছতার অভাব:** যখন একজন সাংবাদিক সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কাছে বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তথ্য চেয়েছিলেন, তখন সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। অথচ, পরে **আইন মন্ত্রক** (Law Ministry) দেখায় যে সেই তথ্যের অস্তিত্ব ছিল। রেজিস্ট্রি তখন এই অনুরোধটিকে **"ফিশিং অ্যান্ড রোভিং"** (Fishing and Roving) বলে অভিহিত করে। এটি স্বচ্ছতার আইন মেনে চলার পরিবর্তে আদালতের নিজের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার মতো দেখায়।

বিচারবিভাগ কেন জনসাধারণের সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত?

- **রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগকারী জন-প্রতিনিধি হিসেবে বিচারক:** প্রাক্তন সিজেআই (CJI) ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, বিচারকরা হলেন জন-প্রতিনিধি যারা রাষ্ট্রের বিশাল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যেহেতু তাঁদের সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, তাই বিচারবিভাগকেও—নির্বাহী বা আইনসভার মতো—**জনসাধারণের পর্যালোচনা** (Public Scrutiny) এবং **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার** (Democratic Accountability) অধীনে থাকা উচিত।
- **স্বীকৃত হাতিয়ার হিসেবে তথ্য জানার অধিকার** (RTI): সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা আনতে RTI **আইন, ২০০৫** প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিচারবিভাগীয় প্রশাসন সম্পর্কে তথ্য চাওয়া একটি **বৈধ গণতান্ত্রিক অধিকার** এবং আদালতগুলোর একে "বিদ্বেষমূলক সক্রিয়তা" বা "অহেতুক অনুসন্ধান" হিসেবে দেখা উচিত নয়।
- **ভিন্নমতের ওপর 'ভীতিপ্রদ প্রভাব' (Chilling Effect) রোধ:** বিচারবিভাগ যখন আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে কঠোর ভাষা ব্যবহার করে, তখন এটি যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই একটি প্রাতিষ্ঠানিক নিন্দার মতো কাজ করে। এটি একটি **"ভীতিপ্রদ প্রভাব"** (Chilling Effect) তৈরি করে, যার ফলে আইনজীবী, সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদরা বৈধ উদ্বেগ প্রকাশ করতে ভয় পান, যা শেষ পর্যন্ত **যুক্তিসঙ্গত ভিন্নমতকে** (Legitimate Dissent) স্তব্ধ করে দেয়।
- **বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা:** আইনের শাসনের একটি মূল নীতি হলো—যিনি নিজে সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত, তিনি নিজেই বিচারক হতে পারেন না। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে আদালতকে অবশ্যই **"সংক্ষুব্ধ পক্ষ"** (Aggrieved Party) এবং **"বিচারক"** (Arbiter) হিসেবে নিজের ভূমিকাকে আলাদা করতে হবে যাতে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্বের ধারণা তৈরি না হয়।

- **সামাজিক অডিট এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ:** সমালোচনা একটি **সামাজিক অডিট** (Social Audit) হিসেবে কাজ করে যা বিচারবিভাগকে একটি বিচ্ছিন্ন "আইভরি টাওয়ার" বা সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধা দেয়। পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আইনি ব্যবস্থাকে আরও গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, যা প্রায়শই **পুরানো বা ভুল রায়** (Outdated or Incorrect Judgments) সংশোধনের পথ প্রশস্ত করে।
- **বাকস্বাধীনতা সর্বজনীন:** ভারতীয় সংবিধানের **ধারা ১৯(১)(ক)** কথা বলার অধিকারকে সুরক্ষা দেয়। এই অধিকারের মধ্যে সরকারের যেকোনো শাখার—আদালতসহ—কাজের প্রতি অসংকুচিতভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত, যতক্ষণ না তা শালীনভাবে করা হয়।

আদালত অবমাননার ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতার ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ

১. **দায়বদ্ধতার অভাব** (Accountability Gap): মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিচারবিভাগ বিশাল সাংবিধানিক ক্ষমতা ভোগ করে, কিন্তু বিচারবিভাগের **স্বাধীনতা** (Judicial Independence) ক্ষুণ্ণ না করে বিচারকদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো শক্তিশালী **বাহ্যিক তদারকি ব্যবস্থার** (External Accountability Mechanism) অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২. **অবমাননা আইন বনাম বাকস্বাধীনতা: আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১**-এর অধীনে "আদালতকে কলঙ্কিত করা" (Scandalising the Court)-এর মতো অস্পষ্ট শব্দের ব্যবহার প্রায়শই **ধারা ১৯(১)(ক)**-এর অধীনে বাকস্বাধীনতার সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এর ফলে গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রকৃত বিচারিক কাজে বাধা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থার অভাব:** বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য কোনো **স্বাধীন ব্যবস্থার অভাব** এবং বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়ার **সীমিত স্বচ্ছতা** জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে।

৪. **ডিজিটাল যুগে ভুল তথ্যের সংকট:** বর্তমানে আদালতগুলো পরিকল্পিত **ভুল তথ্য প্রচার** (Misinformation Campaigns) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপত্তিকর আলোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। ডিজিটাল যুগের এই হুমকিগুলো মোকাবিলা করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো না থাকায় বিচারকরা মাঝে মাঝে এমন প্রতিক্রিয়া দেখান যা তাঁদের নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।

৫. **জনসাধারণের আস্থার অবনতি:** বিচারিক বিলম্ব, ৫ কোটিরও বেশি **মামলা ঝুলে থাকা** (Pendency of Cases) এবং **কলেজিয়াম ব্যবস্থায়** (Collegium System) স্বচ্ছতার অভাব জনসাধারণের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে, যার ফলে বিচারবিভাগের কাজের ওপর সমালোচনা ও স্ক্রুটিনি ক্রমশ বাড়ছে।

বাকস্বাধীনতা এবং আদালত অবমাননা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিম কোর্ট রায়

- **রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৫০):** এই যুগান্তকারী রায় প্রতিষ্ঠা করেছিল যে বাকস্বাধীনতা হলো সমস্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ভিত্তি এবং এর ওপর যেকোনো বিধিনিষেধ অবশ্যই আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- **ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ বনাম টি.এন. নাম্বিয়ার (১৯৭০):** আদালত নিশ্চিত করেছে যে জনস্বার্থে করা **সৎ সমালোচনা** (Bona fide Criticism) সর্বদা সুরক্ষিত, তবে বিচারিক কর্তৃত্বের ওপর বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ অবমাননা হিসেবে গণ্য হতে পারে।
- **এস. মুলগাওকর মামলা (১৯৭৮):** বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার **"উদারতার নিয়ম"** (Magnanimity Rule) প্রবর্তন করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে আদালতগুলোর অবমাননার ক্ষমতা প্রয়োগে ধীর হওয়া উচিত এবং তথ্যহীন বা তুচ্ছ সমালোচনা উপেক্ষা করা উচিত।
- **পি.এন. দুদা বনাম পি. শিব শঙ্কর (১৯৮৮):** আদালত রায় দিয়েছে যে কেউ বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করার জন্য কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেও তা অবমাননা নয়, যদি না তা বিচারে কোনো হস্তক্ষেপ করে।
- **অরুন্ধতী রায় অবমাননা মামলা (২০০২):** আদালত জোর দিয়েছিল যে বাকস্বাধীনতা সর্বাগ্রে থাকলেও এটি এমনভাবে আদালতকে **"কলঙ্কিত"** (Scandalize) করতে ব্যবহার করা যাবে না যা জনসাধারণের বিশ্বাস নাড়িয়ে দেয়।
- **প্রশান্ত ভূষণ অবমাননা মামলা (২০২০):** বিচারবিভাগের সমালোচনা করে টুইট করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণকে দোষী সাব্যস্ত করে, যা বাকস্বাধীনতা এবং **বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা** (Judicial Accountability) নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়।

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সেরা অনুশীলন

- **যুক্তরাজ্য** (United Kingdom): ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্য **"আদালতকে কলঙ্কিত করা"** (Scandalizing the Court) সংক্রান্ত অপরাধটি বাতিল করেছে। তারা স্বীকার করেছে যে বিচারকদের সম্মান তাঁদের **আচরণ এবং রায়ের** মাধ্যমে টিকে থাকা উচিত, প্রসিকিউশনের হুমকির মাধ্যমে নয়।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** (United States): এখানে **"স্পষ্ট এবং বর্তমান বিপদ"** (Clear and Present Danger) পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। কোনো বক্তব্যকে কেবল তখনই শাস্তি দেওয়া হয় যদি তা বিচারের নিরপেক্ষতার জন্য তাৎক্ষণিক এবং গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করে।
- **ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত** (ECHR): এই আদালত শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকদের সমালোচনার জন্য অনেক বড় ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। তাদের মতে, সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় বিচারবিভাগকে অনেক বেশি **সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা** রাখতে হবে।

একটি আত্মবিশ্বাসী ও স্বচ্ছ বিচারবিভাগ গঠনের ভবিষ্যতের পথ

মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতীয় বিচারবিভাগকে অবশ্যই **স্বচ্ছতা এবং সংযমের** কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

- **আদালত অবমাননা আইন সংশোধন:** সংসদ এবং বিচারবিভাগকে একসাথে মিলে **আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১** সংশোধন করতে হবে। প্রকৃত বিচারে বাধা এবং কেবল বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত বা বিচারকদের আচরণের সমালোচনার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করা প্রয়োজন।
- **আদালতের জন্য RTI কাঠামো শক্তিশালী করা:** সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলিকে অবশ্যই **তথ্য জানার অধিকার আইন** (RTI) সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। অভিযোগ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বিচারবিভাগীয় শূন্যপদ সম্পর্কে তথ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে **জনসাধারণের আস্থা** বৃদ্ধি পায়।
- **স্বাধীন দায়বদ্ধতা সংস্থা প্রতিষ্ঠা:** যুক্তরাজ্যের 'জুডিশিয়াল কন্ডাক্ট ইনভেস্টিগেশন অফিস'-এর মতো একটি **স্বচ্ছ ও স্বাধীন ব্যবস্থা** ভারতেও তৈরি করা উচিত, যা বিচারকদের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলি নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে তদন্ত করবে।
- **মৌখিক পর্যবেক্ষণে সংযম প্রদর্শন:** বিচারকদের মনে রাখতে হবে যে এজলাস থেকে করা **অনানুষ্ঠানিক মন্তব্যও** বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বহন করে। এটি কোনো আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে একটি ব্যাপক **ভীতিপ্রদ প্রভাব** (Chilling Effect) তৈরি করতে পারে।
- **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারকে কঠোরভাবে মেনে চলা:** আদালতকে অবশ্যই **"কেউ নিজের মামলার বিচারক হতে পারবে না"** (Nemo Judex in Causa Sua)—এই নীতিটি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ করে যেখানে বিচারবিভাগের নিজস্ব কাজ বা সুনাম পরীক্ষার মুখে থাকে।
- **'পাবলিক অ্যাক্টর মডেল' গ্রহণ:** বিচারবিভাগের উচিত সেই মানসিকতায় ফিরে আসা যে এটি একটি **জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান** (Public Actor) যা জনসাধারণের পর্যালোচনার অধীন। এটি বার (Bar), প্রেস এবং শিক্ষাবিদদের সাথে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

উপসংহার

একটি মহান বিচারবিভাগের প্রকৃত মাপকাঠি সমালোচনাকে স্তব্ধ করার ক্ষমতা নয়, বরং এটি খোলাখুলি এবং নির্ভয়ে গ্রহণ করার সদিচ্ছা। কারণ যে প্রতিষ্ঠান **জনসাধারণের সমালোচনা** সহ্য করতে পারে না, তা শেষ পর্যন্ত তার মূল ভিত্তি অর্থাৎ মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তাই **স্বচ্ছতা** গ্রহণ করে এবং **বাকস্বাধীনতা** সমুন্নত রেখে বিচারবিভাগ নিশ্চিত করতে পারে যে এটি জনগণের চোখে **সংবিধানের চূড়ান্ত রক্ষক** (Ultimate Custodian) হিসেবে টিকে থাকবে।

Q. Judicial dignity and democratic accountability must coexist in a constitutional democracy. Examine the challenges in balancing contempt powers with freedom of speech in India. 15 Marks

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. OPEC থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রস্থান: বৈশ্বিক তেল রাজনীতি এবং ভারতের ওপর প্রভাব

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, আবু ধাবির নেতৃত্বে **সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)**, ২০২৬ সালের ১ মে থেকে **OPEC এবং OPEC+** থেকে বেরিয়ে যাবে। এটি বিশ্বের জ্বালানি ভূ-রাজনীতিতে (energy geopolitics) একটি বিশাল পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

OPEC থেকে আমিরাতের বেরিয়ে যাওয়ার কারণসমূহ

- **'পিক অয়েল' বা তেলের বাজার ধরার লড়াই (Monetizing 'Peak Oil'):** সারা বিশ্বে তেলের চাহিদা খুব দ্রুতই এক জায়গায় স্থবির হয়ে যেতে পারে। তাই আবু ধাবি চায় তাদের গচ্ছিত **১০০ বিলিয়ন ব্যারেল** তেল এখন যতটা সম্ভব উত্তোলিত করে বিক্রি করে দিতে। ইলেকট্রিক যানবাহন (EV) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ার ফলে তেলের দাম কমে যাওয়ার আগেই তারা সর্বোচ্চ লাভ তুলে নিতে চায়।
- **'ভিশন ২০৩১' (Vision 2031) প্রকল্পে অর্থায়ন:** তেলের অতিরিক্ত আয় থেকে আমিরাত একটি **জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি** (knowledge-based economy) গড়ে তুলতে চায়। তাদের লক্ষ্য প্রযুক্তি, পর্যটন এবং পণ্য পরিবহন (logistics) খাতের উন্নয়ন করা।
- **অব্যবহৃত ক্ষমতা এবং বিনিয়োগের সুফল (Idle Capacity & ROI):** আমিরাত তাদের তেলের উৎপাদন ক্ষমতা দিনে **৫০ লক্ষ ব্যারেলে** (5 mbpd) নিয়ে যাওয়ার জন্য **১৫০ বিলিয়ন ডলার** বিনিয়োগ করেছে। ওপেকের বাধ্যতামূলক উৎপাদন কমানোর নিয়মের ফলে তাদের এই বিশাল পরিকাঠামো কোনো কাজে আসছিল না, যা তাদের জন্য আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
- **সৌদি আরবের প্রভাব থেকে মুক্তি (Strategic Autonomy):** এই পদক্ষেপটি সৌদি-নির্ভর নীতি থেকে বেরিয়ে আসার একটি বড় প্রচেষ্টা। এটি আমিরাতকে সৌদি আরবের **'প্রজেক্ট এইচকিউ'** (যেখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে রিয়াদে সদর দপ্তর সরানোর চাপ দেওয়া হচ্ছে) এর বিরুদ্ধে অবাধে প্রতিযোগিতা করার এবং নিজেদের আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেবে।
- **দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রাধিকার (Preference for Bilateralism):** ওপেকের সম্মিলিত দর কষাকষির নীতি এড়িয়ে এখন আমিরাত সরাসরি **ভারতের** মতো বন্ধু দেশগুলিকে **সরাসরি ছাড়** (direct discounts) এবং দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি সরবরাহের গ্যারান্টি দিতে পারবে। বিনিময়ে তারা ভারতের থেকে বড় ধরনের কৌশলগত বিনিয়োগ পাবে।
- **সবুজ জ্বালানির ভাবমূর্তি (Green Energy Rebranding):** তেলের জোট বা "অয়েল কার্টেল" থেকে বেরিয়ে আসা আমিরাতকে একটি **বহুমুখী জ্বালানি পরাশক্তি** হিসেবে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। তারা গ্রিন হাইড্রোজেন এবং পারমাণবিক শক্তির ওপর জোর দিয়ে নিজেদের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দেশ হিসেবে প্রমাণ করতে চায়।

বৈশ্বিক জ্বালানি ব্যবস্থার ওপর প্রভাব

- **তেল জোটের ক্ষমতা হ্রাস (Weakening of the Cartel):** ওপেকের মোট উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় **১৪%** আমিরাতের দখলে। তাদের প্রস্থানের ফলে ওপেকের তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনেকটা কমে যাবে এবং বাজার এখন আর জোটবদ্ধ নয়, বরং **মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক** মডেলে চলবে।
- **দামের চেয়ে পরিমাণকে গুরুত্ব (Volume over Price):** সৌদি আরবের তেলের দাম বাড়িয়ে রাখার কৌশলের বদলে আবু ধাবি এখন বেশি পরিমাণে তেল বিক্রির ওপর জোর দিচ্ছে। এটি তেলের বাজার শেষ হওয়ার আগেই নিজেদের সম্পদ নগদায়ন করার একটি **প্রতিযোগিতা** শুরু করে দেবে।

- **ভূ-রাজনৈতিক খণ্ডন (Geopolitical Fragmentation):** এই পদক্ষেপটি OPEC+ **ঐক্যের** ভাঙন নিশ্চিত করে। এর ফলে বিশ্ব এখন কোনো একটি গোষ্ঠীর বদলে **দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের** (যেমন ভারত-ইউএই) দিকে বেশি ঝুঁকবে।
- **জ্বালানি পরিবর্তনের ভর্তুকি (Energy Transition Subsidy):** আমিরাত তেলের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তাদের **নবায়নযোগ্য জ্বালানি** প্রকল্পগুলোকে শক্তিশালী করছে। তেলের টাকায় গ্রিন হাইড্রোজেন এবং পারমাণবিক প্রকল্পের উন্নয়ন করে তারা বিশ্বের সামনে একটি নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করছে।
- **প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর চাপ (Market Pressure on Rivals):** আমিরাতের তেলের সরবরাহ বাড়লে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমতে পারে। এতে ভারত বা চীনের মতো আমদানিকারক দেশগুলো লাভবান হলেও **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং গায়ানার** মতো তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর আয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে।

ভারতের জন্য তাৎপর্য

১. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস**

- **রাজস্ব স্বস্তি:** অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ১ ডলার কমলে ভারতের আমদানি ব্যয় প্রায় **১০,০০০ কোটি টাকা** কমে যায়। সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) তার পূর্ণ ক্ষমতায় (৫ mbpd) উৎপাদন করলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমবে, যা ভারতের **চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD)** নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।
- **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** জ্বালানি খরচ কমলে পরিবহন এবং খাদ্যের দাম কমে আসে, যা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে (RBI) তাদের **ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI)** ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. **উন্নত জ্বালানি নিরাপত্তা**

- **উৎস বহুমুখীকরণ:** ওপেকের (OPEC) উৎপাদন কোটার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ভারত এখন সরাসরি সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে **দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ চুক্তি** করতে পারবে। এটি অস্থির "OPEC+ ঐক্যের" ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমাবে।
- **ভৌগোলিক সুবিধা:** রাশিয়া বা আমেরিকার তুলনায় আমিরাত ভারতের অনেক কাছে অবস্থিত। এর ফলে তেলের **পরিবহন খরচ** অনেক কম হয় এবং ভারতীয় শোধনাগারগুলোতে তেল দ্রুত পৌঁছাতে পারে।

৩. **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ**

- আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (ADNOC) ইতিমধ্যেই ম্যাঙ্গালুরুর কৌশলগত ভাণ্ডারে তেল মজুত করে ভারতের সাথে সহযোগিতা করছে। ওপেক থেকে আমিরাতের প্রস্থানের পর, তারা ভারতে তেলের মজুত আরও বাড়াতে পারবে, যা বৈশ্বিক সংকট বা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়েও ভারতের জন্য **নিশ্চিত সরবরাহ** বজায় রাখবে।

৪. **সেপা (CEPA) চুক্তিকে শক্তিশালী করা**

- ২০২২ সালে স্বাক্ষরিত **কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (CEPA)** হলো ভারত-ইউএই সম্পর্কের মূল ভিত্তি। ভারত আমিরাতকে তেলের নিশ্চিত চাহিদার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে এবং বিনিময়ে আমিরাত সেই তেলের আয় ভারতের পরিকাঠামো এবং **ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরে (IMEC)** পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারে।

৫. **"রিফাইনিং হাব" বা শোধনাগার কেন্দ্র হওয়ার লক্ষ্যে সহায়তা**

- ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে তার তেল শোধনের ক্ষমতা বাড়িয়ে **৪৫০ mmtpa** করার লক্ষ্য নিয়েছে। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আমিরাত নির্দিষ্ট গ্রেডের অপরিশোধিত তেলের স্থিতিশীল সরবরাহকারী হতে পারে, যা ভারতকে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং পেট্রোকেমিক্যালস রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

৬. সবুজ জ্বালানি সহযোগিতায় রূপান্তর

- সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ভারত উভয় দেশই তেল থেকে উপার্জিত অর্থ গ্রিন হাইড্রোজেন এবং সৌরশক্তিতে বড় বিনিয়োগের কাজে লাগাচ্ছে। এটি ভারতের **ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন**-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা "পিক অয়েল" যুগের পরেও দুই দেশের মধ্যে যৌথ গবেষণা (R&D) এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেবে।

ভারতের জন্য সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

- **বাজারের অস্থিরতা:** ওপেকের স্থিতিশীল প্রভাব কমে যাওয়ায় তেলের দামে **তীব্র ওঠানামা** হতে পারে, যা ভারতের বাজেট এবং আর্থিক পরিকল্পনা বজায় রাখা কঠিন করে তুলবে।
- **ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য:** সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক খারাপ না করেই আমিরাতের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ **সৌদি আরব** এখনও ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি অংশীদার এবং ওপেকের নেতা।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রভাব:** আমিরাতের সস্তা তেলের আধিক্য ভারতের **নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy)** ব্যবহারের গতি কমিয়ে দিতে পারে, যা ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পিছিয়ে দিতে পারে।
- **আঞ্চলিক অস্থিরতা:** এই প্রস্থান যদি উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে "মূল্য যুদ্ধ" বা বিরোধ তৈরি করে, তবে তা মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা ডেকে আনতে পারে। এর ফলে সেখানে কর্মরত **৯০ লক্ষ ভারতীয় প্রবাসীর** নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।
- **সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি:** কোনো জোটের বদলে শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ওপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া মানে হলো আমিরাতের **অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তন** বা রাজনৈতিক অস্থিরতার ওপর ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়া।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি কূটনীতি গভীর করা:** শুধুমাত্র ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের বাইরে গিয়ে আমিরাতের তেলের খনিতে **যৌথ বিনিয়োগ** এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থির-মূল্যের চুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- **কৌশলগত ভাণ্ডার সম্প্রসারণ:** আমিরাতের উৎপাদন নমনীয়তাকে কাজে লাগিয়ে ভারতের পাদুর (Padur) এবং চণ্ডীখোলের (Chandikhole) **দ্বিতীয় পর্যায়ের কৌশলগত তেলের ভাণ্ডার (SPR)** দ্রুত পূর্ণ করতে হবে।
- **পশ্চিম এশিয়ার সম্পর্কের ভারসাম্য:** একটি **"ডি-হাইফেনটেড" (de-hyphenated) নীতি** অনুসরণ করে আমিরাত এবং সৌদি আরব—উভয় দেশের সাথেই শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।
- **সমন্বিত জ্বালানি রূপান্তর:** সস্তা তেলের কারণে সাশ্রয় হওয়া অর্থ **ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনে** ব্যয় করতে হবে এবং আমিরাতের সাথে কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তিতে সহযোগিতা বাড়াতে হবে।
- **IMEC রুটের শক্তিশালীকরণ:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে যাতে জ্বালানি গ্রিড এবং পাইপলাইনগুলোকে সরাসরি সংযুক্ত করা যায়।
- **শোধনাগারের আধুনিকীকরণ:** আমিরাত যে ধরণের তেল স্বতন্ত্রভাবে বাজারে ছাড়বে, তা পরিশোধন করার জন্য ভারতীয় শোধনাগারগুলোকে আরও আধুনিক করে তুলতে হবে।

উপসংহার

ওপেক থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই প্রস্থান বাজার-চালিত জ্বালানি বাস্তবতার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। ভারতের জন্য এটি সাশ্রয়ী মূল্যে অপরিশোধিত তেল নিশ্চিত করা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করা এবং আমিরাতের বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে নিজের সবুজ জ্বালানি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার একটি **কৌশলগত সুযোগ**।

Q. In the context of the United Arab Emirates exit from Organization of the Petroleum Exporting Countries, examine its implications for India's energy security and India-UAE strategic partnership.

2.2.2. জাতিসংঘ মহাসচিব

ভূমিকা

জাতিসংঘ মহাসচিব (UNSG) হলেন জাতিসংঘের **সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা**। এই পদটিকে প্রায়ই "বিশ্বের সবথেকে কঠিন কাজ" হিসেবে বর্ণনা করা হয়। জাতিসংঘ যখন তার **৮০তম বছরে** পদার্পণ করছে, তখন এই পদের ভূমিকা কেবল একজন ম্যানেজারের গণ্ডি পেরিয়ে একজন গুরুত্বপূর্ণ **বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীতে** রূপান্তরিত হয়েছে।

সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো

- **ধারা ৯৭ (জাতিসংঘ সনদ):** এটি মহাসচিবকে সংস্থার **"প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা"** হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে **সাধারণ পরিষদ** (General Assembly) কর্তৃক নিযুক্ত হন।
- **ধারা ৯৯:** এটি মহাসচিবকে একটি অনন্য **রাজনৈতিক ক্ষমতা** দেয়। এর মাধ্যমে তিনি এমন যেকোনো বিষয় যা **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা** বিঘ্নিত করতে পারে বলে মনে করেন, তা সরাসরি **নিরাপত্তা পরিষদের** নজরে আনতে পারেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব নিয়োগ প্রক্রিয়া

- **নির্বাচন:** নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়।
- **ভেটো (Veto) ক্ষমতা:** যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ আবশ্যক, তাই **পি৫ (P5) সদস্য** (আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স)-দের যেকোনো একজন প্রার্থীর বিপক্ষে ভোট দিলে সেই প্রার্থী আর নিযুক্ত হতে পারেন না। ফলে সাধারণত প্রভাবশালী দেশগুলোর পরিবর্তে **"আপসকারী প্রার্থী"** বা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ দেশগুলো থেকে প্রার্থী বেছে নেওয়া হয়।
- **প্রথা:**
  - **আঞ্চলিক আবর্তন** (Regional Rotation): সাধারণত বিশ্বের পাঁচটি অঞ্চলের মধ্যে এই পদটি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। বর্তমান **২০২৬-২৭ চক্রটি** লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের (LAC) দিকে তাকিয়ে আছে।
  - **মেয়াদ:** সাধারণত **৫ বছরের মেয়াদ**, যা একবার নবায়ন করা যেতে পারে।
  - **লিঙ্গ বৈষম্য:** আজ পর্যন্ত কোনো **নারী** মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি, যা ২০২৬ সালের নির্বাচনে **লিঙ্গ সমতাকে** একটি মূল বিষয়ে পরিণত করেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের ভূমিকা

১. **প্রশাসনিক ভূমিকা (CEO-এর মতো কাজ)**

- **সচিবালয়ের প্রধান:** জাতিসংঘের নির্বাহী শাখা অর্থাৎ সচিবালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করেন, যেখানে ৩৬,০০০-এর বেশি কর্মী কর্মরত।
- **বাজেট ব্যবস্থাপনা:** জাতিসংঘের বাজেট প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও তহবিলে সম্পদের **দক্ষ বণ্টন** নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাঁর।
- **কর্মী নিয়োগ:** ধারা ১০১ অনুযায়ী, তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা এবং **ভৌগোলিক বৈচিত্র্য** (সব দেশের প্রতিনিধিত্ব) বজায় রাখা তাঁর অন্যতম কাজ।
- **রিপোর্ট প্রদান:** ধারা ৯৮ অনুযায়ী, প্রতি বছর সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের কাজের ওপর **বার্ষিক প্রতিবেদন** জমা দেওয়া তাঁর বাধ্যতামূলক কাজ।

২. **রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকা (কূটনীতিকের কাজ)**

- **"গুড অফিস" (Good Offices):** মহাসচিব তাঁর নিরপেক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বিরোধে **মধ্যস্থতাকারী** হিসেবে কাজ করেন। একে **প্রতিরোধমূলক কূটনীতি** বলা হয়, যাতে বিরোধ বড় সংঘাতে রূপ না নেয়।
- **ধারা ৯৯-এর ক্ষমতা:** এটি তাঁর সবথেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা। এর মাধ্যমে তিনি বিশ্বশান্তি রক্ষায় সরাসরি নিরাপত্তা পরিষদে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।
- **দূত নিয়োগ:** সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি আলোচনা পরিচালনার জন্য তিনি **"বিশেষ প্রতিনিধি"** বা **"ব্যক্তিগত দূত"** নিয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন।
- **বিশ্বের বিবেক:** জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যুতে তিনি **"বিশ্বের বিবেক"** হিসেবে কথা বলেন।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা (সিভিল সার্ভেন্ট বা সরকারি চাকুরের মতো কাজ)**

- **সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়:** তিনি জাতিসংঘের সব সংস্থাগুলোর (যেমন- WHO, IMF, বিশ্বব্যাংক) প্রধানদের নিয়ে গঠিত **সমন্বয় বোর্ডের (CEB)** সভাপতিত্ব করেন।
- **প্রধান অঙ্গগুলোতে অংশগ্রহণ:** সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এবং ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলের সভায় সচিব হিসেবে উপস্থিত থাকা তাঁর দায়িত্ব।
- **নির্দেশনা বাস্তবায়ন:** জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গগুলো কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবসমূহ **বাস্তবায়ন** করা তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ।

বর্তমান নির্বাচনের প্রধান সমস্যাসমূহ

- **ভূ-রাজনৈতিক স্থবিরতা (Geopolitical Paralysis):** ইউক্রেন, গাজা এবং সুদান নিয়ে **পি৫ (P5)** সদস্যদের মধ্যে বাড়তে থাকা তিক্ততা বারবার **ভেটো (Veto)** প্রয়োগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে উচ্চ-পর্যায়ের নিরাপত্তা বিষয়গুলোতে নিরাপত্তা পরিষদ **অকার্যকর** হয়ে পড়েছে।
- **আর্থিক তারল্য সংকট (Financial Liquidity Crisis):** প্রধান সদস্য দেশগুলোর পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে **"নির্ধারিত চাঁদা" (Assessed Contributions)** পরিশোধ না করা বা দেরিতে দেওয়ার ফলে জাতিসংঘ অভূতপূর্ব আর্থিক সংকটে পড়েছে। এটি সংস্থাকে ব্যয় সংকোচনে বাধ্য করছে এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা:** উন্নত বিশ্ব (Global North) এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের (Global South) মধ্যে বাড়তে থাকা আস্থার সংকট **"সংস্কৃত বহুপাক্ষিকতাবাদ" (Reformed Multilateralism)**-এর দাবিকে আরও জোরালো করেছে। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ এবং নেতৃত্বে লিঙ্গ সমতার বিষয়টি সামনে এসেছে।
- **এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রায় স্থবিরতা:** ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মাত্র **১৮% লক্ষ্যমাত্রা** সঠিক পথে রয়েছে। ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নতুন মহাসচিবকে বিশাল অর্থায়নের ঘাটতি মেটাতে হবে এবং "এসডিজি ক্লান্তি" দূর করতে হবে।
- **শান্তি রক্ষা মিশনের অবক্ষয়:** মালি-র মতো জায়গা থেকে শান্তিরক্ষা মিশন সরিয়ে নিতে বাধ্য হওয়া এবং বড় যুদ্ধ থামাতে না পারা—এই পরিস্থিতি **ধারা ৯৯** এবং পুনরুজ্জীবিত **প্রতিরোধমূলক কূটনীতির** মাধ্যমে "মৌলিক কাজে ফিরে যাওয়ার" প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে।
- **"গ্লোবাল কমন্স" বা বৈশ্বিক সাধারণ সম্পদের শাসন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), বায়ো-টেকনোলজি এবং মহাকাশ প্রযুক্তির** দ্রুত উন্নতি আন্তর্জাতিক আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। মহাসচিবকে এই ক্ষেত্রগুলোতে বৈশ্বিক নিয়ম তৈরিতে নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে এগুলি যুদ্ধ বা বৈষম্যের নতুন হাতিয়ার না হয়ে ওঠে।

"সংস্কৃত বহুপাক্ষিকতাবাদ" নিয়ে ভারতের অবস্থান

১. ভারতের দাবির মূল স্তম্ভ

- **নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ:** ভারত একটি সম্প্রসারিত নিরাপত্তা পরিষদে **স্থায়ী সদস্যপদ** চায়। ভারত "দ্বি-স্তরীয়" ব্যবস্থার (ভেটো ছাড়া স্থায়ী আসন) বিরোধী এবং সমতা নিশ্চিত করতে বর্তমান পি৫ সদস্যদের মতো একই ক্ষমতা দাবি করে।
- **গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর:** উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বঘোষিত নেতা হিসেবে ভারত দাবি করে যে আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে **নির্ণায়ক ভূমিকা** থাকতে হবে।
- **সামগ্রিক সংস্কার:** জাতিসংঘের বাইরে ভারত আইএমএফ (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকের মতো **আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (IFIs)** সংস্কার চায় যাতে এসডিজি অর্থায়নের ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের ঘাটতি মেটানো যায়।

২. ভেটো ক্ষমতা নিয়ে কৌশলগত নমনীয়তা

ভারত মনে করে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভেটো অপরিহার্য, তবে ২০২৬ সালে তারা **জি৪ (G4)** প্রস্তাবের (ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি, জাপান) মাধ্যমে কিছুটা কৌশলগত নমনীয়তা দেখিয়েছে:

- **ভেটো স্থগিতকরণ (Veto Deferral):** আলোচনার অচলাবস্থা কাটাতে নতুন স্থায়ী সদস্যদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন **১৫ বছর**) জন্য ভেটো ক্ষমতা স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ পন্থা

- **রাজনৈতিক বৈধতা বৃদ্ধি:** ভারত, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নিরাপত্তা পরিষদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে **"সংস্কৃত বহুপাক্ষিকতাবাদ"**-এর দিকে এগিয়ে যাওয়া।
- **আর্থিক স্থায়িত্ব:** চাঁদা সংগ্রহের জন্য আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা করা এবং আয়ের উৎস **বৈচিত্র্যময়** করা, যাতে সচিবালয় বড় দাতাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত থাকে।
- **ধারা ৯৯-এর সক্রিয় ব্যবহার:** পরবর্তী মহাসচিবকে কেবল একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক না হয়ে একজন **"সক্রিয় মধ্যস্থতাকারী"** হয়ে উঠতে হবে এবং ধারা ৯৯ প্রয়োগ করে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহেলিত সংঘাতগুলোর দিকে নজর দিতে বাধ্য করতে হবে।
- **প্রতিরোধমূলক কূটনীতিকে অগ্রাধিকার:** সংঘাত হওয়ার পর শান্তিরক্ষী পাঠানোর চেয়ে সংঘাত যাতে না হয় সেই **প্রতিরোধমূলক কূটনীতি** এবং পর্দার আড়ালের আলোচনায় বেশি সম্পদ ও গুরুত্ব দিতে হবে।
- **নতুন প্রযুক্তির শাসন:** এআই (AI) নৈতিকতা, মহাকাশ নিরাপত্তা এবং ডিপ-টেক প্রযুক্তির জন্য **সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক নিয়ম** তৈরি করা।

উপসংহার

পরবর্তী মহাসচিবকে জাতিসংঘকে একটি স্থবির আমলাতন্ত্র থেকে একটি স্থিতিস্থাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মধ্যস্থতাকারীতে রূপান্তর করতে হবে। তাঁর সাফল্য নির্ভর করবে পি৫ দেশগুলোর স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রেখে কীভাবে তিনি **গ্লোবাল সাউথের** অধিকার রক্ষা করেন এবং বিশ্বশান্তি ফিরিয়ে আনেন তার ওপর।

Q. "Discuss the significance of the election of the United Nations Secretary-General in the context of the ongoing crisis of multilateralism. Examine the key challenges faced by the UN and suggest reforms to enhance its effectiveness." (15 Marks)

2.2.3. ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA): 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ

ভূমিকা

- বর্তমান বিশ্বজুড়ে যখন সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) বিপর্যস্ত এবং রক্ষণশীলতা (Protectionism) বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ভারত নিউজিল্যান্ডের সাথে একটি ঐতিহাসিক **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** স্বাক্ষর করেছে। এটি ভারতের দ্রুততম সম্পাদিত চুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম।
- এটি **"বিকশিত ভারত ২০৪৭"** ভিশনের অধীনে ভারতের পরিবর্তিত বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির একটি প্রতিফলন, যেখানে ভারত শুল্ক-কেন্দ্রিক মধ্যস্থতাকারী থেকে একটি কৌশলগত এবং উচ্চ-গতিসম্পন্ন বাণিজ্য অংশীদারে রূপান্তরিত হয়েছে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** হলো দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে একটি চুক্তি যা পণ্য, পরিষেবা, মূলধন এবং শ্রমের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে শুল্ক, কোটা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ হ্রাস বা বিলুপ্ত করে।

ভারত-নিউজিল্যান্ড সম্পর্ক: ভিত্তি

১. **ঐতিহাসিক সম্পর্ক**

- **১৯৫২ সালে** আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৫) গ্যালিপোলিতে **ANZAC** বাহিনীর সাথে ভারতীয় সৈন্যরা লড়াই করেছিল, যা একটি গভীর ঐতিহাসিক বন্ধন তৈরি করেছে।
- উভয় দেশই কমনওয়েলথের সদস্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাধারণ আইন (Common Law) ঐতিহ্য শেয়ার করে। উভয় দেশই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি **নিয়ম-ভিত্তিক ব্যবস্থা (Rules-based order)** সমর্থন করে।

২. **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য**

- ২০২৪ সালে পণ্য ও পরিষেবার মোট বাণিজ্য **২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে** পৌঁছেছে। ২০২৪-২৫ সালে দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য ৪৯% বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- ভারতের বাণিজ্যের ভারসাম্য ইতিবাচক, অর্থাৎ নিউজিল্যান্ড থেকে আমদানির তুলনায় ভারত রপ্তানি বেশি করে। ওশেনিয়া অঞ্চলে নিউজিল্যান্ড ভারতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম** বাণিজ্য অংশীদার।

৩. **বাণিজ্যের গঠন**

- **ভারত রপ্তানি করে:** ওষুধ (Pharmaceuticals), যন্ত্রপাতি, বস্ত্র এবং মূল্যবান পাথর।
- **নিউজিল্যান্ড থেকে আমদানি করে:** উল (Wool), লোহা ও ইস্পাত, ফল ও বাদাম এবং অ্যালুমিনিয়াম।

৪. **প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকা (Diaspora Bridge)**

- নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত প্রায় **৩,০০,০০০ ভারতীয় বংশোদ্ভূত**, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫-৬%। এই গোষ্ঠী দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সেতু হিসেবে কাজ করে। শিক্ষা বিনিময় এবং পর্যটন এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে।

৫. **প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা**

- ২০২৫ সালের শুরুতে স্বাক্ষরিত একটি **দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি** সামরিক ব্যস্ততা এবং নৌ-বন্দরে পরিদর্শন বৃদ্ধি করেছে। নিউজিল্যান্ড ভারতের Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI)-এর সাথেও একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

৬. **বহুপাক্ষিক সহযোগিতা**

- নিউজিল্যান্ড রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ এবং নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে (NSG) ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে সমর্থন জানায়।

- এছাড়াও তারা ভারতের নেতৃত্বাধীন **International Solar Alliance (ISA)** এবং **CDRI**-এর সক্রিয় সদস্য।

ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) কৌশলগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. ভারতীয় রপ্তানির জন্য নজিরবিহীন বাজার সুবিধা

- **১০০% শুল্কমুক্ত সুবিধা:** নিউজিল্যান্ড ভারতীয় রপ্তানির ওপর থেকে সমস্ত শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। এর ফলে **MSME**, টেক্সটাইল, চামড়া, পাদুকা এবং রত্ন ও অলঙ্কারের মতো শ্রমনিবিড় খাতগুলো ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে, যেখানে আগে ১০% পর্যন্ত শুল্ক ছিল।
- **ভারতের শুল্ক ছাড়:** ভারত ৭০.০৩% শুল্ক লাইনে উদারীকরণের প্রস্তাব দিয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রায় ৯৫% কভার করে। এর মধ্যে ৩০% ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক শুল্ক বিলোপ হবে এবং বাকিগুলো ৩ থেকে ১০ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কমানো হবে।
- **উৎপাদন খরচ হ্রাস:** ভারত কাঠের গুঁড়ি, কোকিং কোল এবং ধাতব স্ক্র্যাপের মতো শিল্প কাঁচামালে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, যা সরাসরি **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**-কে শক্তিশালী করবে।

২. সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ খাতের সুরক্ষা

- **কৌশলগত বর্জন তালিকা (Exclusion List):** দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে ভারত ২৯.৯৭% শুল্ক লাইনকে এই চুক্তির বাইরে রেখেছে।
  - **বর্জিত পণ্য:** সমস্ত **দুগ্ধজাত পণ্য** (তরল দুধ, পনির, দই), পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, ভুট্টা, চিনি, অ্যালুমিনিয়াম এবং অস্ত্রশস্ত্র।
- **ডেয়ারি রেড লাইন:** দুগ্ধজাত পণ্যকে তালিকার বাইরে রাখা ভারতের জন্য একটি বড় জয়, যা নিউজিল্যান্ডের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য থেকে ভারতের কোটি কোটি ক্ষুদ্র দুগ্ধচাষীকে রক্ষা করবে।
- **শুল্ক হার কোটা (TRQ) ব্যবস্থা:** আপেল, কিউই ফল এবং মানুকা মধুর মতো পণ্যগুলো **TRQ**-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে, যাতে বাজারের চাহিদা এবং কৃষকদের সুরক্ষা—উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩. বিশাল প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) প্রতিশ্রুতি

- **২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ:** নিউজিল্যান্ড আগামী ১৫ বছরে ভারতে এগ্রি-টেক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে **২০ বিলিয়ন ডলার** বিনিয়োগের আইনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
- **পুনঃভারসাম্য রক্ষা (Rebalancing Clause):** যদি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হয়, তবে তা মোকাবিলা করার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৪. প্রতিভা ও মানব মূলধনের গতিশীলতা

- **৫,০০০ পেশাদার ভিসা:** আইটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের দক্ষ ভারতীয়দের জন্য বছরে ৫,০০০টি **অস্থায়ী কর্মসংস্থান ভিসা** (৩ বছর পর্যন্ত) বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **ছাত্র-বান্ধব বিধান:** ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ওপর থেকে সীমা তুলে নেওয়া হয়েছে। তারা পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন এবং **STEM** গ্র্যাজুয়েটরা ৩-৪ বছরের 'পোস্ট-স্টাডি' কাজের অধিকার পাবেন।

৫. পরিষেবা, আয়ুষ (AYUSH) ও সাংস্কৃতিক কূটনীতি

- **আয়ুষ-এর স্বীকৃতি:** এটিই প্রথম দ্বিপাক্ষিক FTA যেখানে ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি—**আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথি (AYUSH)**-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **সাংস্কৃতিক অধ্যায়:** ঐতিহ্যগত জ্ঞান, খেলাধুলা এবং পর্যটনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. **মেধাস্বত্ব ও জিআই (GI) সুরক্ষা**

- **জিআই আইনের সংশোধন:** নিউজিল্যান্ড তাদের ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) আইন সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে **দার্জিলিং চা, বাসমতি চাল**-এর মতো আইকনিক ভারতীয় পণ্যগুলো নিউজিল্যান্ডের বাজারে সর্বোচ্চ আইনি সুরক্ষা পাবে।
- **পারস্পরিক স্বীকৃতি (MRA):** বাসমতি চাল, চা এবং তিসি বীজের মতো ৮০টিরও বেশি জৈব (Organic) পণ্য এখন সহজেই নিউজিল্যান্ডের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

৭. **বাণিজ্য সহজীকরণ ও ফার্মা সেক্টর**

- **দ্রুত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স:** পণ্য খালাসের সময় কমিয়ে ২৪-৪৮ ঘণ্টা করা হয়েছে এবং কাগজের পরিবর্তে ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- **ফার্মা ফাস্ট-ট্র্যাক:** মার্কিন FDA বা ইউরোপীয় EMA দ্বারা অনুমোদিত ভারতীয় ওষুধগুলোকে নিউজিল্যান্ড পুনরায় পরিদর্শন ছাড়াই দ্রুত অনুমোদন দেবে। এর ফলে ওষুধ রপ্তানির খরচ কমবে।

৮. **ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব**

- **ওশেনিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবেশদ্বার:** এই চুক্তির ফলে নিউজিল্যান্ডকে একটি লজিস্টিক হাব হিসেবে ব্যবহার করে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর (PICs) বাজারে পৌঁছাতে পারবে।
- **OECD মানদণ্ড:** নিউজিল্যান্ডের উচ্চমানের মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে ভারত প্রমাণ করেছে যে তারা বিশ্বমানের সরবরাহ শৃঙ্খলে যুক্ত হতে সক্ষম।
- **দ্রুততম সম্পাদন:** মাত্র ৯ মাসে (মার্চ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫) এই আলোচনা শেষ হয়েছে, যা ভারতের ইতিহাসে দ্রুততম FTA সম্পাদন।

ভারত-নিউজিল্যান্ড FTA-র প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **FTA-র সাফল্যে চীনের প্রভাব (China Shadow):** নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ (রপ্তানির প্রায় ৩০%) **চীনের ওপর নির্ভরশীল**। এই নির্ভরতা নিউজিল্যান্ডকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিবাদে ভারতের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে, যা এই চুক্তির কৌশলগত গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে।
- **বিনিয়োগ বাস্তবায়নের ঝুঁকি (Investment Delivery Risk):** আগামী ১৫ বছরে **২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক কঠোর তদারকি না থাকলে প্রকৃত মূলধন প্রবাহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হতে পারে। যদিও চুক্তিতে **পুনঃভারসাম্য রক্ষা (Rebalancing Clause)**-র ব্যবস্থা আছে, তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে উভয় পক্ষের নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ওপর।
- **দুগ্ধ খাতের সুরক্ষা বনাম কৃষি প্রত্যাশা:** ভারত দুগ্ধজাত পণ্যকে **বর্জন তালিকায় (Exclusion List)** রেখে সুরক্ষা দিলেও, পরবর্তী সাত বছরে 'ইনফ্যান্ট ফর্মুলা' এবং উচ্চ-মূল্যের দুগ্ধজাত পণ্যের জন্য পর্যায়ক্রমে বাজার উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত দেশীয় পুষ্টি খাতের ওপর প্রতিযোগিতামূলক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
- **নিরাপত্তা সংক্রান্ত টানাপোড়েন — খালিস্তান ইস্যু:** নিউজিল্যান্ডের উদারপন্থী নীতির সুযোগ নিয়ে সেখানে **খালিস্তানপন্থী উপাদানগুলোর** উপস্থিতি কূটনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। এই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে চুক্তির অধীনে থাকা **প্রতিভার গতিশীলতা (Talent Mobility)** এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পৃক্ততার মতো বিষয়গুলো বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- **বাস্তবায়নের জন্য দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** চুক্তির সফল রূপায়ণের জন্য শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। বর্তমানে **সন্ত্রাসবাদ দমন**, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাব রয়েছে, যা এই অংশীদারিত্বের **কৌশলগত গভীরতা (Strategic Depth)** কমিয়ে দেয়।

- **লেনদেনমূলক মানসিকতা (Transactional Mindset):** নিউজিল্যান্ড এখনও ভারতকে মূলত **শ্রমের উৎস** এবং **শিক্ষার গন্তব্য** হিসেবে দেখে, যা একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত সম্পর্কের পথে বাধা। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি **ডিপ-টেক (Deep-tech)**, প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন এবং কৌশলগত মূলধনের ক্ষেত্রে চুক্তির সম্ভাবনাকে সীমিত করতে পারে, যা **'বিকশিত ভারত ২০৪৭'**-এর লক্ষ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশিকা: ভারত-নিউজিল্যান্ড FTA শক্তিশালী করার পদক্ষেপ

- **২০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা:** এগ্রি-টেক, নবায়নযোগ্য শক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে পুঁজির প্রবাহ তদারকি করার জন্য উভয় দেশের একটি **যৌথ বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ কমিটি (Joint Investment Monitoring Committee)** গঠন করা উচিত। চুক্তির **পুনঃভারসাম্য রক্ষা (Rebalancing Clause)** ধারাটি শুরুতেই সক্রিয় করলে বিনিয়োগের ঘাটতি কূটনৈতিক সমস্যায় পরিণত হবে না।
- **ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি:** ১১৮টি পরিষেবা খাতের সুবিধা নিতে ভারতকে তার **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (UPI, Aadhaar, ONDC)** ব্যবহার করতে হবে। এর মাধ্যমে MSME রপ্তানি, ডিজিটাল বাণিজ্য এবং ফিনটেক পরিষেবাকে উৎসাহিত করে আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য **৫ বিলিয়ন ডলারের** লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে।
- **কৃষি ও জিআই (GI) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন:** ভারতকে অবিলম্বে Centres of Agricultural Excellence সক্রিয় করতে হবে এবং দুগ্ধ শিল্পের আধুনিকীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর যৌথ গবেষণা চালাতে হবে। পাশাপাশি, নিউজিল্যান্ড যাতে ১৮ মাসের মধ্যে তাদের **জিআই (GI) আইন সংশোধন** সম্পন্ন করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে ওশেনিয়া অঞ্চলে **দার্জিলিং চা** এবং **বাসমতি চালের** মতো ব্র্যান্ডগুলো আইনি সুরক্ষা পাবে।
- **FTA-এর সুফল রক্ষায় নিরাপত্তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** খালিস্তান ইস্যু এবং আন্তঃসীমান্ত চরমপন্থা মোকাবিলায় একটি দ্বিপাক্ষিক **সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কাঠামো** এবং Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) স্থাপন করা জরুরি। এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত টানাপোড়েন নিরসন না হলে প্রতিভা ও জনশক্তির গতিশীলতা (Talent Mobility) বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- **ভবিষ্যৎ-মুখী খাতের জন্য FTA-কে ব্যবহার:** ২০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিকে **গ্রিন হাইড্রোজেন**, মহাকাশ গবেষণা, ক্লিন টেকনোলজি এবং **AI-চালিত ফিনটেক** খাতে চালিত করতে হবে। এটি সম্পর্কটিকে কেবল বাণিজ্যিক লেনদেনের গণ্ডি থেকে বের করে **'বিকশিত ভারত ২০৪৭'**-এর লক্ষ্য পূরণে একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত জোটে পরিণত করবে।
- **প্রবাসী ভারতীয় ও ইন্দো-প্যাসিফিক সংযোগ কাজে লাগানো:** নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত **৩ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে** পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা এবং **আয়ুষ (AYUSH)** বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। একইসাথে, নিউজিল্যান্ডকে প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহার করে IPOI-এর অধীনে **প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর (PICs)** সাথে ভারতের সম্পর্ক আরও গভীর করতে হবে।

উপসংহার

- ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) হলো একটি **পরবর্তী প্রজন্মের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব**, যা কৃষক, MSME, নারী, যুবক এবং স্টার্টআপদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। এই চুক্তির ফলে উন্নত অর্থনীতির ৩৮টি দেশের সাথে ভারতের মোট ৯টি চুক্তি সম্পন্ন হলো, যা বিশ্ব জিডিপি-র প্রায় ৬৫-৭০% কভার করে।
- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তির ঊর্ধ্বে এটি একটি ভূ-রাজনৈতিক বার্তা। এটি বিশ্বমঞ্চে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং **'বিকশিত ভারত ২০৪৭'**-এর লক্ষ্যে ভারতের দৃঢ় পদযাত্রাকেই প্রতিফলিত করে।

Q. Free Trade Agreements are no longer just economic tools but instruments of geopolitical strategy. Analyse this statement in the context of the India–New Zealand FTA. (15 Marks)

2.2.4. ভারত–ভিয়েতনাম সম্পর্ক

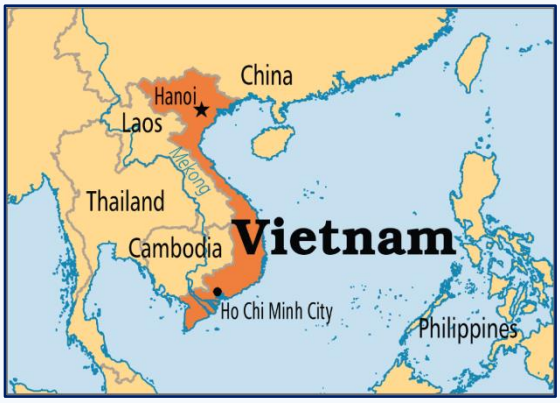

প্রেক্ষাপট

ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট **তো লাম (Tô Lâm)**-এর সাম্প্রতিক ভারত সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একটি **'উন্নত ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব' (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership)**-এ উন্নীত করেছে। এটি প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তা রক্ষায় দুই দেশের গভীর সহযোগিতার প্রতিফলন।

ভারত–ভিয়েতনাম সম্পর্কের প্রধান দিকগুলি

১. **ঐতিহাসিক পটভূমি**

- **সভ্যতাগত সম্পর্ক:** প্রাচীন **চম্পা সভ্যতা** এবং **বৌদ্ধধর্মের** প্রসারের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে হাজার বছরের পুরনো সম্পর্ক বিদ্যমান।
- **উপনিবেশবাদ বিরোধী ভ্রাতৃত্ব:** মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর সাথে **হো চি মিনের** ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ফরাসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় থেকেই গড়ে উঠেছিল।
- **আইসিএসসি (ICSC)-তে ভূমিকা:** ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির পর ইন্দো-চীনে শান্তি বজায় রাখতে ভারত **আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কমিশন (ICSC)**-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল।
- **লুক ইস্ট এবং অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি:** ১৯৯১ সালের ভারতের **'লুক ইস্ট পলিসি'** এবং পরবর্তীতে **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'**-তে ভিয়েতনামকে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব (২০১৬):** প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের সময় সম্পর্কটি এই স্তরে উন্নীত হয়, যা ভিয়েতনামকে রাশিয়া ও চীনের মতো ভারতের শীর্ষস্থানীয় কূটনৈতিক সারিতে নিয়ে আসে।
- **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুই দেশের সম্পর্ক এখন কেবল 'প্রশিক্ষণ' প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা **আইএনএস কৃপাণ (INS Kirpan)** উপহার দেওয়া, হাই-স্পিড গার্ড বোট এবং **ব্রহ্মোস (BrahMos)** মিসাইল সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে গেছে।

ভারতের জন্য ভিয়েতনামের কৌশলগত গুরুত্ব

ভিয়েতনামকে ইন্দো-প্যাসিফিকের **'সুইং স্টেট'** এবং ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র **'সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ'** বলা হয়। এর গুরুত্ব বহুমাত্রিক:

১. **চীনের বিরুদ্ধে ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা:**

- **সামুদ্রিক প্রহরী:** দক্ষিণ চীন সাগরে ভিয়েতনামের ৩,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা চীনের **'নাইন-ড্যাশ লাইন'** বা একাধিপত্য মোকাবিলা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** ভারতের মতো ভিয়েতনামও কোনো সামরিক জোটে না গিয়ে **'বহু-মুখী নীতি'** অনুসরণ করে। স্বায়ত্তশাসনের এই অভিন্ন লক্ষ্য তাদের স্বাভাবিক বন্ধুতে পরিণত করেছে।

২. **আসিয়ানের (ASEAN) মূল চালিকাশক্তি:**

- **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার:** ভিয়েতনাম আসিয়ানের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল এবং সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রভাব ভিয়েতনামের সাথে সম্পর্কের গভীরতার ওপর সরাসরি নির্ভরশীল।
- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব:** ভিয়েতনাম বিভিন্ন আঞ্চলিক মঞ্চে (যেমন- ADMM-Plus এবং পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন) ভারতের বৃহত্তর ভূমিকার প্রতি সমর্থন জানায়।

৩. **সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা:**

- **বাণিজ্য পথ রক্ষা:** ভারতের বাণিজ্যের ৫০%-এর বেশি অংশ দক্ষিণ চীন সাগর এবং মালাক্কা প্রণালী দিয়ে যায়। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ভিয়েতনাম নিশ্চিত করে যে এই **সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ** (SLOC) যেন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।
- **কার্যকরী পরিধি:** ভিয়েতনাম ভারতকে তার বন্দরগুলোতে (যেমন- **ক্যাম রান বে**) প্রবেশের সুযোগ দেয়, যা ভারত মহাসাগরের বাইরেও ভারতের নৌ-সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৪. **জ্বালানি নিরাপত্তা ও ব্লু ইকোনমি:**

- **তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান:** ভিয়েতনাম ভারতকে দক্ষিণ চীন সাগরে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের প্রস্তাব দিয়েছে। চীনের চাপ সত্ত্বেও ভারতের **ওএনজিসি বিদেশ** (OVL) সেখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যা ভারতের শক্তিশালী কৌশলগত অবস্থানের প্রতীক।

৫. **প্রতিরক্ষা শিল্প অংশীদারিত্ব:**

- **দেশীয় পণ্যের বাজার:** ভারত থেকে **ব্রহ্মোস**, আকাশ মিসাইল এবং তেজস যুদ্ধবিমানের মতো প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম একটি প্রধান গ্রাহক হতে পারে। এটি ভারতকে একটি নির্ভরযোগ্য **'আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রদানকারী'** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।
- **এমআরও (MRO) হাব:** যেহেতু উভয় দেশই রাশিয়ান প্রযুক্তির সরঞ্জাম (যেমন- Su-30 যুদ্ধবিমান, **কিলো-ক্লাস** সাবমেরিন) ব্যবহার করে, তাই রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

৬. **অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য (চায়না-প্লাস-ওয়ান):**

- **সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা:** একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে ভিয়েতনাম ভারতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স, টেক্সটাইল এবং **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (রেয়ার আর্থ)** সংগ্রহের ক্ষেত্রে চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে।

ভারত-ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রধান স্তম্ভসমূহ

১. **উচ্চ-স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (২+২ সংলাপ):** উভয় দেশ বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের নিয়ে একটি **২+২ সংলাপ** শুরু করতে সম্মত হয়েছে। এটি এই সম্পর্ককে কোয়াড (Quad) দেশগুলোর মতো সমান কৌশলগত উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

২. **প্রতিরক্ষা শিল্প ও সরঞ্জাম ক্রয়:** সহযোগিতা এখন কেবল প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধ নেই। ভারত থেকে **ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল**, টহল জাহাজ এবং উচ্চ-গতির নৌকা কেনার বিষয়ে আলোচনা পুনরায় গতি পেয়েছে।

৩. **রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের (MRO) সহায়তা:** ভিয়েতনামকে তাদের রাশিয়ান প্ল্যাটফর্ম (যেমন- Su-30 এবং **কিলো-ক্লাস** সাবমেরিন) রক্ষণাবেক্ষণে ভারত কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। ভারতের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর।

৪. **সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও তথ্য আদান-প্রদান:** দক্ষিণ চীন সাগরে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে দুই দেশ একমত। বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর গতিবিধি ট্র্যাক করতে তারা একটি **'হোয়াইট শিপিং ইনফরমেশন শেয়ারিং'** চুক্তির দিকে এগোচ্ছে।

৫. **প্রতিরক্ষা ঋণ (LoC):** ভারত ভিয়েতনামকে **৫০০ মিলিয়ন ডলারের** প্রতিরক্ষা ঋণ দিয়েছে, যার মধ্যে ৩০০ মিলিয়ন ডলার নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভিয়েতনাম ভারতের তৈরি **অফশোর টহল জাহাজ** (OPV) সংগ্রহ করতে পারবে।

৬. **মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ:** ভারত ITEC প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভিয়েতনামের সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এর মধ্যে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন এবং সাবমেরিন পরিচালনার জন্য বিশেষ আন্ডারওয়াটার কমব্যাট প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারত-ভিয়েতনাম সম্পর্কের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **"চীন ফ্যাক্টর" এবং অসম চাপ:** চীনের সাথে ভৌগোলিক নিকটবর্তী হওয়া এবং গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণে ভিয়েতনামকে তার বৈদেশিক সম্পর্ক খুব সাবধানে বজায় রাখতে হয়। বেইজিংকে ক্ষুব্ধ করতে পারে এমন কোনো সরাসরি **সামরিক জোটে** যোগ দিতে তারা প্রায়ই দ্বিধা বোধ করে।

২. **বাস্তবায়ন এবং "প্রকল্প পূরণে ঘাটতি":** সমঝোতা স্মারক (MoUs) স্বাক্ষর এবং প্রকৃত প্রকল্প সমাপ্তির মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবধান রয়ে গেছে। বিশেষ করে **৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ঋণ (Line of Credit)** ব্যবহার এবং পরিকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়।

৩. **প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে জটিলতা (যেমন- ব্রহ্মোস):** ঘাতক অস্ত্র বা প্ল্যাটফর্ম রপ্তানির ক্ষেত্রে জটিল আর্থিক ব্যবস্থা, ভিয়েতনামের বর্তমান সিস্টেমের সাথে প্রযুক্তিগত সমন্বয় এবং এর ফলে তৈরি হওয়া **আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব** সামলানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৪. **কাঠামোগত অর্থনৈতিক বাধা:** দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এখনো একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে আছে। উচ্চ **লজিস্টিক খরচ**, সরাসরি জাহাজ চলাচলের পথের অভাব এবং কঠোর আইনি কাঠামোর কারণে ভারতীয় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা ভিয়েতনামে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হন।

৫. **বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মে মতভেদ:** উভয় দেশই নিয়মতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পক্ষে থাকলেও, ভিয়েতনাম **"কোয়াড" (Quad)**-এর নিরাপত্তা বিষয়ক ব্র্যান্ডিং নিয়ে কিছুটা সতর্ক। তারা বড় শক্তিগুলোর লড়াইয়ের মাঝে না পড়ে **আসিয়ান (ASEAN)** পরিচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধান করতে পছন্দ করে।

৬. **যোগাযোগ প্রকল্পের ধীরগতি:** মায়ানমারের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে **ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড (IMT) ত্রিপক্ষীয় হাইওয়ে**-র ভিয়েতনামে সম্প্রসারণের কাজ থমকে গেছে। এটি সরাসরি বাণিজ্য এবং **"অ্যাক্ট ইস্ট"** নীতির সম্ভাবনাকে সীমিত করছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশিকা

১. **প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন:** কেবল সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে **ব্রহ্মোস মিসাইল** সঠিক সময়ে সরবরাহ এবং **৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ঋণের** কার্যকর ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। ভারতকে একটি নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে উন্নত MRO **(রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং ওভারহল)** সহায়তা প্রদান অপরিহার্য।

২. **সামুদ্রিক ডোমেন সচেতনতা (MDA) বৃদ্ধি:** বেসামরিক জাহাজ চলাচলের ওপর নজরদারি বাড়াতে **'হোয়াইট শিপিং'** চুক্তিগুলো দ্রুত কার্যকর করা এবং যৌথ টহল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এটি দক্ষিণ চীন সাগরে যেকোনো ধরনের সামুদ্রিক জবরদস্তির বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

৩. **সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করা 'চায়না-প্লাস-ওয়ান':** কৌশলের সুযোগ নিয়ে সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং টেক্সটাইল শিল্পে দুই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে একত্রিত করতে হবে। বিশ্ববাজারের একাধিপত্য ভাঙতে এবং প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (রেয়ার আর্থ)** উত্তোলনে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

৪. **ডিজিটাল এবং আর্থিক সংযোগের গতিবৃদ্ধি:** ব্যবসা ও পর্যটনের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুত আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের জন্য ভারতের UPI এবং ভিয়েতনামের NAPAS-এর মধ্যকার সমন্বয় আরও প্রসারিত করতে হবে। এই **'ডিজিটাল সেতু'** অর্থনৈতিক একীভূতকরণকে ত্বরান্বিত করবে এবং অন্যান্য আসিয়ান (ASEAN) দেশগুলোর জন্য ফিনটেক সহযোগিতার একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে।

৫. **ভৌত যোগাযোগ প্রকল্পগুলোর পুনরুজ্জীবন:** দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সংযুক্ত করতে **ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড (IMT) ত্রিপক্ষীয় হাইওয়ে** প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে এবং এটি ভিয়েতনাম পর্যন্ত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে। লজিস্টিক খরচ কমাতে এবং **২৫ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা** অর্জনে সরাসরি জাহাজ চলাচলের পথ উন্নত করা অপরিহার্য।

৬. **জ্বালানি নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব রূপান্তর** প্রথাগত তেল অনুসন্ধানের পাশাপাশি **গ্রিন হাইড্রোজেন**, সৌরশক্তি এবং অফশোর উইন্ড এনার্জির মতো পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। **'ব্লু ইকোনমি'** বা সমুদ্রনির্ভর অর্থনীতিতে যৌথ গবেষণা একদিকে যেমন জ্বালানি স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সহায়ক হবে।

উপসংহার

ভারত-ভিয়েতনাম অংশীদারিত্ব একটি বহুমুখী ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য **ভূ-রাজনৈতিক নোঙর** হিসেবে কাজ করে। **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব** এবং **সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা** ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে এই "উন্নত" জোট আঞ্চলিক নিরাপত্তাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে এবং একতরফা আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

Q. India–Vietnam relations have emerged as a key pillar of India's Indo-Pacific strategy. Discuss the strategic, economic, and geopolitical significance of the India–Vietnam partnership in the evolving regional order. (15 Marks)

2.2.5. ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্ক এবং KIND-X উদ্যোগ

প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া **Korea-India Defence Accelerator (KIND-X)** চালু করেছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের **স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ**-কে একটি বিশেষ "উদ্ভাবন সেতু" বা **Innovation Bridge**-এর মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্কের বিবর্তন

উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কেবল ক্রেতা-বিক্রেতার গণ্ডি পেরিয়ে এখন একটি সহযোগিতামূলক **শিল্প অংশীদারিত্বে** রূপান্তরিত হয়েছে:

- **প্রাথমিক মাইলফলক:** ২০০৫ সালে প্রতিরক্ষা শিল্প ও লজিস্টিকস বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (MoU) এবং ২০১০ সালে **গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)** সহযোগিতার চুক্তি।
- **কৌশলগত উত্তরণ:** ২০১৫ সালে সম্পর্কটিকে **স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ**-এ উন্নীত করা।
- **সেরা উদাহরণ (K9 Vajra-T):** 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র অধীনে **L&T** এবং দক্ষিণ কোরিয়ার **Hanwha Aerospace**-এর যৌথ প্রচেষ্টায় **K9 Vajra-T** হাউইটজার কামানের সফল উৎপাদন ভবিষ্যতে এই ধরণের প্রকল্পের জন্য একটি আদর্শ মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- **২০২০ সালের রোডম্যাপ:** স্থল, নৌ, আকাশপথ এবং গাইডেড অস্ত্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও প্রসারিত করা হয়েছে।
- **ইন্দো-প্যাসিফিক সমন্বয়:** ভারতের **Act East Policy** এবং দক্ষিণ কোরিয়ার **New Southern Policy** (পরবর্তীতে ২০২২ সালের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল) এর মধ্যে সমন্বয় একটি নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।
- **KIND-X (২০২৬):** KIND-X-এর সূচনা মূলত একটি **উদ্ভাবন সেতু** হিসেবে কাজ করবে, যা বিশেষ করে **AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)**, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং **মহাকাশ সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্যের** ওপর গুরুত্ব দেবে।

KIND-X (Korea-India Defence Accelerator) সম্পর্কে ধারণা

১. **তাত্ত্বিক কাঠামো: "উদ্ভাবন সেতু" (Innovation Bridge)**

KIND-X হলো একটি সুসংগঠিত প্ল্যাটফর্ম যা দুই দেশের প্রতিরক্ষা-শিল্পের ভিত্তিগুলোকে একে অপরের সাথে যুক্ত করবে।

- **সফল মডেলের অনুকরণ:** এটি ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **INDUS-X** এবং ভারত-ফ্রান্সের **FRIND-X** মডেলের আদলে তৈরি, যা মূলত **স্টার্টআপ** এবং ক্ষুদ্র উদ্ভাবকদের জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

- **প্রধান সংস্থাসমূহ:** এটি ভারতের **iDEX** (Innovations for Defence Excellence) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার **DAPA** (Defense Acquisition Program Administration)-এর মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে।
- **অংশীদার:** এটি কেবল সরকারি স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে **স্টার্টআপ**, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প গবেষণা কেন্দ্রগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

২. **কৌশলগত উদ্দেশ্য**

- **ক্রয়ের বদলে যৌথ উন্নয়ন:** কেবল বিদেশ থেকে অস্ত্র কেনা কমিয়ে যৌথভাবে **গবেষণা (R&D)** এবং মেধাস্বত্ব তৈরির দিকে নজর দেওয়া।
- **সরবরাহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্য:** দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নত প্রযুক্তির সাথে ভারতের বিশাল উৎপাদন ক্ষমতাকে যুক্ত করে পুরনো বা লেগাসি সিস্টেমের (বিশেষ করে রুশ বা চিনা প্রযুক্তি) ওপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- **দ্বিমুখী প্রযুক্তি (Dual-Use Technology):** দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তি জায়ান্টগুলোর (যেমন- **Samsung, Hyundai**) অসামরিক প্রযুক্তিগত সাফল্যকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে (যেমন- AI এবং রোবোটিক্স) কাজে লাগানো।

৩. **অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রযুক্তির ক্ষেত্রসমূহ**

KIND-X কাঠামোর অধীনে দুই দেশ পাঁচটি **"ফ্রন্টিয়ার ডোমেইন"** বা অত্যাধুনিক ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে:

ক্ষেত্র	গুরুত্বের বিষয়
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)	সামরিক AI প্ল্যাটফর্ম, রক্ষণাবেক্ষণের আগাম পূর্বাভাস এবং স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
মহাকাশ ও ISR	যৌথভাবে গোয়েন্দা ও নজরদারি স্যাটেলাইট (ISR) এবং মহাকাশের পরিস্থিতিগত সচেতনতা (SSA) তৈরি।
স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা	ড্রোন বা UAV, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য রোবোটিক্স এবং সামুদ্রিক ড্রোন।
সেমিকন্ডাক্টর	মিসাইল এবং রাডার সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় চিপের সরবরাহ নিশ্চিত করতে **ডিফেন্স সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব** তৈরি।
উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা	আধুনিক ড্রোন হামলা মোকাবিলায় যৌথভাবে স্বয়ংক্রিয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা।

KIND-X-এর কৌশলগত গুরুত্ব এবং সমন্বয়

- **দূরদর্শী লক্ষ্যমাত্রা (Visionary Alignment):** এটি ভারতের **"ভিশন ২০৪৭"** (স্বনির্ভরতা) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার **"ডিফেন্স ইনোভেশন ৪.০"** (AI-চালিত যুদ্ধকৌশল)-এর মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। এর ফলে লক্ষ্য কেবল অন্যদের ধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বৈশ্বিক প্রযুক্তির মানদণ্ড নির্ধারণের দিকে এগিয়ে যায়।
- **ইন্দো-প্যাসিফিক স্থিতিশীলতা:** এটি আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর বিপরীতে একটি **গণতান্ত্রিক বিকল্প** প্রদান করে **"নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা"**-কে শক্তিশালী করে এবং এশিয়ার মধ্যম সারির শক্তিগুলোর **"কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন"** বৃদ্ধি করে।
- **শিল্প ব্যবস্থার সংহতি:** এটি দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চ-প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলোর (যেমন- দাউজন, গুমি) সাথে ভারতের **প্রতিরক্ষা করিডোর** (উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু)-কে যুক্ত করে। এতে দক্ষিণ কোরিয়ার সূক্ষ্ম প্রকৌশল এবং ভারতের বিশাল উৎপাদন সক্ষমতার সমন্বয় ঘটে।
- **গভীর-প্রযুক্তিগত সমন্বয় (Deep-Tech Synergy):** দক্ষিণ কোরিয়ার সেমিকন্ডাক্টর এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পের নেতৃত্বকে কাজে লাগিয়ে **AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)**, রোবোটিক্স এবং মহাকাশ পরিস্থিতি সচেতনতা (SSA)-র মতো দ্বিমুখী ব্যবহারের প্রযুক্তি যৌথভাবে তৈরি করা।

- **বৈশ্বিক রপ্তানি কেন্দ্র:** এই অংশীদারিত্ব **"মেক ইন ইন্ডিয়া"** থেকে **"মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড"** (বিশ্বের জন্য উৎপাদন)-এর দিকে মোড় নিচ্ছে। K9 Vajra-র সফল মডেলকে ভিত্তি করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে (Global South) উচ্চ-মানের ও সাশ্রয়ী প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম যৌথভাবে সরবরাহ করা।

KIND-X বাস্তবায়নের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ

- **মেধাস্বত্ব (IP) ও প্রযুক্তির সংবেদনশীলতা:** অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি (যেমন- সেমিকন্ডাক্টর, স্যাটেলাইট অ্যালগরিদম) শেয়ার করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের নিরাপত্তা এবং দুই দেশের **মেধাস্বত্ব (IP)** আইনের ভিন্নতা।
- **আর্থিক সমন্বয়:** প্রতিরক্ষা স্টার্টআপগুলোর জন্য নিয়মিত অনুদান এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বা **"পেশেন্ট ক্যাপিটাল"** প্রদানের জন্য (INDUS-X-এর মতো) কোনো সুসংগঠিত দ্বিপাক্ষিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেমের অনুপস্থিতি।
- **আমলাতান্ত্রিক বৈষম্য:** ভারতের দীর্ঘ প্রতিরক্ষা ক্রয় প্রক্রিয়া (DAP) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার দ্রুত গতির **"ইনোভেশন ৪.০"** চক্রের মধ্যে সময়ের অমিল, যা বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে।
- **ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য: চিন** সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন পররাষ্ট্রনীতি সংবেদনশীল সামরিক সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে কিছু "লক্ষণরেখা" বা বাধার সৃষ্টি করে, যা কাটিয়ে উঠতে সূক্ষ্ম কূটনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন।
- **প্রযুক্তিগত মানদণ্ড:** উভয় দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সাধারণ MIL-SPEC (মিলিটারি স্পেসিফিকেশন) এবং যৌথ শংসাপত্র পদ্ধতির অভাব, যা নতুন প্রযুক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করায়।

ভবিষ্যৎ পথ

- **নিবেদিত ভেঞ্চার ফান্ড:** সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশ গবেষণার (ISR) মতো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগের জন্য DIO এবং DAPA-র মাধ্যমে একটি যৌথ **KIND-X ফান্ড** গঠন করা।
- **দ্রুত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা (Regulatory Fast-Track):** ভারতের প্রতিরক্ষা ক্রয় প্রক্রিয়ায় (DAP) একটি **"গ্রিন চ্যানেল"** তৈরি করা এবং ল্যাবরেটরি থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযুক্তি পৌঁছানোর গতি বাড়াতে যৌথ টেস্টিং পদ্ধতি চালু করা।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপ:** প্রতি বছর **KIND-X সামিট** আয়োজন করা এবং এতে বিনিয়োগকারী, একাডেমিয়া ও শিল্পনেতাদের সরাসরি যুক্ত করা।
- **স্থানীয় হাব সংহতি:** দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলোর সাথে ভারতের উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর প্রতিরক্ষা করিডোরকে সরাসরি যুক্ত করে **"কোরিয়া-ভারত টেক জোন"** গড়ে তোলা।
- **সামুদ্রিক ও দ্বিমুখী ব্যবহারের প্রযুক্তিতে ফোকাস:** দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মাণ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে **সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা (MDA)** এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল সুরক্ষিত করা।

উপসংহার

KIND-X মূলত একটি বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের বহিঃপ্রকাশ, যা প্রযুক্তিগত পারস্পরিক নির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গভীর-প্রযুক্তিগত ইকোসিস্টেমগুলোকে একীভূত করার মাধ্যমে এটি ভারতের **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন** এবং **আত্মনির্ভরতাকে** শক্তিশালী করে। এটি এই দুই দেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তার জন্য একটি শক্তিশালী **গণতান্ত্রিক উৎপাদন কেন্দ্রে** পরিণত করছে।

Q. Discuss the significance of the Korea-India Defence Accelerator (KIND-X) in strengthening India's defence indigenisation and strategic cooperation in the Indo-Pacific region. (15 Marks)

2.2.6. ইউ.এস.-চীন (US-China) কৌশলগত স্থিতিশীলতা এবং ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং শি জিনপিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলন বাণিজ্য, তাইওয়ান, প্রযুক্তি এবং বৈশ্বিক প্রভাব নিয়ে চলমান বিরোধের মাঝেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে উত্তেজনা সাময়িকভাবে কমার ইঙ্গিত দিয়েছে।

US-China শীর্ষ সম্মেলনের মূল বিষয়সমূহ

- **বিশাল বিমান চুক্তি (Massive Aviation Deal):** চীন **২০০টি বোয়িং বিমান** কেনার একটি বিশাল চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, যা পরবর্তীতে জেনারেল ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫০টি বিমান পর্যন্ত বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
- **তাইওয়ান অস্ত্র চুক্তি স্থগিত (Taiwan Arms Package Stall):** প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর তাইওয়ানের জন্য একটি বড় ধরনের মুলতুবি থাকা অস্ত্র চুক্তি এগিয়ে নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে তিনি এখনও অনুমোদন বা সিদ্ধান্ত নেননি।
- **পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা (Denuclearization Dialogue):** এই দুই পরাশক্তি বৈশ্বিক পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ কৌশল নিয়ে সক্রিয়ভাবে আলোচনা করেছে, যদিও এর সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নের বিবরণ এবং কূটনৈতিক সময়সূচী কঠোরভাবে **গোপন** রাখা হয়েছে।
- **কৌশলগত নিরাপত্তা ভারসাম্য (Strategic Security Equilibrium):** পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক শক্তি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিরোধের পথ পার হতে উভয় দেশই উচ্চ-স্তরের প্রতিরক্ষা ও আধুনিক যুদ্ধ কূটনীতিতে জড়িত হয়েছে।
- **বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনর্ভারসাম্য (Global Economic Rebalancing):** বাণিজ্য আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরে চলা বাজার দখলের ভারসাম্যহীনতা দূর করতে **সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা** এবং বড় ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ইউ.এস.-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাঠামোগত প্রকৃতি

১. **একমেরুবিশ্বের পতন**

- আমেরিকার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এখনও অটুট রয়েছে।
- তবে, বিশ্বমঞ্চে এর অবিসংবাদিত আধিপত্য নিয়ে দিন দিন প্রশ্ন উঠছে।

একমেরুবিশ্বের পতনের কারণসমূহ:

- অত্যন্ত ব্যয়বহুল বৈদেশিক যুদ্ধসমূহ
- আপেক্ষিক অর্থনৈতিক মন্দা
- বিকল্প শক্তিশালী কেন্দ্রের উত্থান

২. **চীনের উত্থান**

- চীন এখন আর দেং শিয়াওপিংয়ের **"নিজের ক্ষমতা লুকিয়ে রাখো এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করো"** (hide capabilities and bide time) নীতি অনুসরণ করছে না।
- চীন নিচের ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে তার প্রভাব বিস্তার করছে:
  - **বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)**
  - প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধিপত্য

- সামরিক আধুনিকীকরণ
- দক্ষিণ চীন সাগরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

থুসিডাইডিস ট্র্যাপ (Thucydides Trap)

"থুসিডাইডিস ট্র্যাপ" বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একটি উদীয়মান বা নতুন শক্তির উত্থান যখন কোনো বিদ্যমান শক্তিশালী দেশকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ বা সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

এই শব্দটি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডাইডিসের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত, যিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এথেন্সের উত্থান এবং তার ফলে স্পার্টার মনে তৈরি হওয়া ভয়ই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

কাদের মধ্যে সংঘাত:

- প্রতিষ্ঠিত শক্তি = **আমেরিকা (U.S.)**
- উদীয়মান শক্তি = **চীন (China)**

প্রতিষ্ঠিত শক্তি (আমেরিকা) + উদীয়মান শক্তি (চীন) = কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা

- বাণিজ্য যুদ্ধ (Trade wars)
- প্রযুক্তি যুদ্ধ (Technology wars)
- ইন্দো-প্যাসিফিক বা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিযোগিতা
- তাইওয়ান উত্তেজনা

ভারতের ওপর এর প্রভাব

- **কৌশলগত সুবিধার হ্রাস (Dilution of Strategic Leverage):** ওয়াশিংটন এবং বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনকে প্রতিহত করার জন্য ভারতকে একটি অপরিহার্য বা প্রথম সারির অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করার আমেরিকার তাৎক্ষণিক আগ্রহ কিছুটা কমে যেতে পারে।
- **সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষতি (Disruption of Supply Chain Derisking):** চীনের ওপর আমেরিকার প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়া এবং দ্বিপাক্ষিক শুল্ক কমে যাওয়ার সম্ভাবনা ভারতের **"চীন-প্লাস-ওয়ান" (China-Plus-One)** নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এর ফলে বিদেশী বিনিয়োগ আবার ভারতীয় বাজারের বদলে চীনের ফ্যাক্টরিগুলোতে ফিরে যেতে পারে।
- **আঞ্চলিক শত্রুদের ওপর চাপ হ্রাস (Reduced Pressure on Regional Adversaries):** বেইজিংয়ের সাথে ওয়াশিংটনের এই বাণিজ্যিক ও স্বার্থভিত্তিক সম্পর্ক পাকিস্তানের সাথে চীনের গভীর সামরিক-অর্থনৈতিক আঁতাতকে কঠোরভাবে দমন করার ক্ষেত্রে আমেরিকার ইচ্ছাকে কমিয়ে দিতে পারে।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সমুদ্রপথের দুর্বলতা:** হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত রাখার ব্যাপারে ইউ.এস.-চীন যৌথ প্রতিশ্রুতি ভারতের প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানির জন্য সাময়িক স্বস্তি দিলেও, এটি বিশ্বসামুদ্রিক রুটের ওপর দুই পরাশক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকেই স্পষ্ট করে তোলে।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা:** বড় দুই শক্তির এই আকস্মিক সমঝোতা নতুন দিল্লিকে তার পররাষ্ট্রনীতি পুনর্বিবেচনা করতে, **কোয়াড (Quad)**-এর মতো বহুপাক্ষিক জোটগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে এবং স্বাধীনভাবে নিজস্ব অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে বাধ্য করছে।

ভবিষ্যতের পথ

- **দেশীয় উৎপাদন ও পরিকাঠামো দ্রুত বৃদ্ধি করা:** ভারতকে জমি, শ্রম এবং লজিস্টিকস ক্ষেত্রে দ্রুত সংস্কার করতে হবে যাতে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনকে নিজেদের দেশে আনা যায়। এর ফলে ইউ.এস.-চীন বাণিজ্য চুক্তির পরেও ভারত যেন প্রধান **"China-Plus-One"** গন্তব্য হিসেবে টিকে থাকে।

- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং বহুপাক্ষিক জোট গভীর করা:** ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দুই পরাশক্তির আধিপত্য রুখতে নতুন দিল্লিকে অন্যান্য মাঝারি শক্তির দেশগুলোর (যেমন ফ্রান্স, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া) সাথে স্বাধীন অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে এবং কোয়াড (Quad)-এর মতো জোটকে শক্তিশালী করতে হবে।
- **প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন (Techno-National Self-Reliance):** সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো গভীর প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে জাতীয় মিশন পরিচালনা করতে হবে, যাতে ওয়াশিংটন বা বেইজিং—কারও ওপরই প্রযুক্তিগত নির্ভরতা না থাকে।
- **প্রতিবেশী প্রথম নীতি এবং সামুদ্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা:** ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব রুখতে ভারতকে সক্রিয় কূটনীতি এবং নৌবাহিনীর দ্রুত আধুনিকীকরণের মাধ্যমে এই অঞ্চলে নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে হবে।
- **অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)-র সঠিক ব্যবহার:** হঠাত্ তৈরি হওয়া বৈশ্বিক বাণিজ্যের ধাক্কা সামলাতে এবং রপ্তানি বাজারকে বহুমুখী করতে ভারতকে যুক্তরাজ্য (UK), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং ইউরেশিয়ান দেশগুলোর সাথে উচ্চ-মানের দ্বিপাক্ষিক **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার ক্ষমতার ওপর। প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে, স্থিতিস্থাপক বহুপাক্ষিক জোট গঠন করে এবং অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করার মাধ্যমে নতুন দিল্লি আত্মবিশ্বাসের সাথে এই দুই পরাশক্তির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং উদীয়মান বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থায় নিজেকে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

Q. The emerging rivalry between the United States and China is often explained through the concept of the "Thucydides Trap". Examine the structural nature of U.S.-China competition and discuss its implications for India's strategic autonomy. (15 marks)

2.2.7. ভারত-উত্তরাঞ্চলীয় অংশীদারিত্ব এবং উদীয়মান সুমেরু ভূ-রাজনীতি

প্রেক্ষাপট

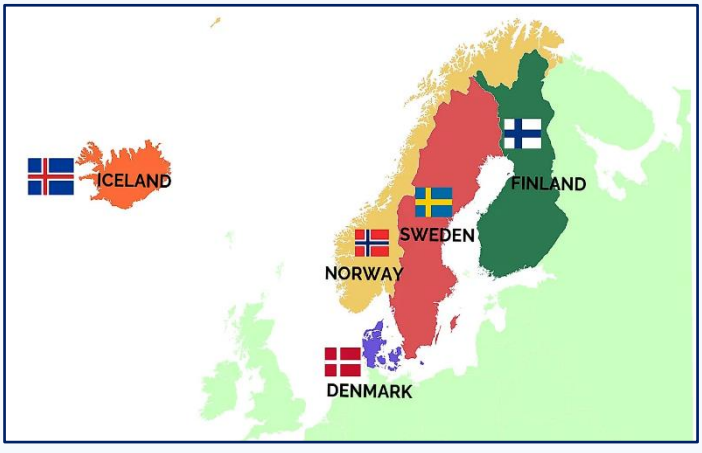

পরিবর্তিত বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির মধ্যে তৃতীয় **ভারত-উত্তরাঞ্চলীয় শীর্ষ সম্মেলনে (India-Nordic Summit)** যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওসলো (Oslo) সফর করেন। আগে উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক মূলত জলবায়ু সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং নীল অর্থনীতির (Blue Economy) উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই অংশীদারিত্ব **কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা** সংক্রান্ত দিক অর্জন করছে।

ভারত-উত্তরাঞ্চলীয় সম্পর্কের বিবর্তন

উত্তরাঞ্চলীয় বা নরডিক দেশগুলির মধ্যে রয়েছে: **নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং আইসল্যান্ড**।

- **প্রথম পর্যায় (২০১৮-২০২২):** স্টকহোমে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন (২০১৮) এবং কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনের (২০২২) মাধ্যমে এই সম্পর্কটি গড়ে ওঠে। শুরুতে এই সম্পর্ক মূলত কার্যকর সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল:
  - **জলবায়ু রক্ষা এবং পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি রূপান্তর (Green Transition)**।

- **ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন**।
- **নীল অর্থনীতি এবং সামুদ্রিক সহযোগিতা**।

- **দ্বিতীয় পর্যায় (বর্তমান - ২০২৬ এবং পরবর্তী সময়):** একটি পরিবর্তনশীল আটলান্টিক চুক্তি এবং ইউরোপের কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে, এই সম্পর্কটি সাময়িক যোগাযোগ থেকে একটি **দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত অংশীদারিত্বে** (Strategic Partnership) রূপান্তরিত হচ্ছে।

এই অংশীদারিত্ব কেন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে

১. **ভূ-রাজনীতি পুনর্গঠন:** ন্যাটো-রাশিয়া-চীন (NATO-Russia-China) মেরু দ্বন্দ্বের মধ্যে এটি ভারতকে ইন্দো-প্যাসিফিক এবং উত্তর ইউরোপে একটি বিশ্বস্ত, **আধিপত্যহীন গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব** প্রদান করে।

২. **মৌসুমী বায়ু এবং জলবায়ু নিরাপত্তা:** সুমেরুর বরফ গলে যাওয়ার যৌথ গবেষণা ভারতকে তার **গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুর বিপর্যয়** এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

৩. **পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি রূপান্তর:** উপকূলীয় বায়ু শক্তি (Offshore Wind), গ্রিন হাইড্রোজেন এবং ভূ-তাপীয় (Geothermal) প্রযুক্তিতে উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলির নেতৃত্ব ভারতের বিশাল **নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণ** এবং নেট-জিরো (Net-Zero) লক্ষ্য পূরণকে ত্বরান্বিত করবে।

৪. **সরবরাহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্যকরণ:** সুইডেনের খনিজ উপাদান (Rare Earth Elements) এবং নরওয়ের গভীর সমুদ্রে খনির কাজ করার সুযোগ ভারতকে **চীনের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে** তার গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উৎসের বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করবে।

৫. **সামুদ্রিক সংযোগ:** এটি **চেন্নাই-ভ্লাদিভোস্টক করিডোরকে** (Chennai-Vladivostok corridor) **উত্তর সমুদ্র পথের** (Northern Sea Route) সাথে যুক্ত করার পথ উন্মুক্ত করে, যা উত্তর ইউরোপে বিকল্প ও দক্ষ সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ নিশ্চিত করবে।

৬. **উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়):** ৫জি/৬জি (5G/6G), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সেমিকন্ডাক্টরে উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলির দক্ষতা ভারতের বিশাল **ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিভা এবং ডিজিটাল উৎপাদন ক্ষমতাকে** শক্তিশালী করবে।

সুমেরু অঞ্চলে ভারতের অংশগ্রহণ

ভারত ২০১৩ সালে **সুমেরু পরিষদের** (Arctic Council) **পর্যবেক্ষক** (Observer) রাষ্ট্র হয়। সুমেরু অঞ্চলে ভারতের বিদ্যমান পরিকাঠামোসমূহ হলো:

- **হিমাদ্রি গবেষণা কেন্দ্র** (Himadri Research Station)
- **ইন্ডআর্ক পানির নিচের মানমন্দির** (IndARC Underwater Observatory)
- **গ্রুভেবাডেট বায়ুমণ্ডলীয় পরীক্ষাগার** (Gruvebadet Atmospheric Laboratory) (নরওয়েতে অবস্থিত)

ভারতের সুমেরু কৌশলের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার কঠিন পরীক্ষা** (Geopolitical Tightrope Balancing): নতুন ন্যাটো-অনুগামী উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলির সাথে সম্পর্ক নষ্ট না করে উত্তর সমুদ্র পথে রাশিয়ার সাথে **গভীর জ্বালানি সহযোগিতা** বজায় রাখা ভারতের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

২. **কঠিন পরিকাঠামোর চরম অভাব** (Severe Lack of Hard Infrastructure): ভারতের নিজস্ব **ভারী বরফভাঙা জাহাজ** (Heavy Icebreakers) এবং মেরু অঞ্চলের উপযোগী জাহাজের অভাব রয়েছে, যা সুমেরুর বরফাবৃত পানিতে ভারতের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে।

৩. **নির্দিষ্ট কূটনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতি** (Absence of Dedicated Diplomatic Leadership): চীন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অন্যান্য এশীয় পর্যবেক্ষক দেশের মতো ভারতের কোনো নির্দিষ্ট **সুমেরু বিষয়ক বিশেষ দূত** (Special Envoy for Arctic Affairs) নেই, যা ভারতের কূটনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে।

৪. **বিশাল আর্থিক পুঁজির প্রয়োজনীয়তা (Massive Financial Capital Requirements):** মেরু অঞ্চলের উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার, বিশেষায়িত জাহাজ তৈরি এবং গভীর সমুদ্রে গবেষণা পরিকাঠামো স্থাপনের জন্য **প্রচুর দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের** প্রয়োজন, যা ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

৫. **চীনের শক্তিশালী মেরু আধিপত্য (China's Overwhelming Polar Dominance):** চীনের **"পোলার সিল্ক রোড" (Polar Silk Road)**, উন্নত বরফভাঙা জাহাজ এবং রাশিয়ার সাথে যৌথ পরিকাঠামো প্রকল্পে আগ্রাসী বিনিয়োগ ভারতের সাথে একটি বড় কৌশলগত ব্যবধান তৈরি করছে।

৬. **নিয়ন্ত্রণমূলক এবং পরিবেশগত অনিশ্চয়তা (Regulatory and Environmental Uncertainties):** সম্পদ আহরণ এবং শিপিংয়ের ক্ষেত্রে সুমেরু পরিষদের **কঠোর পরিবেশগত আইনসমূহ** মেনে চলা ভারতের বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের বাণিজ্যিক লাভজনকতাকে সীমিত করে।

ভবিষ্যতের পথ

১. **সুমেরু বিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগ (Appoint a Special Envoy for Arctic Affairs):** অন্যান্য প্রধান এশীয় পর্যবেক্ষক দেশগুলির মতো সুমেরু পরিষদের আলোচনায় ভারতের জোরালো উপস্থিতি নিশ্চিত করতে একজন **নির্দিষ্ট সুমেরু কূটনৈতিক দূত** নিয়োগ করতে হবে।

২. **মেরু অঞ্চলের উপযোগী জাহাজ নির্মাণ দ্রুত করা (Fast-Track Ice-Class Shipbuilding):** ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে অন্তত পাঁচটি **সুমেরু-উপযোগী বরফ-শ্রেণির জাহাজ (Ice-class Vessels)** তৈরি করতে ভারতকে তার জাহাজ নির্মাণ আর্থিক সহায়তা নীতি (Shipbuilding Financial Assistance Policy) দ্রুত কাজে লাগাতে হবে।

৩. **ভারত-সুমেরু অর্থনৈতিক ফোরাম গঠন করা (Operationalize an India-Arctic Economic Forum):** টেকসই শিপিং, বিশেষায়িত জনশক্তি এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের জন্য উত্তরাঞ্চলীয় অংশীদারদের সাথে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের সংযোগ স্থাপনে একটি **আনুষ্ঠানিক বিটুবি (B2B) প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করা উচিত।

৪. **সুমেরু-হিমালয় জলবায়ু তথ্য করিডোর চালু করা (Launch the Arctic-Himalaya Climate Data Corridor):** মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার সাথে **ভারতীয় মৌসুমী বায়ুর সরাসরি সম্পর্ক** মানচিত্রায়নের জন্য উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলির সাথে একটি যৌথ বৈজ্ঞানিক ডেটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা উচিত।

৫. **পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির যৌথ উন্নয়নে জোর দেওয়া (Institutionalize Co-Development in Green Tech):** এই সম্পর্কটিকে সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক থেকে পরিবর্তন করে উপকূলীয় বায়ু শক্তির যন্ত্রাংশ, **গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন** এবং গ্রিড-ভারসাম্য প্রযুক্তির যৌথ উৎপাদনে রূপান্তর করতে হবে।

৬. **দ্বিমুখী নীতিমালার মাধ্যমে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা (Maintain Strategic Autonomy through Dual Engagement):** ভারতকে বাস্তবসম্মতভাবে উত্তর সমুদ্র পথে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক শিপিংয়ের সুযোগ খুঁজতে হবে, এবং একই সাথে টেকসই ও নিয়মভিত্তিক সুমেরু শাসনের জন্য **উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলির সাথে অংশীদারিত্ব** বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার

উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলির সাথে সাময়িক যোগাযোগকে একটি দীর্ঘস্থায়ী **কৌশলগত অংশীদারিত্বে** রূপান্তর করা ভারতকে **মেরু ভূ-রাজনীতিতে** দক্ষ হতে, **জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক মৌসুমী বায়ু** নিশ্চিত করতে এবং **পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে** নেতৃত্ব দিতে সাহায্য করবে, যা সুমেরু অঞ্চলে ভারতের অবস্থানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক **অংশীভাক (Stakeholder)** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

Q. "India's engagement with the Nordic countries is evolving from climate-centric cooperation to a broader strategic partnership shaped by Arctic geopolitics and emerging global power shifts." Discuss. (15 Marks)

2.2.8. ইউএই (UAE) এবং ইউরোপে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নতুন পদক্ষেপ

প্রেক্ষাপট

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি সফর বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার সাথে ভারতের ক্রমবর্ধমান **কৌশলগত অংশীদারিত্বের** প্রতিফলন ঘটায়। এই সফরের মূল লক্ষ্য ছিল **বাণিজ্য বহুমুখীকরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা, এআই (AI) গভর্নেন্স, জলবায়ু সহযোগিতা, আর্কটিক গবেষণা** এবং বহুপাক্ষিক সমন্বয়।

ইউরোপ এবং ইউএই (UAE) সফরের কৌশলগত পটভূমি

- **ভেঙে পড়া ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা:** পরাশক্তিদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইরানের সাথে ইউএস-ইসরায়েল উত্তেজনা** এবং চীনের আগ্রাসী অর্থনৈতিক নীতি এর জন্য দায়ী।
- **স্থগিত কূটনৈতিক কর্মসূচি:** ২০২৫ সালের **পাহলগাম সংঘাতের** পর বাতিল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **ভারত-নর্ডিক শীর্ষ সম্মেলন** এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক পুনরায় নতুন সূচিতে আয়োজন করতে হয়েছে।
- **সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্গঠন:** অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ঝুঁকি কমাতে এবং একটি স্থিতিস্থাপক ও বিকল্প বাণিজ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাপী ঐক্য তৈরি হচ্ছে।
- **দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সংকট:** এই সফরটি এমন একটি সময়ে হয়েছে যখন ভারতে বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা এবং জ্বালানির বাজারের ওঠানামা সামাল দেওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে **"মিতব্যয়িতা" বা সাশ্রয়ী নীতি** চালু করা হয়েছে।

এই সফরের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- **জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা রক্ষা করা:** বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট থেকে ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে ইউএই (UAE)-এর সাথে দীর্ঘমেয়াদী **কৌশলগত তেল মজুদ** চুক্তি করা এবং ইউরোপের সাথে পরিবেশবান্ধব পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিতে সহযোগিতা করা।
- **বাণিজ্য এবং বাজার চাঙ্গা করা:** ভারতীয় ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে এবং নর্ডিক অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য বাড়াতে **ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি** (India-EU FTA)-র মতো বড় অর্থনৈতিক চুক্তিগুলোর আলোচনা দ্রুত শেষ করা।
- **নির্ভরযোগ্য সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলা:** উৎপাদন ক্ষেত্রকে বহুমুখী করতে সমমনোভাবাপন্ন গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব করা, যাতে অর্থনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টিকারী দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমানো যায়।
- **ডিপ-টেক এবং খনিজ ক্ষেত্রে সহযোগিতা:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা **আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স** (AI)-এর নিরাপদ ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক নিয়ম তৈরি করা এবং ভারতের প্রযুক্তি খাতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ** (Critical Minerals)-এর নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- **জলবায়ু এবং সামুদ্রিক গবেষণা জোরদার করা:** মেরু অঞ্চলের **আর্কটিক জলবায়ুর প্রভাব** অধ্যয়ন করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমুদ্র পথগুলোর নিরাপত্তা বাড়াতে নর্ডিক দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

মূল সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

- **নির্ভরযোগ্য জ্বালানি মজুদ নিশ্চিত করা:** বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের ধাক্কা থেকে ভারতকে বাঁচাতে ইউএই (UAE)-র মতো দেশগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী তেলের মজুদ গড়ে তোলা।
- **সবুজ এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি (Clean-Tech) সম্প্রসারণ:** জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরের প্রযুক্তি ভাগ করে নিতে ইউরোপীয় ও নর্ডিক দেশগুলোর সাথে হাত মেলানো।

- **নতুন বাণিজ্য ও বাজারের দুয়ার উন্মোচন:** নতুন বাজার ধরতে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে বহুমুখী করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং **ইএফটিএ (EFTA)** চুক্তিগুলোর মতো বড় বাণিজ্য চুক্তিগুলোকে এগিয়ে নেওয়া।
- **ভবিষ্যতের প্রযুক্তি এবং কাঁচামালে সহযোগিতা:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর জন্য নিরাপদ নিয়ম তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করা।
- **আর্কটিক এবং সামুদ্রিক গবেষণাকে এগিয়ে নেওয়া:** নর্ডিক দেশগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আর্কটিক অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব খতিয়ে দেখা এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথগুলো রক্ষা করা।

ভারত-ইউরোপ সম্পর্কের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ

- **পরস্পরবিরোধী বৈশ্বিক জোটের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা:** ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ সামলানোর পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন** বজায় রাখা এবং পুরনো বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক টিকিয়ে রাখা।
- **বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বাস্তব চুক্তিতে রূপান্তর করা:** শুধুমাত্র উষ্ণ করমর্দন এবং কূটনৈতিক পুরস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, সেগুলোকে বাস্তব বাণিজ্যিক চুক্তিতে রূপান্তর করা যাতে দেশের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সুবিধা হয়।
- **কম বাণিজ্য পরিমাণের বাধা অতিক্রম করা:** নর্ডিক দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য বর্তমানে ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে আটকে রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে চলা এই ধীর অর্থনৈতিক গতি কাটিয়ে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে সমালোচনা মোকাবিলা করা:** ইউরোপে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করার বিষয়ে ভারতের অনীহার কারণে যে কূটনৈতিক অস্বস্তি ও জনসমক্ষে সমালোচনা তৈরি হয়েছে, তা দক্ষতার সাথে সামলানো।
- **প্রযুক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত ভিন্ন আইনগুলোর সমন্বয়:** ভারত এবং ইউরোপের আইনি ব্যবস্থা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও এআই (AI) নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং খনিজ উত্তোলনের মতো জটিল আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোকে সফলভাবে কার্যকর করা।

আগামী দিনের পথ

- **বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত অনুমোদন করা:** কূটনৈতিক গতিকে গভীর ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সংযোগে রূপান্তর করতে আসন্ন **ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (India-EU FTA)** স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত শেষ করা।
- **সবুজ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি কাঠামো কার্যকর করা:** শুধু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে **সবুজ কৌশলগত অংশীদারিত্ব (Green Strategic Partnerships)** এবং এআই (AI) গভর্নেন্সের অধীনে বাস্তব প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা।
- **নর্ডিক অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীর করা:** ২০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বাধা পার করতে নর্ডিক দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা।
- **গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার ব্যবধান দূর করা:** অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যের ধারণাকে আরও শক্তিশালী করতে আন্তর্জাতিক জনসম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপের মতো উন্মুক্ত প্রেস ব্রিফিং বা সংবাদ সম্মেলনের সাধারণ নিয়মগুলো গ্রহণ করা।
- **আসন্ন বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোর সঠিক ব্যবহার:** ফ্রান্সে অনুষ্ঠেয় **জি-৭ (G-7) আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলন** এবং ইউরোপের দ্বিপাক্ষিক সফরগুলোকে কাজে লাগিয়ে কৌশলগত তেল মজুদ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা সংক্রান্ত চুক্তিগুলো আরও মজবুত করা Cabinet স্তরে।

উপসংহার

ইউরোপ এবং ইউএই (UAE)-এর দিকে ভারতের এই কৌশলগত পদক্ষেপ একটি স্থিতিস্থাপক সাপ্লাই চেইন এবং সবুজ জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত্তি তৈরি করেছে। এই সম্পর্কগুলোকে স্থায়ী বাণিজ্য চুক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে তা উদীয়মান বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থায় ভারতকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থিতিশীল শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

Q. "Blanket bans on online gaming are often counterproductive in the digital age." Discuss in the context of the rise of offshore betting platforms and the need for a robust regulatory framework in India. (15 Marks)

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

2.3.1. সুরক্ষা থেকে সেবা: ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের পথ

ভূমিকা

- ভারতের জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্র বর্তমানে একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। **আয়ুষ্মান ভারত (PMJAY)**-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে বীমার আওতায় আসার ফলে **আর্থিক সুরক্ষা** বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থাটি আজও পরিষেবা ও পরিকাঠামোর মান, সাধ্য এবং সাম্যের গভীর **কাঠামোগত ঘাটতির** সঙ্গে লড়াই করছে।
- ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (NSO) কর্তৃক প্রকাশিত **৮০তম দফার হাউসহোল্ড সোশ্যাল কনজাম্পশন (হেলথ) সার্ভে**—যা কোভিড-পরবর্তী ভারতের প্রথম ব্যাপক স্বাস্থ্য সমীক্ষা—তা থেকে জানা যায় যে, কেবল একটি **বীমা কার্ড** থাকলেই হাসপাতালে বেড বা সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত হয় না। তাই **'কভারেজ' (বীমা সুরক্ষা) থেকে 'কেয়ার' (প্রকৃত পরিষেবা)** পর্যন্ত পৌঁছানোই এখন ভারতের স্বাস্থ্যনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পটভূমি: NSO ৮০তম রাউন্ড স্বাস্থ্য সমীক্ষার মূল তথ্য

- **সমীক্ষার পরিধি:** NSO-র এই সমীক্ষাটি মহামারী পরবর্তী এবং **প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY)** পূর্ণতা পাওয়ার পর পরিচালিত হয়েছে। এতে প্রায় ১.৩৯ লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগের সমীক্ষাগুলোতে দেখা গিয়েছিল যে অধিকাংশ ভারতীয়র কোনো স্বাস্থ্য বীমা ছিল না।

ক. স্বাস্থ্য-সন্ধানী আচরণ

- **অসুস্থতার হার (PPRA) প্রায় দ্বিগুণ:** অসুস্থতা রিপোর্ট করার হার (PPRA) গ্রামীণ এলাকায় ৬.৮% থেকে বেড়ে **১২.২%** এবং শহরাঞ্চলে ৯.১% থেকে বেড়ে **১৪.৯%** হয়েছে। এটি স্বাস্থ্যের অবনতি নয়, বরং মানুষের মধ্যে **সচেতনতা এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা নেওয়ার প্রবণতা** বৃদ্ধির সংকেত।
- **রোগতাত্ত্বিক পরিবর্তন (Epidemiological Transition):** ভারতে সংক্রামক ব্যাধি কমছে এবং **অসংক্রামক রোগ (NCDs)** যেমন—ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ বাড়ছে। আইইসি (IEC) প্রচারণা এবং কমিউনিটি স্ক্রিনিংয়ের ফলে এই রোগগুলো দ্রুত শনাক্ত হচ্ছে।

খ. পকেট থেকে খরচ

- **হাসপাতালে ভর্তির খরচ:** অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তির খরচ কম থাকে; কেবল ক্যান্সার বা বড় অস্ত্রোপচারের মতো ব্যয়বহুল ক্ষেত্রগুলোই গড় খরচ বাড়িয়ে দেয়। সরকারি সুবিধায় হাসপাতালে ভর্তির জন্য **গড় খরচ মাত্র ১,১০০ টাকা** এবং বহির্বিভাগে (OPD) খরচ প্রায় শূন্য।
- **সরকারি উদ্যোগের প্রভাব:** সরকারের **বিনামূল্যে ওষুধ পরিষেবা (FDSI)**, বিনামূল্যে রোগনির্ণয় উদ্যোগ এবং ১.৮৪ লক্ষ **আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (AAMs)** এই খরচ কমাতে বড় ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে সমাজের দরিদ্রতম স্তরের মানুষের পকেট থেকে খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে।

গ. স্বাস্থ্য বীমার আওতা

- **তিন গুণ বৃদ্ধি:** PMJAY এবং রাজ্য সরকারগুলোর প্রকল্পের ফলে বীমার আওতা গ্রামীণ এলাকায় ১২.৯% থেকে বেড়ে **৪৫.৫%** এবং শহরে ৮.৯% থেকে বেড়ে **৩১.৮%** হয়েছে। এটি দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিকিৎসার বিশাল ঋণের হাত থেকে রক্ষা করছে।

ঘ. সরকারি সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার

- **বহির্বিভাগ পরিষেবা (OPD):** গ্রামীণ এলাকায় সরকারি কেন্দ্রে চিকিৎসার হার ২৮% থেকে বেড়ে **৩৫%** হয়েছে। প্রতিরোধমূলক এবং প্রাথমিক রোগ নির্ণয় পরিষেবার উন্নতির ফলে সাধারণ মানুষের সরকারি ব্যবস্থার প্রতি ভরসা বাড়ছে।

ঙ. মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য

- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব (Institutional Deliveries):** হাসপাতালে প্রসবের হার গ্রামীণ এলাকায় ৯০.৫% থেকে বেড়ে **৯৫.৬%** হয়েছে।
- **সরকারি প্রকল্পের সুফল:** জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY) এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রভাবে বর্তমানে গ্রামীণ এলাকার **৬৬.৮% প্রসব সরকারি হাসপাতালেই** সম্পন্ন হচ্ছে।

ভারতের জনস্বাস্থ্য খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. সরকারি হাসপাতালের কাঠামোগত দুর্বলতা

- **বাজেট বরাদ্দ:** ভারত স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি-র (GDP) মাত্র **২.১%** ব্যয় করে (২০২১-২২), যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশকৃত ৫%-এর চেয়ে অনেক কম। ব্রাজিল (৯.৬%) বা থাইল্যান্ডের (৩.৭%) মতো দেশগুলো ভারতের তুলনায় অনেক বেশি খরচ করে।
- **শয্যা সংকট:** ভারতে প্রতি ১,০০০ জন মানুষের জন্য মাত্র **০.৫৫টি** হাসপাতালের বেড রয়েছে, যেখানে WHO-এর মানদণ্ড হলো প্রতি ১,০০০ জনে ৩টি বেড। এটি সরকারি খাতের দীর্ঘস্থায়ী **পরিকাঠামো ঘাটতিকে** প্রকাশ করে।
- **জনবল সংকট:** ভারতে প্রতি ১,০০০ জন মানুষের বিপরীতে মাত্র **০.৬৫ জন ডাক্তার** রয়েছেন (WHO-এর সুপারিশ ১ জন)। বিশেষ করে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় এই সংকট প্রকট।
- **দ্বি-স্তরীয় ব্যবস্থা:** বেসরকারি হাসপাতালগুলো উন্নত ও সুপার-স্পেশালিটি চিকিৎসায় আধিপত্য বিস্তার করছে, অন্যদিকে সরকারি ব্যবস্থা মূলত প্রাথমিক এবং সাধারণ চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২. প্রকৃত সেবা ছাড়াই বীমা কভারেজ

- **হাসপাতালের অনীহা:** PMJAY-এর রিইম্বারসমেন্ট বা প্রতিদান হার বাজার মূল্যের চেয়ে কম হওয়ায় অনেক বেসরকারি হাসপাতাল এই তালিকায় নাম লেখাতে চায় না। ফলে রোগীদের অনেক সময় আলাদাভাবে খরচ বহন করতে হয়।
- **ব্যবহারিক বর্জন:** বীমার আওতায় আসা মানুষের সংখ্যা তিন গুণ বাড়লেও, হাসপাতালে ভর্তির হার ২০১৪-পূর্ব স্তরে ফেরেনি। এটি প্রমাণ করে যে, খাতায়-কলমে বীমা থাকলেও দরিদ্র মানুষ এখনও **প্রকৃত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত**।
- **সচেতনতার অভাব:** নিজেদের অধিকার এবং তালিকাভুক্ত হাসপাতাল সম্পর্কে ধারণার অভাবে বীমার ব্যবহার কম হচ্ছে, বিশেষ করে নারী, বয়স্ক এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

৩. প্রতিরোধমূলক ও দীর্ঘমেয়াদী রোগের চিকিৎসায় অর্থের অভাব

- **অ-সংক্রামক রোগ (NCD):** বর্তমানে ভারতে মোট মৃত্যুর ৬০%-এর বেশি ঘটে অ-সংক্রামক রোগের কারণে (ICMR, ২০২৩)। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
- **তহবিলের ঘাটতি:** 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির' (AAM) নেটওয়ার্ক বিনামূল্যে ওষুধ ও রোগনির্ণয় পরিষেবা দিলেও, NCD ব্যবস্থাপনার তুলনায় এর বাজেট অত্যন্ত অপ্রতুল।
- **জেনেরিক ওষুধের দুষ্প্রাপ্যতা:** গ্রামীণ এলাকায় 'জনৌষধি কেন্দ্র' (PMBJP)-এর মাধ্যমে সাশ্রয়ী ওষুধের প্রাপ্যতা এখনও অনিয়মিত।

৪. আর্থিক সুরক্ষার পরেও বড় ধরনের ঝুঁকি

- **বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় (Catastrophic Expenditure):** ভারতের প্রায় ১৭% পরিবার এখনও আয়ের ১০%-এর বেশি চিকিৎসার পিছনে ব্যয় করতে বাধ্য হয়।

- **বৈষম্য:** সমীক্ষা বলছে, সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে মানুষের খরচ কমলেও ক্যান্সার বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো জটিল চিকিৎসায় খরচ প্রায় **দ্বিগুণ** হয়েছে।
- **দারিদ্র্যের ফাঁদ:** চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে ভারতে প্রতি বছর প্রায় **৫৫ মিলিয়ন (৫.৫ কোটি)** মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে (বিশ্বব্যাংক)।

৫. শহর-গ্রাম এবং লিঙ্গ বৈষম্য

- **পরিকাঠামোর অভাব:** গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজনীয় ৩৫,০০০টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের (CHC) বিপরীতে রয়েছে মাত্র ২৫,৭৪৩টি (RHS ২০২২-২৩)।
- **লিঙ্গ বৈষম্য:** চলাচলের সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক প্রথার কারণে মহিলারা সঠিক সময়ে চিকিৎসা পান না। এছাড়া স্ত্রী-রোগ বা মাতৃকালীন চিকিৎসার সুবিধাগুলো মূলত জেলা হাসপাতালকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ নারীরা পিছিয়ে থাকেন।

সরকারি উদ্যোগ: সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাঠামো নির্মাণ

- **আয়ুষ্মান ভারত PMJAY (২০১৮):** এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি অর্থায়িত স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প। এর অধীনে ১২ কোটিরও বেশি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর (Secondary and Tertiary) চিকিৎসার জন্য বছরে পরিবার প্রতি **৫ লক্ষ টাকা** পর্যন্ত স্বাস্থ্য কভারেজ দেওয়া হয়।
- **আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (AAM):** উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে (PHCs) এই মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ, রোগনির্ণয় এবং **টেলি-হেলথ** পরিষেবা সহ ব্যাপক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। ২০২৪ সাল নাগাদ ১.৭২ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্র চালু হয়েছে।
- **PM-JAY-এর সম্প্রসারণ (২০২৪):** আয় নির্বিশেষে **৭০ বছরের বেশি বয়সী** সকল প্রবীণ নাগরিককে এই বীমার আওতায় আনা হয়েছে, যা বৃদ্ধ জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- **জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM):** গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, টিকাদান এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেয়। এটি আশা (ASHA) কর্মী, এএনএম (ANM) এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- **PM আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন (PM-ABHIM):** ৬৪,১৮০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ব্লক, জেলা এবং মহানগর পর্যায়ে **ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিকাঠামো** তৈরি করা, যাতে অতিমারী মোকাবিলা এবং উচ্চতর চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলো প্রস্তুত থাকে।
- **প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিকল্পনা (PMBJP):** ১০,০০০-এর বেশি জনৌষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে **৫০-৯০% কম দামে** জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করা হয়, যা দীর্ঘস্থায়ী রোগীদের চিকিৎসার খরচ (OOPE) বহুগুণ কমিয়ে দেয়।
- **ই-সঞ্জীবনী (eSanjeevani) টেলিমেডিসিন:** এটি ভারতের জাতীয় টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ২০২৪ সাল পর্যন্ত **৩০ কোটির বেশি** মানুষ পরামর্শ নিয়েছেন। এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়া সহজ করে তুলেছে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন: ভারতের জন্য শিক্ষণীয় পাঠ

- **থাইল্যান্ডের ইউনিভার্সাল কভারেজ স্কিম (UCS):** থাইল্যান্ড তাদের সরকারি হাসপাতাল নেটওয়ার্কে প্রচুর বিনিয়োগ করে এবং চিকিৎসার খরচ নির্দিষ্ট করে দিয়ে প্রায় সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে। এর ফলে সেখানে মানুষের পকেট থেকে খরচ (OOPE) ১২%-এর নিচে নেমে এসেছে। ভারতও PMJAY **তালিকাভুক্ত হাসপাতালের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্য কাঠামো** গ্রহণ করতে পারে।
- **ব্রাজিলের সিস্তেমা ইউনিকো ডি সাউদে (SUS):** ব্রাজিলের এই ইউনিফাইড পাবলিক হেলথ সিস্টেমটি করের টাকায় চলে এবং শক্তিশালী প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করে। ভারতের **'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির'** মূলত এই মডেলেরই প্রতিফলন।

- **রুয়ান্ডার কমিউনিটি-বেসড হেলথ ইন্স্যুরেন্স (CBHI):** রুয়ান্ডা স্বাস্থ্য বীমা এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজে লাগিয়ে ৯০%-এর বেশি মানুষের কাছে বীমা সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। ভারতের **আশা (ASHA) নেটওয়ার্কের** ক্ষেত্রে এই মডেলটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ

ক. সরকারি হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ

- ভারতে প্রতি ১,০০০ জন জনসংখ্যায় সরকারি শয্যার সংখ্যা ০.৫৫ থেকে বাড়িয়ে দ্রুত অন্তত **২টিতে** উন্নীত করতে হবে। বিশেষ করে **জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলোর** ওপর জোর দিতে হবে, যাতে তারা উন্নত চিকিৎসার (Tertiary Care) ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সঙ্গে যোগ্য প্রতিযোগিতা করতে পারে।
- PM-ABHIM প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি জেলায় **'ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক'** তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। এটি জরুরি এবং বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনবে।

খ. PMJAY-এর রিইম্বারসমেন্ট সংস্কার এবং বেসরকারি হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণ

- PMJAY-এর আওতায় চিকিৎসার প্যাকেজ মূল্য নিয়মিত সংশোধন করতে হবে যাতে তা চিকিৎসার প্রকৃত খরচের প্রতিফলন ঘটায়। তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলো যাতে রোগীদের কাছ থেকে ডায়াগনস্টিক বা আনুষঙ্গিক পরিষেবার জন্য আলাদা কোনো টাকা নিতে না পারে, তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
- বিমা খাতের IRDAI-এর আদলে একটি নির্দিষ্ট **স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (Health Regulatory Authority)** গঠন করা প্রয়োজন, যা হাসপাতালের বিলিং, চিকিৎসার মান এবং রোগীদের অভিযোগ গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করবে।

গ. অসংক্রামক রোগ (NCD) ব্যবস্থাপনায় AAM নেটওয়ার্কে পর্যাপ্ত অর্থায়ন

- **আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (AAM)** নেটওয়ার্কে অসংক্রামক রোগের (NCD) চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের সুবিধা প্রাথমিক স্তরেই নিশ্চিত করতে হবে, যাতে রোগীদের ব্যয়বহুল হাসপাতালে ভর্তির হার কমানো যায়।
- তামিলনাড়ু মডেল অনুসরণ করে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে **অসংক্রামক রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে** সরবরাহ করলে দরিদ্র মানুষের পকেট থেকে খরচ (OOPE) নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে।

ঘ. দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী গড়ে তোলা

- ভারতে ডাক্তার, নার্স এবং প্যারামেডিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরি। **ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (NMC)** কর্তৃক এমবিবিএস (MBBS) আসন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব মেটাতে পোস্ট-গ্রাজুয়েট (PG) শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে প্রসারিত করতে হবে।
- হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে নিযুক্ত **কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (CHOs)** সংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন করতে হবে, যাতে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রাথমিক চিকিৎসায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন।

ঙ. জনস্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় **জিডিপি-র ২.৫%-এ** উন্নীত করতে হবে এবং পরবর্তী ধাপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশকৃত ৫%-এর লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে হবে।
- স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের নিরিখে রাজ্যগুলোকে **জিএসটি (GST) ভাগাভাগিতে বিশেষ সুবিধা (Incentives)** দেওয়া যেতে পারে, যা রাজ্যস্তরে স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাবে।

চ. প্রযুক্তি এবং তথ্যের শক্তি ব্যবহার

- **আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন (ABDM)**-এর গতি বাড়াতে হবে। ইউনিক হেলথ আইডি এবং ডিজিটাল রেকর্ড তৈরির মাধ্যমে একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে এবং চিকিৎসায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

- ৮০তম রাউন্ডের মতো সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যাদি (যেমন: পকেট থেকে খরচ বা রোগের ধরণ) রাজ্য স্তরের স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে সরাসরি ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

- **ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস** (NSO) পরিচালিত **৮০তম দফার পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা** স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ভারতে **বিমার আওতা বাড়লেও** পরিকাঠামো এবং সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আজও বড় ব্যবধান রয়ে গেছে।
- ভারতকে এখন সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিমা প্রকল্পের অধীনে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং অসংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় পূর্ণ অর্থায়নে মনোনিবেশ করতে হবে। তবেই মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কাছে কেবল একটি 'সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা' নয়, বরং একটি **বাস্তব সত্যে** পরিণত হবে।

Q. India's healthcare challenge is no longer just about financial protection but about ensuring actual access to care. Discuss the key challenges in India's public health system and suggest measures to strengthen public sector hospital capacity. (15 Marks)

2.3.2. ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য: প্রবণতা, মাত্রা এবং নীতিগত উদ্বেগ

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক কিছু নীতিগত পরিবর্তন, যেমন—নতুন **শ্রম বিধি** (Labour Codes) কার্যকর করা এবং **মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন** (MGNREGA)-এর পরিবর্তে **বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫** আনা হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো ভারতে **বৈষম্য**, **শ্রমিক কল্যাণ** এবং **গ্রামীণ সংকট** নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

বৈষম্য কী?

বৈষম্য বলতে অর্থনৈতিক সম্পদ (যেমন—আয়, সম্পদ) এবং জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধার (যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনৈতিক অধিকার) অসম বণ্টনকে বোঝায়। এটি কেবল "কারো কাছে কম থাকা" নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে বিশাল **ব্যবধান** বা ফাঁক থাকে, তাকেই বোঝায়।

বৈষম্যের প্রধান ধরণসমূহ

১. **আয় বৈষম্য** (Income Inequality): ব্যক্তিদের মধ্যে বেতন এবং উপার্জনের অসম বণ্টন। এখানে উচ্চ-আয়ের গোষ্ঠীগুলি নিম্ন-আয়ের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করে।
   - **উদাহরণ:** একজন কর্পোরেট সিইও মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন, অথচ একজন দিনমজুর দিনে মাত্র কয়েকশ টাকা পান।

২. **সম্পদ বৈষম্য** (Wealth Inequality): জমি, বাড়ি, সোনা, শেয়ার এবং ব্যবসার মতো সম্পদের অসম মালিকানা। এর ফলে দেশের অধিকাংশ সম্পদ মাত্র কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত থাকে।
   - **উদাহরণ:** ভারতের অল্প শতাংশ মানুষের হাতে শহরের দামি বাড়ি এবং বিশাল আর্থিক সম্পদ রয়েছে, অন্যদিকে অনেক গ্রামীণ পরিবার আজও ভূমিহীন।

৩. **ভোগ বৈষম্য** (Consumption Inequality): শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে ব্যয় করার ক্ষমতার পার্থক্য।

- **উদাহরণ:** শহরের সচ্ছল পরিবারগুলো দামি বেসরকারি শিক্ষা এবং বিলাসিতার পেছনে প্রচুর খরচ করছে, কিন্তু গরিব পরিবারগুলো পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে।

৪. **সামাজিক বৈষম্য (Social Inequality):** জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, শ্রেণি বা অঞ্চলের ভিত্তিতে সুযোগ এবং সম্পদের অসম ব্যবহার।

- **উদাহরণ:** প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় নারী এবং তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষরা প্রায়ই চাকরি, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন।

বৈষম্য পরিমাপের উপায়

১. **গিনি কোঅফিসিয়েন্ট (Gini Coefficient):** এটি একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা সমাজের আয়, সম্পদ বা ভোগের বৈষম্য পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।

- **গিনি কোঅফিসিয়েন্ট = ০ → পূর্ণ সমতা** (যখন সবার আয় বা সম্পদ সমান হয়)।
- **গিনি কোঅফিসিয়েন্ট = ১ → পূর্ণ বৈষম্য** (যখন একজনের হাতেই সব সম্পদ বা আয় থাকে)।
- **উদাহরণ:** যদি দুটি পরিবারের আয় প্রায় সমান হয়, তবে বৈষম্য কম; কিন্তু যদি একটি পরিবার অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি আয় করে, তবে বৈষম্য বেশি।

২. **মাসিক মাথাপিছু ব্যয় বা MPCE (Monthly Per Capita Expenditure):** একটি পরিবারের প্রতি সদস্যের গড় মাসিক খরচের হিসেবকে **MPCE** বলা হয়। ভারতে ভোগের বৈষম্য বুঝতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

- **সূত্র:** MPCE = পরিবারের মোট মাসিক খরচ ÷ পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা।
- **উদাহরণ:** যদি একটি পরিবারের মাসে ২০,০০০ টাকা খরচ হয় এবং পরিবারে ৫ জন সদস্য থাকে, তবে **MPCE** হবে ৪,০০০ টাকা।

ভারতে বৈষম্য সংক্রান্ত মূল ফলাফল

ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব (২০২৪) এবং **NSSO-এর গৃহস্থালি ভোগ ব্যয় সমীক্ষা (HCES ২০২৩-২৪)**-এর ওপর ভিত্তি করে আপনার নোটের জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিচে দেওয়া হলো:

- **"বিলিয়নেয়ার রাজ"-এর উত্থান:** ২০০০-এর দশকের শুরু থেকে ভারতে বৈষম্য আকাশচুম্বী হয়েছে। ২০২২-২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, জনসংখ্যার **শীর্ষ ১% মানুষের হাতে জাতীয় আয়ের ২২.৬% এবং মোট সম্পদের ৪০.১%** রয়েছে। এই পরিসংখ্যান ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আমলের চেয়েও বেশি।
- **ভোগ বৈষম্য হ্রাস:** সম্পদের তুলনায় ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য (Gini Coefficient) কিছুটা কমেছে। ২০২৩-২৪ সালে এটি কমে **গ্রামীণ এলাকায় ০.২৩৭** এবং **শহরাঞ্চলে ০.২৮৪**-এ দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হলো, সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জমলেও সাধারণ মানুষের কেনাকাটা বা ভোগের ক্ষমতা আগের চেয়ে কিছুটা ছড়িয়েছে।
- **গ্রাম-শহরের ব্যবধান কমে আসা:** গ্রামীণ ও শহুরে ভারতের মধ্যে ভোগের ব্যবধান কমছে। মাসিক মাথাপিছু ব্যয় (MPCE)-এর পার্থক্য ২০১১-১২ সালের ৮৪% থেকে কমে ২০২৩-২৪ সালে **৭০%**-এ নেমে এসেছে। মূলত গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের পেছনে খরচ বাড়ার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।
- **ব্যয়ের ধরণে পরিবর্তন (খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের প্রাধান্য):** প্রথমবারের মতো গ্রামীণ গৃহস্থালির মোট খরচের অর্ধেকেরও কম (**৪৭%**) খাদ্যের পেছনে ব্যয় হচ্ছে। মানুষ এখন যাতায়াত, ইলেকট্রনিক্স পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের পেছনে বেশি খরচ করছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
- **কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রভাব:** সরকারি প্রকল্পগুলোর (যেমন—PMGKY-এর অধীনে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য) ইতিবাচক প্রভাব সবথেকে গরিব স্তরের মানুষের ওপর পড়েছে। বিনামূল্যে পাওয়া সামগ্রীর মূল্য হিসেবে ধরলে দেখা যায়, সবথেকে দরিদ্র ৫-১০% মানুষের ভোগের হার সবথেকে দ্রুত বেড়েছে।

ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণ

১. **দক্ষতা-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (SBTC):** দ্রুত ডিজিটালকরণ এবং AI-এর ব্যবহার উচ্চ-দক্ষ কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, কম দক্ষ কর্মীরা অটোমেশনের কারণে কাজ হারানোর ঝুঁকিতে আছেন বা তাদের বেতন বাড়ছে না।

২. **অপ্রগতিশীল কর ব্যবস্থা ও ফাঁকফোকর:** পরোক্ষ কর (যেমন—GST) গরিবদের ওপর আয়ের অনুপাতে ধনীদের চেয়ে বেশি বোঝা তৈরি করে। এছাড়া অতি-ধনীদের অনেকেই আইনি ফাঁকফোকর ব্যবহার করে কম হারে কর দিয়ে থাকেন।

৩. **পুঁজির ঘনত্ব বনাম শ্রমের স্থবিরতা:** শেয়ার বাজার বা জমির মতো সম্পদ থেকে আসা আয় সাধারণ শ্রমিকের মজুরির তুলনায় অনেক দ্রুত বেড়েছে। এই **"পিকেটি প্রভাব"** নিশ্চিত করে যে, যাদের সম্পদ আছে তারা কেবল শ্রমের ওপর নির্ভরশীলদের চেয়ে দ্রুত ধনী হন।

৪. **অপ্রাতিষ্ঠানিকতা ও চাকরির মেরুকরণ:** ভারতের **৯০% শ্রমিক এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে** কাজ করেন, যেখানে কোনো সামাজিক সুরক্ষা বা ইউনিয়নের ক্ষমতা নেই। এর ফলে দেশে একটি 'দ্বৈত অর্থনীতি' তৈরি হয়েছে যেখানে একদল সুবিধা পাচ্ছে আর অন্যদল পিছিয়ে পড়ছে।

৫. **নারীদের কর্মক্ষেত্রে কম অংশগ্রহণ (FLFP):** সামাজিক বাধার কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র **১৫.৭%**-এর আশেপাশে। এর ফলে কোটি কোটি পরিবার বাড়তি আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা সামগ্রিক আর্থিক উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

৬. **মানবিক পুঁজির কাঠামোগত অভাব:** উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য সমান নয়। ধনী পরিবারের সন্তানরা ভালো সুযোগ পেলেও গরিবরা মানহীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের চক্রে আটকা পড়ে থাকেন।

বৈষম্য কমাতে সরকারের মূল উদ্যোগ

১. **বিকশিত ভারত—G RAM G আইন, ২০২৫:** এটি MGNREGA-এর পরিবর্তে আনা হয়েছে। এখানে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে **১২৫ দিন** করা হয়েছে এবং প্রতিটি যোগ্য গ্রামীণ পরিবারকে এই সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২. **প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PMGKAY) সম্প্রসারণ:** এই খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প **২০২৮ সালের ডিসেম্বর** পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ৮০ কোটির বেশি মানুষকে প্রতি মাসে ৫ কেজি করে বিনামূল্যে চাল/গম দেওয়া হচ্ছে, যা মুদ্রাস্ফীতির বাজারে গরিবদের রক্ষা করছে।

৩. **অপ্রার্থিষ্ঠানিক ও গিগ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা (e-Shram):** ২০২৫-এর শেষ নাগাদ নতুন সামাজিক সুরক্ষা বিধি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে গিগ কর্মীদের (যেমন ডেলিভারি বয়) e-Shram পোর্টালের আওতায় আনা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা ডিজিটাল আইডি (UAN) এবং আয়ুষ্মান ভারতের স্বাস্থ্য সুবিধা পাবেন।

৪. **PMAY ২.০ (শহর ও গ্রামীণ):** ২০২৪-এর শেষে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরও **৩ কোটি নতুন বাড়ি** তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ভূমিহীন ও শহুরে দরিদ্রদের স্থায়ী সম্পদ (বাড়ি) প্রদানের মাধ্যমে এটি সম্পদ বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে।

৫. **জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচী (NSAP) স্যাচুরেশন:** ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে বৃদ্ধ, বিধবা ও দিব্যাঙ্গদের পেনশনের সুবিধা ১০০% মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (DBT) টাকা পাঠানোর ফলে মাঝপথে অর্থ চুরির ভয় থাকছে না।

৬. **প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম (PMJVK):** পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল এবং স্কিল ল্যাব তৈরির মাধ্যমে এই প্রকল্প **আঞ্চলিক বৈষম্য** দূর করতে কাজ করছে।

ভবিষ্যৎ পথ

১. **সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা:** ই-শ্রম পোর্টালের মাধ্যমে সব অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীকে পেনসন ও বিমার আওতায় এনে তাদের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে হবে।

২. **প্রগতিশীল রাজস্ব নীতি:** ধনীদের ওপর সম্পদ কর বা উত্তরাধিকার কর আরোপের বিষয়গুলো ভেবে দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর GST **কমিয়ে** সাধারণ মানুষের ওপর চাপের বোঝা কমাতে হবে।

৩. **সেবামূলক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ:** শিশু ও বৃদ্ধদের যত্নের জন্য সরকারি পরিকাঠামো বাড়ালে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা পারিবারিক আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

৪. **মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব:** কেবল সুযোগ নয়, বরং শিক্ষার 'মান' এবং স্বাস্থ্যের 'ফলাফল'-এর ওপর জোর দিতে হবে যাতে বংশপরম্পরায় চলতে থাকা দারিদ্র্যের চক্র ভাঙা যায়।

৫. **শ্রম-নিবিড় উৎপাদন:** বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো শিল্পে উৎসাহ (PLI ২.০) দিতে হবে যাতে সাধারণ শ্রমিকদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

৬. **গ্রামীণ শিল্পায়ন: বিকশিত ভারত মিশন (গ্রামীণ)**-এর মাধ্যমে গ্রামে কৃষিনির্ভর কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে। এতে গ্রাম থেকে শহরে কাজের জন্য পালানোর প্রবণতা কমবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

উপসংহার

২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে হলে ভারতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কাঠামোগত ব্যবধানগুলো ঘোচাতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায্য কর ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিলে সমৃদ্ধি সবার মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে এবং কোনো নাগরিকই পিছিয়ে থাকবে না।

Q. Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of 'paradox of poverty'. (15 Marks)

***

Scan to attempt more questions...

GENERAL STUDIES 3

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. রুপির অবমূল্যায়ন এবং বিনিয়োগের ওপর এর প্রভাব

ভূমিকা

রুপির অবমূল্যায়ন (Rupee Depreciation) বলতে বোঝায় বাজারে নির্ধারিত বিনিময় হার ব্যবস্থায় প্রধান বিদেশি মুদ্রাগুলোর (মূলত মার্কিন ডলার) তুলনায় ভারতীয় রুপির (INR) মান কমে যাওয়া। ২০২৬ সালে রুপি ব্যাপক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম বাড়ার কারণে সম্প্রতি এটি প্রতি ডলারে **৯৪ টাকার** গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

রুপির অবমূল্যায়নের কারণসমূহ

১. **বৈশ্বিক বা বাহ্যিক কারণসমূহ**

- **ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত:** পশ্চিম এশিয়ায় (ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইরান) উত্তেজনার ফলে বিনিয়োগকারীরা উদীয়মান বাজারের মুদ্রা ত্যাগ করে ডলার এবং সোনার মতো **'সেফ-হেভেন' (নিরাপদ বিনিয়োগ)** সম্পদের দিকে ঝুঁকছেন।
- **খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি:** তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে **১১৫ ডলার** ছাড়িয়ে যাওয়ায় ভারতের আমদানির খরচ বেড়ে গেছে, যার ফলে ডলারের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে।
- **আর্থিক নীতির পার্থক্য:** আরবিআই সুদের হার **৫.২৫%**-এ স্থির রাখলেও, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের উচ্চ সুদের হার বিনিয়োগকারীদের ভারতের বাজার থেকে সরিয়ে আমেরিকার দিকে টেনে নিচ্ছে।
- **ডলারের শক্তি:** বিশ্ববাজারে **ডলার ইনডেক্স** (DXY) শক্তিশালী হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই ডলারের তুলনায় রুপির মান দুর্বল হয়ে পড়ছে।

২. **অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ**

- **FPI বহিঃপ্রবাহ:** বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPI) ভারতের শেয়ার ও ঋণ বাজার থেকে ক্রমাগত বিনিয়োগ তুলে নেওয়ায় রুপির সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে।
- **ক্রমবর্ধমান ক্যাড (CAD):** জ্বালানি ও ইলেকট্রনিক্স আমদানির উচ্চ ব্যয়ের কারণে **চলতি হিসাবের ঘাটতি** (Current Account Deficit) বাড়ছে, যা রুপির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।
- **মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য:** বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলোর তুলনায় ভারতের অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি বেশি হওয়ায় **ক্রয়ক্ষমতার সমতা** (PPP) অনুযায়ী রুপির মান কমে যাচ্ছে।
- **ঋণ পরিশোধ:** ভারতীয় কোম্পানিগুলো তাদের নেওয়া **বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ** (ECBs) পরিশোধ করার জন্য ডলার কেনায় বাজারে ডলারের চাহিদা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

৩. **বাজারের মানসিকতা ও প্রযুক্তিগত কারণ**

- **REER সংশোধন:** রুপির **রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট** (REER) তার গড় মাত্রার (~৯২.৭২) নিচে নেমে আসা ইঙ্গিত দেয় যে, রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে রুপির মান কম রাখা হচ্ছে।
- **ফটকা কারবার** (Speculative Behavior)**:** মুদ্রা বাজারে ব্যবসায়ীরা যখন মনে করেন রুপির মান আরও কমবে, তখন আমদানিকারকরা দ্রুত ডলার কিনে রাখেন এবং রপ্তানিকারকরা ডলার দেশে আনতে দেরি করেন, যা পতনকে আরও ত্বরান্বিত করে।

রুপির অবমূল্যায়নের প্রভাব

মুদ্রার মান এবং বিদেশি পুঁজির মধ্যে সম্পর্কটি চক্রাকার এবং এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ওপর প্রভাব

- **বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (FPI):**
  - **পুঁজি প্রত্যাহার:** রুপির মান কমলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত লাভ কমে যায়। এর ফলে তারা ভারতের শেয়ার ও বন্ড বাজার থেকে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ তুলে নেয়।
  - **মূল্যায়ন ঝুঁকি:** ক্রমাগত অবমূল্যায়ন অর্থনৈতিক অস্থিরতার সংকেত দেয়, ফলে নতুন বিনিয়োগে মন্দা দেখা দেয়।
- **বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI):**
  - **ব্যয় সুবিধা:** দুর্বল রুপি বিদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য ভারতের সম্পদ (জমি, শ্রম ও যন্ত্রপাতি) সস্তা করে দেয়। এটি উৎপাদন খাতে (যেমন PLI স্কিম) নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে।
  - **দীর্ঘমেয়াদী অনিশ্চয়তা:** শুরুতে বিনিয়োগ সস্তা হলেও, মুদ্রার অস্থিরতা ভবিষ্যতে মুনাফা নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

দেশীয় কর্পোরেট বিনিয়োগের ওপর প্রভাব

- **বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ (ECBs):** যেসব ভারতীয় কোম্পানি বিদেশ থেকে ডলার ঋণ নিয়েছে, রুপির মান কমায় তাদের **ঋণ পরিশোধের বোঝা** বেড়ে যায়। এতে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের জন্য হাতে থাকা পুঁজি কমে যায়।
- **আমদানি করা কাঁচামালের খরচ বৃদ্ধি:** ইলেকট্রনিক্স, সার এবং রাসায়নিকের মতো শিল্পগুলো আমদানির ওপর নির্ভরশীল। কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানিগুলোর লাভের অংশ কমে যায় এবং নতুন কারখানা বা পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ (CapEx) ধীর হয়ে পড়ে।
- **রপ্তানি-মুখী খাত: আইটি পরিষেবা, টেক্সটাইল এবং ওষুধ শিল্প** এর ফলে লাভবান হয়। তাদের ডলারের আয় রুপিতে রূপান্তরিত করলে আগের চেয়ে বেশি টাকা পাওয়া যায়, যা ব্যবসা প্রসারে সহায়তা করে।

খুচরো বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ওপর প্রভাব

- **শেয়ার বাজার:** সাধারণত রুপির পতন শেয়ার বাজারের জন্য নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। তবে **রপ্তানি-নির্ভর** কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম বাড়তে পারে।
- **সোনা:** যেহেতু ভারত অধিকাংশ সোনা আমদানি করে, তাই রুপি দুর্বল হলে দেশে সোনার দাম বেড়ে যায়। এর ফলে যাদের আগে থেকে গোল্ড ইটিএফ (Gold ETF) বা বন্ডে বিনিয়োগ আছে, তারা লাভবান হন।
- **আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড:** যারা বিদেশি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, রুপির মান কমায় তাদের **নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV)** বৃদ্ধি পায়, কারণ ডলারের তুলনায় তাদের বিনিয়োগের মান রুপিতে বেশি দেখায়।

রুপির অবমূল্যায়ন রোধে গৃহীত নীতিগত পদক্ষেপসমূহ

১. **আরবিআই (RBI) এর পদক্ষেপ (আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক)**

- **ফরেক্স মার্কেট হস্তক্ষেপ:** রুপির অত্যাধিক অস্থিরতা কমাতে এবং এর পতন রোধ করতে আরবিআই সক্রিয়ভাবে তার **বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার (Forex Reserves)** থেকে ডলার বিক্রি করছে।
- **ডেরিভেটিভ মার্কেটে নিয়ন্ত্রণ:** রুপির ওপর ফাটকা কারবার বা 'শর্টিং' বন্ধ করতে ব্যাংকগুলোর দৈনিক নিট ওপেন কারেন্সি পজিশনের ওপর **১০০ মিলিয়ন ডলারের সীমা** আরোপ করা হয়েছে এবং **নন-ডেলিভারেবল ফরওয়ার্ডস (NDFs)** সীমিত করা হয়েছে।

- **বাণিজ্য ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি:** পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারকদের সহায়তা করতে **রপ্তানি ঋণের মেয়াদ (Tenor) বাড়িয়ে ৪৫০ দিন** করা হয়েছে (৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)।
- **পুঁজি প্রবাহে উৎসাহ প্রদান:** তারল্য বজায় রাখতে **বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ (ECBs)** সংক্রান্ত নিয়ম শিথিল করা হয়েছে এবং বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (FPIs) জন্য সংশোধিত নিয়মগুলো পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. **সরকারের পদক্ষেপ (রাজস্ব ও কাঠামোগত)**

- **আমদানি যৌক্তিকীকরণ:** ডলারের চাহিদা কমাতে সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং প্রতিরক্ষা খাতের মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে **আইএসএম ২.০ (ISM 2.0)** এবং বর্ধিত **পিএলআই (PLI) স্কিম** এর মাধ্যমে **আমদানি বিকল্প (Import Substitution)** ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হচ্ছে।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলোকে খোলা বাজার থেকে ডলার কেনা কমিয়ে **বিশেষ ক্রেডিট সুবিধা** ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তেলের আমদানি বিল কমাতে **ইথানল মিশ্রণের (Ethanol blending)** হার বাড়ানো হয়েছে।
- **রুপির আন্তর্জাতিকীকরণ:** ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং রাশিয়ার মতো দ্বিপাক্ষিক অংশীদারদের সাথে **ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্টের (Vostro accounts)** মাধ্যমে রুপিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সহজ করা হচ্ছে।
- **রাজস্ব শৃঙ্খলা:** উচ্চ-মূল্যের রপ্তানি (যেমন: বায়োফার্মা শক্তি - Biopharma SHAKTI) বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে **চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD)** ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. **স্বল্পমেয়াদী: কৌশলগত স্থিতিশীলতা**

- **পরিমিত হস্তক্ষেপ:** আরবিআই-এর উচিত রুপির পতনকে সরাসরি না থামিয়ে বরং একে 'স্মুদিং' বা মন্থর করা। এতে বড় ধরনের সঙ্কটের জন্য **ফরেক্স রিজার্ভ** সংরক্ষিত থাকবে এবং আতঙ্কিত হয়ে বাজার থেকে বিনিয়োগ তুলে নেওয়া বন্ধ হবে।
- **ডেরিভেটিভ নজরদারি জোরদার:** ২০২৬ সালে এনডিএফ (NDF) মার্কেটের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে বিদেশি বাজার দেশীয় রুপির দাম নির্ধারণ করতে না পারে।
- **বিশেষ সোয়াপ উইন্ডো:** তেল বিপণন সংস্থাগুলোর (OMCs) জন্য একটি ডেডিকেটেড ফরেক্স সোয়াপ উইন্ডো প্রদান করা, যাতে তারা সরাসরি আরবিআই থেকে ডলার পায় এবং বাজারে হঠাৎ করে ডলারের চাপ না বাড়ে।

২. **মধ্যমেয়াদী: বহিরাগত খাতকে শক্তিশালী করা**

- **রুপির আন্তর্জাতিকীকরণ:** ডলারের প্রয়োজনীয়তা কমাতে আরও অনেক দেশের সাথে **স্পেশাল রুপি ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট (SRVA)** দ্রুত কার্যকর করা।
- **পুঁজি প্রবাহের বৈচিত্র্য:** অস্থির এফপিআই (FPI) বা 'হট মানি' থেকে নজর সরিয়ে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)** বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া। এর জন্য নিয়মনীতি সহজ করা এবং **চারটি শ্রম কোড** বাস্তবায়ন করা জরুরি।
- **রপ্তানি সক্ষমতা:** কিছুটা 'অবমূল্যায়িত' রুপির সুযোগ নিয়ে শ্রম-নিবিড় রপ্তানি (যেমন: টেক্সটাইল, চামড়া এবং এমএসএমই পণ্য) বাড়ানো, যাতে আমদানির উচ্চ খরচ পুষিয়ে নেওয়া যায়।

৩. **দীর্ঘমেয়াদী: কাঠামোগত স্থিতিশীলতা**

- **জ্বালানি নির্ভরতা কমানো:** রুপির অস্থিরতার প্রধান কারণ হলো অপরিশোধিত তেল। এটি কমাতে **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন** এবং ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত পূরণ করতে হবে।

- **ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন ২.০:** সেমিকন্ডাক্টর এবং ওষুধের কাঁচামালের (APIs) মতো উচ্চ-মূল্যের আমদানির ক্ষেত্রে কেবল যন্ত্রাংশ জোড়া লাগানো নয় বরং 'গভীর উৎপাদন' বা **ডিপ ম্যানুফ্যাকচারিং**-এ জোর দিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো।
- **স্থানীয় বন্ড মার্কেট শক্তিশালী করা:** ব্লুমবার্গ বা জেপি মর্গানের মতো বৈশ্বিক সূচকে ভারতীয় সরকারি বন্ডকে অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করা, যাতে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি আকৃষ্ট করা যায়।

উপসংহার

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে রুপির এই অবমূল্যায়ন ঠেকাতে কেবল সাময়িক হস্তক্ষেপ নয়, বরং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন। জ্বালানি আমদানি কমিয়ে, রুপির আন্তর্জাতিকীকরণ করে এবং রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত মুদ্রার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী **কৌশলগত অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা** অর্জন করতে পারে।

Q. Currency depreciation acts as a double-edged sword for an emerging economy. Discuss how a weakening Rupee influences India's trade balance, and suggest structural measures beyond RBI intervention to ensure long-term exchange rate stability. (15 Marks)

3.1.2. চরম তাপপ্রবাহ এবং গিগ ইকোনমি: ভারতের নগর শ্রম সহনশীলতার পুনর্ভাবনা

ভূমিকা

- গত এক দশকে ভারতে **তাপপ্রবাহের** (Heatwaves) পৌনঃপুনিকতা, তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। **ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ** (IMD)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই চরম আবহাওয়া এখন অনেক বড় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে এবং বছরের শুরুর দিকেই দেখা দিচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০২২ সালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাপপ্রবাহের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে।
- একই সময়ে, **জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল** (IPCC) সতর্ক করেছে যে, দক্ষিণ এশিয়া চরম **'ওয়েট-বাল্ব' তাপমাত্রার** (Wet-bulb temperatures)—যা তাপ এবং আর্দ্রতার এক বিপজ্জনক সংমিশ্রণ—সম্মুখীন হতে চলেছে। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে বাইরে বা খোলা আকাশের নিচে কাজ করা অত্যন্ত অনিরাপদ হয়ে উঠতে পারে।
- এই পরিস্থিতিতে, ভারত যখন আরও একটি প্রচণ্ড দাবদাহের গ্রীষ্মে প্রবেশ করছে, তখন ডেলিভারি এবং পরিবহন পরিষেবায় নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ **গিগ কর্মীদের** (Gig Workers) ক্রমবর্ধমান সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। প্রথাগত **শ্রম সুরক্ষা** (Labour Protection) ছাড়াই কাজ করা এই কর্মীদের অবস্থা বর্তমানে **জলবায়ু সহনশীলতা** (Climate Resilience), **শ্রম অধিকার** এবং **প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের** ক্ষেত্রে এক গুরুতর প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করছে।

পটভূমি: ভারতের গিগ কর্মীবাহিনী — একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

ক. গিগ কর্মী কারা?

- **"গিগ ইকোনমি" (Gig Economy):** এই শব্দটি এমন একটি শ্রমবাজারকে বোঝায় যা স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে **স্বল্পমেয়াদী চুক্তি, ফ্রিল্যান্স কাজ** এবং **অন-ডিম্যান্ড (চাহিদাভিত্তিক) টাস্ক** দ্বারা চিহ্নিত।
- **গিগ কর্মী: সামাজিক নিরাপত্তা বিধি, ২০২০** (Code on Social Security, 2020) অনুযায়ী, গিগ কর্মী হলেন "এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রথাগত নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের বাইরে কাজ করেন বা কোনো কর্মবিন্যাসে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই কার্যক্রম থেকে উপার্জন করেন।"
  - এর মধ্যে রয়েছেন **খাবার ও মুদি পণ্য সরবরাহকারী** (Delivery Agents), **ই-কমার্স কুরিয়ার, রাইড-হেইলিং চালক** (যেমন ওলা-উবার চালক), **লজিস্টিক হ্যান্ডলার** এবং **অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের** মাধ্যমে কর্মরত ফ্রিল্যান্স পেশাদাররা।

- **প্ল্যাটফর্ম কর্মী** (Platform Workers): এরা গিগ কর্মীদের একটি উপসেট, যারা নির্দিষ্টভাবে **অনলাইন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের** মাধ্যমে কাজে নিযুক্ত থাকেন।
- **অ্যাগ্রিগেটর** (Aggregators): এরা হলো ডিজিটাল মধ্যস্থতাকারী বা বাজার যা পরিষেবার ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে সংযুক্ত করে (যেমন: Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Urban Company)।

খ. সরকারি উদ্যোগ

- **রাজস্থান প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক গিগ কর্মী (নিবন্ধন ও কল্যাণ) আইন, ২০২৩:** রাজস্থান ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে গিগ কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে, যেখানে একটি **কল্যাণ বোর্ড** গঠন এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের **বাধ্যতামূলক নিবন্ধন** নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্ণাটকও একই ধরনের আইনের প্রস্তাব করেছে।

গ. ভারতে গিগ কর্মীবাহিনীর প্রবৃদ্ধি ও পরিধি

- **নীতি আয়োগের ২০২২ সালের রিপোর্ট** ('India's Booming Gig and Platform Economy') **অনুযায়ী:**
  - ২০২০-২১ সালে ভারতে প্রায় **৭.৭ মিলিয়ন** গিগ কর্মী ছিল।
  - ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা **২৩ মিলিয়ন** ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রায় **১২ শতাংশ**।
  - আগামী দশকে অ-কৃষি কর্মীবাহিনীর **৬-৭ শতাংশই** হতে পারে গিগ কর্মী।
- **মোট কর্মীবাহিনীতে অংশ:** ২০২০-২১ সালে ভারতের মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় ১.৫ শতাংশ ছিল গিগ কর্মী, যা ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে **৪.১ শতাংশে** পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
- **বর্তমান কর্মীবাহিনী: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬** (Economic Survey 2025-26) অনুসারে, ভারতের গিগ সেক্টরে কর্মীর সংখ্যা ২০২১ অর্থবর্ষের ৭.৭ মিলিয়ন থেকে ৫৫% বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থবর্ষে প্রায় **১২ মিলিয়নে** দাঁড়িয়েছে।
- **নগর কেন্দ্রিকতা:** গিগ কাজ মূলত **টায়ার-১ এবং টায়ার-২ শহরগুলোতে** (যেমন মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাই) ঘনীভূত, যেখানে প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক ডেলিভারি এবং রাইড-হেইলিং পরিষেবা সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।

ভারতে গিগ কর্মীবাহিনীর গুরুত্ব

গিগ কর্মীরা, বিশেষ করে ডেলিভারি পার্টনার এবং পরিবহন চালকরা ভারতের নগর অর্থনীতির এক **অদৃশ্য মেরুদণ্ড** (Invisible Backbone) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

১. **লাস্ট-মাইল জরুরি পরিষেবা নিশ্চিতকরণ:** তারা খাদ্য, ওষুধ এবং মুদি পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করে শহরের **ভোক্তা চক্রকে** (Consumption Cycles) সচল রাখে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় এই কর্মীবাহিনী একটি **সিস্টেমিক লাইফলাইন** হিসেবে কাজ করেছিল, যখন প্রথাগত ক্ষেত্রগুলো বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা জরুরি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রেখেছিল।

২. **ডিজিটাল অর্থনীতির চালিকাশক্তি:** গিগ ইকোনমি হলো ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর এক দৃশ্যমান প্রতিফলন। Swiggy, Zomato, Blinkit, Amazon, Flipkart, Ola, Uber, **এবং** Porter-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো সম্মিলিতভাবে লক্ষ লক্ষ কর্মীকে সহায়তা প্রদান করে এবং বছরে কোটি কোটি লেনদেন সম্পন্ন করে। এটি একদিকে যেমন **পণ্য ও পরিষেবা কর** (GST) সংগ্রহ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ** (FDI) আকর্ষণ করছে।

৩. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক মূল্য সংযোজন:** এই খাত ভারতের **মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে** (GDP) প্রায় **১.২৫%** অবদান রাখে। লেনদেনের খরচ কমিয়ে এবং কাজের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদানের মাধ্যমে গিগ কাজ মূলত **ই-কমার্স** এবং **কুইক কমার্স** (Q-commerce) শিল্পের দ্রুত প্রসারে জ্বালানি জোগাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) টিকিয়ে রাখতে একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল গিগ কর্মীবাহিনী অপরিহার্য।

৪. **কর্মসংস্থানের গণতন্ত্রীকরণ ও সুরক্ষা কবচ:**

- **সহজ প্রবেশাধিকার:** এটি প্রথম প্রজন্মের শহরমুখী অভিবাসী এবং নিম্ন আয়ের তরুণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ **জীবিকার সেতু** (Livelihood Bridge) হিসেবে কাজ করে, যাদের হয়তো প্রথাগত বা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা ডিগ্রি নেই।
- **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি:** গিগ প্ল্যাটফর্মের কাজের সময়ের নমনীয়তা এমন ব্যক্তিদের আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে যারা নির্দিষ্ট সময়ের চাকরিতে যুক্ত হতে পারেন না—এর মধ্যে রয়েছেন **প্রতিবন্ধী ব্যক্তি** বা যাদের ওপর পরিবারের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে।
- **লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় পথ:** ডেলিভারি কাজে পুরুষের আধিক্য থাকলেও, মহিলারা ডিজিটাল ফ্রিল্যান্সিং, ঘরোয়া মাইক্রো-টাস্ক এবং বিউটি ও ওয়েলনেস প্ল্যাটফর্মে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন, যা সামগ্রিক **নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ** (FLFPR) বৃদ্ধি করছে।

৫. **জলবায়ু ও সংকটকালীন বাফার:** চরম আবহাওয়ার সময়—যেমন তাপপ্রবাহ বা আকস্মিক বন্যা—গিগ কর্মীরা যাতায়াতের শারীরিক ঝুঁকি নিজেদের ওপর গ্রহণ করেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্কতা মেনে ঘরে থাকতে পারেন এবং একই সাথে দেশের অর্থনীতিও স্থবির হয়ে পড়ে না।

৬. **মানব পুঁজির সঠিক ব্যবহার:** তাৎক্ষণিক উপার্জনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে গিগ ইকোনমি **অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব** (Involuntary Unemployment) রোধ করে। এটি কর্মীদের তাদের সময় এবং সম্পদ (যেমন দুই চাকার যানবাহন) কার্যকরভাবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দেয়, যা নগর শ্রমশক্তির সামগ্রিক উৎপাদিকা শক্তিতে অবদান রাখে।

চরম তাপপ্রবাহের সময় ভারতের গিগ কর্মীদের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তার প্রভাব

১. **আয় বা উপার্জনের ওপর ধাক্কা:**

- চরম তাপপ্রবাহের সময় গিগ কর্মীরা সরাসরি **আর্থিক ধাক্কার** (Income Shock) সম্মুখীন হন, কারণ তাদের উপার্জন সম্পূর্ণভাবে কতগুলো ডেলিভারি সম্পন্ন হলো বা কতগুলো ট্রিপ নেওয়া হলো তার ওপর নির্ভর করে।
- বেতনভুক্ত কর্মচারীরা যেমন রিমোট ওয়ার্ক বা সপারিবারিক ছুটির সুবিধা পান, গিগ কর্মীদের ক্ষেত্রে তা হয় না। তাদের সামনে দুটি কঠিন বিকল্প থাকে: হয় কাজ বন্ধ করে **আয় হারানো**, অথবা শরীরের ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া। এটি একটি অত্যন্ত **নিষ্ঠুর সমঝোতা** (Harsh Trade-off)।

২. **পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধির অভাব:**

- ভারতের বর্তমান শ্রম কাঠামোতে গিগ কর্মীদের জন্য তাপ-সংক্রান্ত কোনো **বাধ্যতামূলক বিরতি** (Rest Periods) নেই, কারণ তারা প্রথাগত নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের আওতার বাইরে।
- যদিও বিভিন্ন শহরে **হিট অ্যাকশন প্ল্যান** (Heat Action Plans) এবং অস্থায়ী জলছত্র বা কুলিং সেন্টার খোলা হয়েছে, কিন্তু এগুলো মূলত এক জায়গায় থাকা মানুষের জন্য তৈরি।
- একজন ডেলিভারি কর্মী যিনি দিনে ৩০-৪০টি ট্রিপ করেন, তার পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো কুলিং সেন্টারে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তারা **জনসাধারণের পরিকাঠামোর** (Public Infrastructure) ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন, যা চরম গরমে প্রায়ই অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়।

৩. **অ্যালগরিদমিক চাপ এবং পারফরম্যান্স মেট্রিক্স:**

- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো **অ্যালগরিদমিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** ব্যবহার করে ডেলিভারির গতি এবং গ্রাহক রেটিং ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে। চরম তাপপ্রবাহের সময় এই মেট্রিক্সগুলো কর্মীদের ওপর এক ধরনের **পরোক্ষ চাপ** (Implicit Coercion) তৈরি করে।

- যদি কোনো কর্মী তাপজনিত ক্লান্তির কারণে কাজ ধীর গতিতে করেন বা লগ-অফ করেন, তবে তার রেটিং কমে যাওয়ার বা আইডি **ডিঅ্যাক্টিভেশনের** (Deactivation) ঝুঁকি থাকে। যেহেতু অ্যালগরিদম পরিবেশগত পরিস্থিতি বিবেচনা করে না, তাই এটি অনিরাপদ তাপেও কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

৪. **লিঙ্গ-নির্দিষ্ট সংবেদনশীলতা:**

- নারী গিগ কর্মীদের ওপর দ্বিগুণ বোঝা চাপে। একদিকে চরম তাপের মধ্যে কাজ করা, অন্যদিকে গ্রীষ্মের মাসগুলোতে গৃহস্থালির অবৈতনিক কাজ ও যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব সামলানো। এই **দ্বিমুখী বোঝা** (Dual Burden) তাদের আয় ও কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে।
- এছাড়া, অতিরিক্ত গরমে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ায় নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে, যা তাদের কাজের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।

৫. **সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা:**

- গিগ কর্মীদের কল্যাণের দায়িত্বটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। স্বাস্থ্য দপ্তর শুধু চিকিৎসার দিকটি দেখে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ কেবল সংকটের সময় সাড়া দেয়, আর শ্রম দপ্তর অস্পষ্ট কর্মসংস্থান কাঠামোর কারণে সীমাবদ্ধ। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোও জলবায়ু ঝুঁকি বাদ দিয়ে শুধু **দক্ষতার** (Efficiency) ওপর গুরুত্ব দেয়। ফলে একটি **সমন্বিত সাড়ার** (Coordinated Response) অভাব দেখা যায়।
- অধিকাংশ গিগ কর্মীর ESI **(কর্মচারী রাজ্য বিমা)**, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা নিয়োগকর্তার দেওয়া স্বাস্থ্য বিমা নেই। তাপজনিত অসুস্থতায় বা হাসপাতালে ভর্তি হলে কোনো **ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা** (Compensatory Mechanism) থাকে না।
- ২০২১ সালে চালু হওয়া **ই-শ্রম** (e-Shram) **পোর্টাল** বিপুল সংখ্যক কর্মীকে নথিভুক্ত করলেও, এটি এখনও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য ও আয় সুরক্ষায় রূপান্তরিত হতে পারেনি।

ভবিষ্যতের পথ: একটি জলবায়ু-সহনশীল গিগ ইকোনমি গঠন

১. **তাপ-সংবেদনশীল প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন:**

- **গতিশীল ইনসেন্টিভ:** চরম আবহাওয়ার সময় প্ল্যাটফর্মগুলোর উচিত **'হিট সারচার্জ'** (Heat Surcharges) চালু করা, যা সরাসরি কর্মীদের কাছে **'হ্যাজার্ড পে'** (Hazard Pay) বা ঝুঁকি-ভাতা হিসেবে পৌঁছাবে।
- **অ্যালগরিদম সমন্বয়:** যখন **'হিট ইনডেক্স'** (Heat Index) বা তাপ-সূচক নিরাপদ মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, তখন ডেলিভারির সময়সীমা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিথিল করতে হবে। এর ফলে ধীরগতির পরিষেবার জন্য কোনো জরিমানার ভয় থাকবে না।

২. **নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন:**

- **কুলিং হাব** (Cooling Hubs)**:** উচ্চ-ঘনত্বের ডেলিভারি জোনগুলোতে পৌরসভা ও অ্যাগ্রিগেটরদের যৌথ উদ্যোগে **'জলবায়ু সহনশীল বিশ্রামাগার'** (Climate Resilient Rest Areas) তৈরি করতে হবে, যেখানে পানীয় জল, পাখা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।
- **শীতলকরণের অধিকার** (Right to Cooling)**:** নীতিগতভাবে বাইরের বা খোলা আকাশের নিচে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য 'শীতল পরিবেশ পাওয়ার সুযোগ'-কে একটি মৌলিক শ্রম অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. **নীতিগত ও আইনি সংস্কার:**

- **বাধ্যতামূলক মানদণ্ড:** প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক আউটডোর কাজের জন্য নির্দিষ্ট এবং বাধ্যতামূলক তাপ-সুরক্ষা মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে **'পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের শর্তাবলি** (OSHWC) **কোড'** আপডেট করতে হবে।
- **জলবায়ু-সংযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা:** গিগ কর্মীদের জন্য 'আবহাওয়া-জনিত ক্ষতিপূরণ' বা প্যারামেট্রিক বিমা প্রদান করতে ২০২০ সালের বিধি অনুযায়ী প্রস্তাবিত **'সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল'** (Social Security Fund) ব্যবহার করতে হবে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়:

- **বিভাগীয় সমন্বয়:** কার্যকর তাপ ব্যবস্থাপনার জন্য **শ্রম মন্ত্রক**, **স্বাস্থ্য মন্ত্রক** এবং **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের** মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। তাপপ্রবাহকে কেবল স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে না দেখে একটি **'অর্থনৈতিক বিপর্যয়'** (Economic Disaster) হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি।

উপসংহার

ভারতের গিগ কর্মীরা তার নগর অর্থনীতির একইসাথে **সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং সবচেয়ে অরক্ষিত** (Vulnerable) অংশ। তাপপ্রবাহের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে এই কর্মীবাহিনীর জন্য শ্রম সুরক্ষার অভাব মূলত **জলবায়ু অভিযোজনের** (Climate Adaptation) ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত ব্যর্থতাকে নির্দেশ করে, যা জরুরি ও সমন্বিত নীতিগত পদক্ষেপ দাবি করে।

এই কর্মীদের জন্য প্রকৃত সহনশীলতা মানে কেবল তাপজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করা নয়, বরং তাদের **জীবিকা রক্ষা করাও**। আর এর জন্য ভারতকে তাপপ্রবাহের প্রস্তুতিকে কেবল জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ হিসেবে নয়, বরং **'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের'** (Economic Justice) একটি ইস্যু হিসেবে নতুনভাবে ভাবতে হবে।

Q. Discuss the significance of the gig economy in India's urban growth and analyse how climate change is altering its sustainability. Suggest a way forward. (15 Marks)

3.1.3. খণ্ডিত বিশ্বব্যবস্থায় ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা

প্রেক্ষাপট

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাত এবং **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ** এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভূ-রাজনৈতিক সংকট কীভাবে সরাসরি ভারতের অর্থনীতিকে, বিশেষ করে **জালানির দাম** এবং **সরবরাহ শৃঙ্খলকে** (Supply Chains) প্রভাবিত করে। ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এখন আর কেবল সস্তায় আমদানির বিষয় নয়; এটি এখন **স্থিতিস্থাপকতা**, **উৎস বৈচিত্র্যকরণ** এবং **কৌশলগত প্রস্তুতির** ওপর নির্ভরশীল।

জালানি নিরাপত্তার বিবর্তনশীল ধারণা

- **"সস্তা জ্বালানি" থেকে "মজবুত সুরক্ষা"** (Strong Buffers): জালানি নিরাপত্তা এখন আর কেবল সর্বনিম্ন দাম খোঁজার বিষয় নয়, বরং এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা আকস্মিক **বৈশ্বিক ধাক্কা** সামলে টিকে থাকতে পারে। দেশগুলো এখন সাধারণ বাজার দক্ষতার চেয়ে **আর্থিক নিরাপত্তাকে** বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এর জন্য তারা "বিমা" হিসেবে অতিরিক্ত **জালানি সঞ্চয়** এবং বাড়তি সরবরাহ ক্ষমতা রাখার জন্য বেশি খরচ করতেও প্রস্তুত।
- **উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং "পছন্দ করার ক্ষমতা"** (Power of Choice): প্রকৃত নিরাপত্তা এখন নির্ভর করে একগুচ্ছ বৈচিত্র্যময় সরবরাহকারীর ওপর। এটি কোনো একটি অঞ্চল অস্থির হয়ে পড়লে দ্রুত অন্য উৎসে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেও **রুশ তেল আমদানির** ভারসাম্য রক্ষা করা ভারতের এই **"কৌশলগত নমনীয়তা"** বা পছন্দের ক্ষমতার একটি বড় উদাহরণ।
- **সামুদ্রিক পথের ঝুঁকি** (Fragility of Sea Lanes): অনেক সরবরাহকারী থাকলেও তেলের ভৌত পরিবহন একটি বড় ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে কারণ এটি প্রায়ই **"হরমুজ প্রণালী"র** (Strait of Hormuz) মতো সংকীর্ণ পথ দিয়ে আসে। বিশ্বের ২৫% তেল এই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে, তাই এখন জ্বালানি আমদানির মতোই **নৌ-শক্তির** মাধ্যমে সমুদ্রপথ রক্ষা করা সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

- **নতুন "সবুজ" জ্বালানির দুর্বলতা (Green Vulnerabilities):** নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া তেলের ওপর নির্ভরতা কমায় ঠিকই, কিন্তু এটি **লিথিয়াম** এবং **রেয়ার আর্থ** (Rare Earths) খনিজের ওপর নতুন নির্ভরতা তৈরি করে। এটি একটি নতুন চ্যালেঞ্জ, কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোর প্রক্রিয়াকরণ বর্তমানে একটি মাত্র দেশের (চীন) নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যা ভবিষ্যতে একটি নতুন সংকটের পথ তৈরি করতে পারে।
- **অর্থনীতির ঢাল হিসেবে জ্বালানি:** স্থিতিশীল জ্বালানি সরবরাহ এখন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, যা সরাসরি **মুদ্রাস্ফীতি** এবং **উন্নয়নকে** প্রভাবিত করে। সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার মাধ্যমে একটি দেশ তার নাগরিকদের "আমদানিকৃত" অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে বৈশ্বিক অস্থিরতা যেন দেশের সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত না করে।

বিশ্ব জ্বালানি বাজার: পুরনো ব্যবস্থার পতন

- **পাইপলাইন থেকে সমুদ্রপথের দিকে:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পাইপলাইনের নির্ভরযোগ্যতার ধারণা ভেঙে দিয়েছে এবং বিশ্বকে সমুদ্রপথে পরিবহণযোগ্য LNG-র দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই পরিবর্তন **হরমুজ প্রণালীর** মতো সামুদ্রিক পথগুলোর কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে স্থানীয় সংঘাত এখন বিশ্বব্যাপী তেলের দাম নির্ধারণ করে।
- **সঞ্চয়ের চেয়ে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার:** কম খরচে "প্রয়োজন মতো" জ্বালানি কেনার পুরনো মডেল এখন শেষ। এর জায়গা নিয়েছে **"নিরাপত্তা-প্রথম"** কৌশল। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো এখন জ্বালানিকে একটি **বিমা পলিসি** হিসেবে দেখছে এবং সরবরাহ সংকট মোকাবিলায় বিশাল **কৌশলগত মজুদ** (Strategic Reserves) গড়ে তোলার জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করছে।
- **পছন্দের ক্ষমতা এবং ক্রেতার আধিপত্য:** একটি মাত্র সরবরাহকারীর ওপর দশকের পর দশক ধরে নির্ভরশীল থাকার দিন শেষ। ভারতের মতো বড় আমদানিকারকরা এখন রাশিয়া, আমেরিকা এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে তাদের উৎসকে **বৈচিত্র্যময়** করছে। এই **"অপশনালিটি"** বা বিকল্প বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ক্রেতাদের হাতে শক্তি দিচ্ছে, যাতে তারা ভৌগোলিক অবস্থানের বদলে ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে সরবরাহকারী পরিবর্তন করতে পারে।
- **রাশিয়ান গ্যাসের ওপর ইউরোপের নির্ভরতার অবসান:** সস্তা রুশ গ্যাসের ওপর ইউরোপের নির্ভরতার যুগ (যা একসময় তাদের চাহিদার ৪৫% মেটাতো) স্থায়ীভাবে শেষ হয়ে গেছে। এই পতনের ফলে ইউরোপীয় জ্বালানি ব্যবস্থায় দ্রুত আমূল পরিবর্তন আনতে হয়েছে, যার ফলে গ্যাসের ব্যবহার ২০% কমেছে এবং তারা পুরোপুরি বৈশ্বিক LNG **বাজারের** দিকে ঝুঁকেছে।
- **সবুজ রূপান্তরের নতুন ঝুঁকি:** জালানি বাজারের এই পরিবর্তন এমন এক সময়ে ঘটছে যখন **লিথিয়াম** এবং **রেয়ার আর্থের** মতো খনিজের ওপর নতুন করে নির্ভরতা তৈরি হচ্ছে। বৈশ্বিক ঝুঁকি এখন "মাটি থেকে জ্বালানি তোলা" থেকে সরে গিয়ে **"খনিজ প্রক্রিয়াকরণ নিয়ন্ত্রণ করার"** দিকে যাচ্ছে। এটি সেইসব দেশগুলোর ওপর নতুন ভূ-রাজনৈতিক নির্ভরতা তৈরি করছে যারা ব্যাটারি সরবরাহ শৃঙ্খলে আধিপত্য বিস্তার করে।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তায় সরকারি উদ্যোগ

১. **কৌশলগত এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা**

- **অপারেশন সংকল্প** (Operation Sankalp)**:** হরমুজ প্রণালী এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজগুলোর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ভারতীয় নৌবাহিনী এই অভিযান শুরু করেছে।
- **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ** (SPR) **কর্মসূচি:** সরবরাহ শৃঙ্খলে কোনো বিপর্যয় ঘটলে "জাতীয় বিমা" হিসেবে কাজ করার জন্য ভারত বিশাল ভূগর্ভস্থ তেল মজুদাগার তৈরি করছে। আমদানিনির্ভরতা কমাতে এবং জরুরি অবস্থায় টিকে থাকার দিন সংখ্যা বাড়াতে **বিশাখাপত্তনম, ম্যাঙ্গালুরু এবং পাদুরে** বর্তমান মজুদ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

২. **জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্যকরণ**

- **ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন** (NGHM)**:** ১৯,৭৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মিশনের লক্ষ্য ভারতকে **গ্রিন হাইড্রোজেনের** বিশ্বব্যাপী হাবে পরিণত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৫ MMT উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিতে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় করতে পারে।

- **প্রধানমন্ত্রী জি-ভান যোজনা (PM JI-VAN):** দ্বিতীয় প্রজন্মের (2G) **বায়ো-ইথানল** তৈরির পরিবেশ তৈরি করাই এর লক্ষ্য। কৃষিজ বর্জ্য (যেমন খড়) জ্বালানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে এটি **ইথানল ব্লেন্ডিং প্রোগ্রাম (EBP)**-কে সহায়তা করে এবং আমদানিকৃত তেলের ওপর নির্ভরতা কমায়।
- **পিএম-কুসুম (PM-KUSUM) এবং পিএম সূর্য ঘর:** এই প্রকল্পগুলো কৃষি এবং গৃহস্থালি পর্যায়ে সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে কাজ করে, যাতে জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ কমে এবং সরকারি ভর্তুকির খরচ হ্রাস পায়।

৩. **ভবিষ্যতের প্রযুক্তি সুরক্ষিত করা**

- **ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন (NCMM):** ২০২৫ সালে শুরু হওয়া এই মিশনটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EV) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান দিকগুলো হলো:
  - **দেশীয় অনুসন্ধান:** লিথিয়াম এবং কোবাল্টের মতো খনিজের জন্য ১,২০০টিরও বেশি স্থানকে লক্ষ্য করা হয়েছে।
  - **বিদেশি সম্পদ অর্জন:** KABIL (খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেড)-এর মাধ্যমে ভারত দক্ষিণ আমেরিকার "লিথিয়াম ট্রায়াঙ্গেল" এবং অস্ট্রেলিয়ায় খনিজ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করছে।
  - **পুনর্ব্যবহার প্রণোদনা:** ই-বর্জ্য এবং পুরনো ব্যাটারি থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পুনরুদ্ধারের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

৪. **ভূ-রাজনীতি এবং কূটনীতি**

- **ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (ISA):** ভারতের নেতৃত্বে একটি বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম, যা বিশেষ করে রৌদ্রোজ্জ্বল দেশগুলোতে সৌরশক্তির বিস্তার ঘটায় এবং জীবাশ্ম জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমায়।
- **গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স (GBA):** বায়োফুয়েলের ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময় এটি চালু করা হয়েছিল, যা জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা এবং বৈচিত্র্য আনবে।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জসমূহ

- **অত্যধিক আমদানি নির্ভরতা:** ভারত কাঠামোগতভাবে এখনও দুর্বল, কারণ আমাদের অপরিশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৯০% আমদানি করতে হয়। এটি বৈশ্বিক অশান্তির সাথে সরাসরি ভারতের **মুদ্রাস্ফীতি** এবং **জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে** যুক্ত করে।
- **ভৌগোলিক এবং সামুদ্রিক বাধা:** সরবরাহকারী পরিবর্তন করলেও **"চোকপয়েন্ট"** বা সংকীর্ণ সামুদ্রিক পথের সমস্যা মেটে না। ভারতের আমদানির প্রায় ৪৫% এখনও **হরমুজ প্রণালী** দিয়ে আসে। এই পথে উত্তেজনার কারণে 'অপারেশন সংকল্প'-এর মতো ব্যয়বহুল সামরিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।
- **প্রক্রিয়াকরণের একচেটিয়া আধিপত্য:** সবুজ জ্বালানির দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো লিথিয়াম এবং কোবাল্টের মতো খনিজের ওপর নতুন নির্ভরতা। বর্তমানে চীন এই খনিজগুলোর ৯০%-এর বেশি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। ভারত তার প্রয়োজনীয় ব্যাটারি-গ্রেড খনিজের মাত্র ৫% প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে, যা তেল-নির্ভরতা থেকে সরে এসে খনিজ-নির্ভরতার ঝুঁকি তৈরি করে।
- **কৌশলগত মজুদের অপর্যাপ্ততা:** জাপানের মতো দেশগুলোর (২৫৪ দিনের মজুদ) তুলনায় ভারতের **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR)** এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। বর্তমান মজুদ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী বৈশ্বিক সরবরাহ সংকট মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।
- **জ্বালানি রূপান্তরের দ্বিধা (Paradox):** সৌরশক্তি এবং ইভি-র ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদে তেলের চাহিদা কমালেও, স্বল্পমেয়াদে নতুন পরিকাঠামো তৈরির খরচ অনেক বেশি। খনিজ সরবরাহ নিশ্চিত না করে দ্রুত রূপান্তর ঘটলে উপকারের বদলে জ্বালানি বাজার আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

ভবিষ্যতের পথ

- **কৌশলগত মজুদের (SPR) বিস্তার:** জাপানের মতো স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করতে ভারতকে দ্রুত ভূগর্ভস্থ তেলের মজুদ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এটি সরবরাহ সংকটের সময় সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে।

- **খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল নিশ্চিত করা:** চীনের ওপর নির্ভরতা এড়াতে ভারতকে KABIL-এর মাধ্যমে **"খনিজ কূটনীতি"** জোরদার করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরেও খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে তোলা জরুরি।
- **সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা ও কূটনীতি শক্তিশালী করা:** হরমুজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পথগুলো রক্ষা করতে ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। 'অপারেশন সংকল্প'-এর মতো উদ্যোগগুলোকে আঞ্চলিক অংশীদারদের সাথে একটি বৃহত্তর কাঠামোর অধীনে আনতে হবে।
- **কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং চাহিদা ব্যবস্থাপনা:** ইভি-র জন্য FAME-II প্রকল্প দ্রুত কার্যকর করে তেলের তীব্রতা কমাতে হবে। গ্রিন হাইড্রোজেন এবং বায়োফুয়েল উৎসাহিত করলে শিল্পখাত তেলের দামের ওঠানামা থেকে মুক্তি পাবে।
- **বাজারের শক্তি ব্যবহার করা:** ভারত তেলের চাহিদার একটি বড় কেন্দ্র হওয়ায়, আমদানির ক্ষেত্রে আরও ভালো শর্ত ও ডিসকাউন্ট নিশ্চিত করতে দরকষাকষির ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

ভারতকে সাময়িক কৌশলগত পদক্ষেপের বদলে **কাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতার** দিকে এগোতে হবে। খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করে এবং কৌশলগত মজুদ বাড়িয়ে ভারত তার অর্থনীতিকে ভূ-রাজনৈতিক ধাক্কা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এটি একটি **টেকসই এবং স্বনির্ভর** জ্বালানি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।

Q. "Energy security in the 21st century is no longer limited to access to oil, but includes resilience, diversification and supply-chain security." Discuss in the context of India's changing geopolitical environment. (15 Marks)

3.1.4. মূলধন ফ্লাইট ও টাকার সংকট: ভারতের বৈদেশিক খাত চাপের মুখে

প্রেক্ষাপট

- ২০২৬ সালে ভারতের **বৈদেশিক খাত** (External Sector) উল্লেখযোগ্য চাপের মধ্যে রয়েছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির মান **৯৫-এর ঘর অতিক্রম করেছে**।
- মাত্র দুই মাসের মধ্যে ভারতের **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ** (Foreign Exchange Reserves) ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস পেয়ে আনুমানিক ৬৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- অপরিশোধিত তেল (Crude oil) এবং সোনা আমদানির খরচ আকাশছোঁয়া হওয়ার কারণে **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট (CAD) বা চলতি হিসাবের ঘাটতি** (একটি দেশ মোট যে পরিমাণ পণ্য ও পরিষেবা আমদানি বনাম রপ্তানি করে, তার মূল্যের পার্থক্য) ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।
- সরকার নাগরিকদের সোনার মতো অ-অপরিহার্য কেনাকাটা কমাতে, বিদেশ ভ্রমণ সংকুচিত করতে এবং জ্বালানি সাশ্রয় করার আহ্বান জানিয়েছে। যদিও এটি পরিস্থিতির গুরুত্বের একটি স্পষ্ট সংকেত, তবে যেকোনো নীতিগত আলোচনার জন্য এর **মূল কারণ** (Root causes), **ঝুঁকি** (Risks) এবং **প্রকৃত সমাধান** (Real solutions) বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বৈদেশিক চাপের কারণগুলি বোঝা

১. অপরিশোধিত তেল আমদানি বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষ করছে

- ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের (Crude oil) প্রায় **৮৯ শতাংশ আমদানি** করে। পশ্চিম এশিয়া সংকটের কারণে বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে, বিশেষ করে **হরমোজ প্রণালী** (Strait of Hormuz - একটি সংকীর্ণ সমুদ্রপথ যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল পরিবাহিত হয়)-র মাধ্যমে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রতি ব্যারেল **১০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে**।

- অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ১ ডলার বৃদ্ধির ফলে ভারতের বার্ষিক আমদানি বিল প্রায় **১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি (OMCs) বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় **৩০,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি** বহন করছে, কারণ খুচরা জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে; যা সরকারি অর্থব্যবস্থার ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করছে।
- ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়ার মতো আমদানিকৃত কৃষি উপকরণের খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে প্রতি টন **৯৩৫ মার্কিন ডলারে** পৌঁছেছে। এটি একটি কঠিন নীতিগত দ্বিধা তৈরি করেছে: এই বাড়তি খরচ কৃষকদের ওপর চাপালে **খাদ্য মূল্যস্ফীতি (Food inflation)**-র ঝুঁকি থাকে, আর সরকার নিজে এই খরচ বহন করলে **রাজস্ব ঘাটতি (Fiscal deficit)**-র লক্ষ্যমাত্রা লঙ্ঘিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে—যার কোনো সহজ মধ্যপন্থা নেই।

২. **রেকর্ড সোনা আমদানি সরাসরি বাণিজ্য ঘাটতিকে প্রসারিত করছে**

- চীনের পর ভারত বিশ্বের **দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনার ভোক্তা**। ভারতীয় পরিবারগুলিতে হাজার হাজার টন অব্যবহৃত সোনা গচ্ছিত থাকা সত্ত্বেও, নতুন আমদানির চাহিদা অত্যন্ত শক্তিশালী রয়েছে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সোনা আমদানির বিল রেকর্ড **৭১.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে** পৌঁছেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ৩৫ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ভারতের মোট আমদানি বিলের প্রায় **৯ শতাংশ** এখন সোনার দখলে।
- হিসাব অনুযায়ী, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) তার বৈদেশিক রিজার্ভ কৌশলের অংশ হিসেবে যে সোনা কেনে, তার তুলনায় পারিবারিক সোনা আমদানি দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় না বা কোনো রপ্তানি আয় তৈরি করে না। এটি কেবল রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রুপিকে ডলারে পরিণত করে, **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট (CAD) বা চলতি হিসাবের ঘাটতি** বৃদ্ধি করে এবং রুপির ওপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

৩. **উচ্চ বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যয় ঐচ্ছিক বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষ করছে**

- **লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিম (LRS)**-এর অধীনে ভারতীয় বাসিন্দারা শিক্ষা, ভ্রমণ এবং বিনিয়োগের মতো উদ্দেশ্যে প্রতি অর্থবর্ষে **২৫০,০০০ মার্কিন ডলার** পর্যন্ত বিদেশে পাঠাতে পারেন। তবে, ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ১১ মাসে LRS-এর মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে যাওয়া মোট অর্থের **৫০ শতাংশেরও বেশি** খরচ হয়েছে বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশী ইভেন্টগুলির পেছনে।
- ঐচ্ছিক খরচের উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বাইরে চলে যাওয়া **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (Foreign exchange reserves)**-এর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে, এমন এক সময়ে যখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার (Macroeconomic stability) জন্য প্রতিটি ডলার বাঁচানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান উদ্বেগ: টেপার ট্যান্ট্রাম বোঝা এবং মূলধন পাচার কেন দ্বিগুণ উদ্বেগজনক

ভারতের বৈদেশিক খাতের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগ কেবল বর্তমানে যা ঘটছে তা-ই নয়, বরং ভবিষ্যতে বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সুদের হার বৃদ্ধি করলে কী ঘটতে পারে তা নিয়েও।

A. **আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে মূলধন প্রবাহ (Capital Flows) যেভাবে কাজ করে:**

- ভারতের মতো **উদীয়মান বাজার অর্থনীতিগুলি (Emerging market economies)** সাধারণত উন্নত অর্থনীতির তুলনায় বিনিয়োগে উচ্চ রিটার্ন বা মুনাফা অফার করে, তবে এর সাথে মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং মূল্যস্ফীতির মতো উচ্চ ঝুঁকিও জড়িত থাকে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত ভারতীয় সম্পদের রিটার্নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশের সম্পদের রিটার্নের তুলনা করেন।
- যদি বিদেশি সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তবে ভারতীয় সম্পদ ধারণ করার আপেক্ষিক আকর্ষণ কমে যায়। তখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় সম্পদ বিক্রি করে তাদের অর্থ নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (Repatriate), যার জন্য রুপিকে ডলারে রূপান্তর করতে হয়। ডলারের এই অতিরিক্ত চাহিদা রুপিকে আরও দুর্বল করে তোলে।

B. **২০১৩ সালের টেপার ট্যান্ট্রাম (Taper Tantrum of 2013):**

- এই ঝুঁকির একটি ক্লাসিক উদাহরণ দেখা গিয়েছিল ২০১৩ সালে। ২০০৮ সালের মহামন্দার (Great Recession) পর, ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে এনেছিল (যাকে **Zero lower bound** বলা হয়) এবং অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বাড়াতে বিপুল পরিমাণে সরকারি বন্ড ক্রয় করছিল (যা **Quantitative Easing - QE** বা পরিমাণগত সহজীকরণ নামে পরিচিত)।
- যখন ফেডারেল রিজার্ভ প্রকৃতপক্ষে সুদের হার না বাড়িয়ে কেবল এই কর্মসূচিটি বন্ধ করার একটি সম্ভাব্য ইঙ্গিত দেয়, তখন ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধির সামান্য প্রত্যাশাই ভারতের মতো উদীয়মান বাজার অর্থনীতিগুলি থেকে হঠাৎ এবং বিপুল পরিমাণে মূলধন প্রত্যাহারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিই **'টেপার ট্যান্ট্রাম' (Taper Tantrum)** নামে পরিচিত।

C. **২০১৩ সালের তুলনায় ২০২৬ সালে ভারতের পরিস্থিতি কেন বেশি আশঙ্কাজনক:**

- ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ এবং ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে সুদের হার ৩.৭৫ শতাংশে ধরে রেখেছে এবং তা বৃদ্ধির কোনো আনুষ্ঠানিক ইঙ্গিত দেয়নি। তা সত্ত্বেও, ভারত থেকে ইতিমধ্যেই মূলধন চলে যাচ্ছে (**Capital flight**) এবং রুপির মান কমছে; যার অর্থ বিনিয়োগকারীরা কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই ভবিষ্যৎ সুদের হার বৃদ্ধির পূর্বাভাস পেয়ে আগেই পদক্ষেপ নিয়েছে। উন্নত অর্থনীতিগুলি যদি শেষ পর্যন্ত তেল-জনিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার বাড়ায়, তবে ভারতের বৈদেশিক দুর্বলতা তীব্রতর হবে এবং এর মোকাবিলা করার জন্য ভারতের আর্থিক ও মুদ্রানীতিগত সুযোগ (Fiscal and monetary room) থাকবে খুবই সীমিত।
- সেই মুহূর্তে রুপিকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র উপলব্ধ উপায় হবে দেশীয় সুদের হার বৃদ্ধি করা (যা দেশীয় বিনিয়োগকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে) অথবা **মূলধন নিয়ন্ত্রণ (Capital controls)** আরোপ করা (যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং একটি উন্মুক্ত অর্থনীতি হিসেবে ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে পারে)।

ভারত কেন অর্থনৈতিক মিতব্যয়িতার আহ্বান জানাচ্ছে: সরকারের প্রতিক্রিয়া

সরকার নাগরিকদের সোনা কেনা, বিদেশ ভ্রমণ এবং জ্বালানির ব্যবহার কমানোর যে আহ্বান জানিয়েছে, তা হলো একটি **চাহিদা-ভিত্তিক হস্তক্ষেপ (Demand-side intervention)**। এর অর্থ হলো, কোনো আনুষ্ঠানিক নীতিগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে বরং মানুষের ব্যয়ের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বহির্গমন হ্রাস করার চেষ্টা করা। এই আহ্বানের প্রতিটি উপাদানের একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে:

- **সোনা কেনা কমানো:** এটি আমদানি অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত ডলারের চাহিদাকে সরাসরি হ্রাস করে, যা **চলতি হিসাবের ঘাটতি (Current Account Deficit - CAD)** এবং রুপির ওপর তৈরি হওয়া চাপকে লাঘব করে। সম্পূরক পদক্ষেপ হিসেবে সরকার সোনার ওপর উচ্চ **আমদানি শুল্ক (Import duties)** আরোপ করেছে।
- **ওয়ার্ক ফ্রম হোম, কারপুলিং এবং ভার্চুয়াল মিটিংয়ের প্রচার:** এটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি না করেই পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার হ্রাস করে। এর ফলে যে **আর্থিক সাশ্রয় (Fiscal savings)** তৈরি হবে, তা কৃষি এবং আসন্ন খরিফ বপন মৌসুমের জন্য অপরিহার্য সার ও জ্বালানি আমদানি সুরক্ষিত করতে পুনর্নির্দেশিত করা যেতে পারে।
- **বিদেশ ভ্রমণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে উৎসাহিত করা:** এটি অর্থকে ভারতীয় অর্থনীতির ভেতরেই ধরে রাখে, স্থানীয় ব্যবসাগুলিকে সহায়তা করে এবং সেই বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে যা অন্যথায় **লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিম (Liberalised Remittance Scheme - LRS)**-এর অধীনে দেশ থেকে বাইরে চলে যেত।

অতিরিক্ত আমদানি নিষেধাজ্ঞার প্রভাব

- **ম্যানুফ্যাকচারিং এবং রপ্তানি ব্যাহত হওয়া:** ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাত **গ্লোবাল ভ্যালু চেইন (Global Value Chains - GVCs)**-এর সাথে গভীরভাবে জড়িত এবং এটি আমদানিকৃত মূলধনী পণ্য, সেমিকন্ডাক্টর ও বিশেষায়িত কাঁচামালের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

- বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর জন্য এই আমদানিগুলিকে সীমিত করলে তা শিল্প উৎপাদন, রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং **জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধিকে** সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ওষুধ (Pharmaceuticals), ইলেকট্রনিক্স এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের মতো প্রধান রপ্তানি খাতগুলি আমদানিকৃত উপকরণের ওপর নির্ভর করে।

- **সংরক্ষণবাদের ফাঁদ (Protectionism Trap):** উচ্চ শুল্ক প্রাচীর বা আগ্রাসী **আমদানি প্রতিস্থাপন (Import substitution)** স্বল্পমেয়াদে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে পারলেও, দীর্ঘমেয়াদে তা অদক্ষতা তৈরি করে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এটি আপাতবিরোধীভাবে ভারতের রপ্তানি আয়কে দুর্বল করে, যা কিনা টেকসই বৈদেশিক মুদ্রা আসার মূল উৎস।
- **বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আতঙ্কিত করা:** বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী (FIIs) এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রত্যক্ষ **বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment - FDI)** প্রবাহের জন্য একটি পূর্বাভাসযোগ্য এবং উন্মুক্ত ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট (মূলধনী হিসাব) ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ভারত যদি অতিরিক্ত কঠোর বা নিষেধাজ্ঞা-প্রবণ হয়ে উঠছে বলে মনে হয়, তবে বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় সম্পদে উচ্চতর **কান্ট্রি রিস্ক প্রিমিয়াম (Country risk premium)** যুক্ত করবে; যা মূলধন বহির্গমন হ্রাস করার পরিবর্তে আরও বাড়িয়ে দেবে।

ভবিষ্যতের পথ: সংকট ব্যবস্থাপনা থেকে কাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতা

- **গোল্ড মনিটাইজেশন স্কিম (GMS)-এর সংস্কার:** ভারতীয় পরিবারগুলিতে হাজার হাজার টন অব্যবহৃত সোনা গচ্ছিত রয়েছে। একটি সু-উদ্বুদ্ধ এবং স্বচ্ছ GMS এই সোনাকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, যা শুল্কের মতো কঠোর হাতিয়ার দিয়ে চাহিদা দমন না করেই নতুন সোনা আমদানির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেবে।
- **টেকসই ফরেক্স কৌশল হিসেবে রপ্তানি বৃদ্ধি:** ক্রমবর্ধমান চলতি হিসাবের ঘাটতি মোকাবিলার সবচেয়ে টেকসই সমাধান হলো আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (Production Linked Incentive - PLI) প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ, ব্যবসা করার পরিবেশ সহজ করা এবং অস্থির FII প্রবাহের চেয়ে স্থিতিশীল FDI আকর্ষণ করা দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করবে।
- **জ্বালানি রূপান্তর ত্বরান্বিত করা:** আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভারতের নির্ভরতা কমাতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে হরমোজ প্রণালীর অস্থিরতা থেকে মুক্ত করতে ইলেকট্রিক ভেহিকল (EVs), **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন (National Green Hydrogen Mission)** এবং থোরিয়াম-ভিত্তিক পারমাণবিক শক্তির সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি **কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা (Structural necessities)**।
- **আরবিআই (RBI)-এর সুপরিকল্পিত মুদ্রানীতি:** রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে অবশ্যই কৌশলগতভাবে রিজার্ভ ব্যবহার করে বিনিময় হারের অস্থিরতা বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি যদি শেষ পর্যন্ত সুদের হার বাড়ায়, তবে ভারতকে দেশীয় সুদের হারে পরিমিত সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করতে হতে পারে, যাতে **সুদের হারের ব্যবধান (Interest rate differential)** বজায় থাকে—যা ভারতকে বিদেশি মূলধনের কাছে আকর্ষণীয় করে রাখে।

উপসংহার

- আকাশছোঁয়া আমদানি বিল, মূলধন পাচার এবং রুপির অবমূল্যায়নের কারণে ২০২৬ সালে ভারতের বৈদেশিক খাতের যে চাপ তৈরি হয়েছে, তা কোনো সাময়িক বিঘ্ন নয়।
- স্থায়ী স্থিতিশীলতার জন্য ভারতকে সংকটের সময়ে চাহিদা সংকোচনের নীতির ঊর্ধ্বে উঠে জ্বালানি, রপ্তানি এবং আর্থিক খাতগুলিতে **কাঠামোগত সংস্কারের (Structural reforms)** দিকে এগিয়ে যেতে হবে; যাতে অর্থনীতি বহিরাগত ধাক্কার সামনে চিরকাল দুর্বল না থেকে প্রকৃতপক্ষে **স্থিতিস্থাপক (Resilient)** হয়ে উঠতে পারে।

Q. India's present external sector stress reflects deeper structural vulnerabilities rather than a temporary global shock. Examine. 15 Marks

3.1.5. প্রবৃদ্ধি থেকে উৎপাদনশীলতা: ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর পথে ভারতের যাত্রা

ভূমিকা

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত **৬.৫% প্রকৃত জিডিপি** (Real GDP) **প্রবৃদ্ধি** অর্জন করেছে, যা শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি এবং ধারাবাহিক রাজস্ব একত্রীকরণের (Fiscal consolidation) ওপর ভিত্তি করে ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলোর অন্যতম করে তুলেছে।
- **২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা** (Economic Survey) হাইলাইট করেছে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমানভাবে উৎপাদনশীলতা-চালিত রূপান্তরের ওপর নির্ভর করবে। এই রূপান্তর প্রবৃদ্ধির তিনটি প্রধান ইঞ্জিন— **শ্রম** (Labour), **মূলধন** (Capital) এবং **মোট ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি** (Total Factor Productivity - TFP) দ্বারা চালিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, কেবল পরিষেবা খাতের (Services sector) ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ভারতের বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যার জন্য বড় আকারে কর্মসংস্থান তৈরি করতে বা ব্যাপক ভিত্তিক কাঠামোগত রূপান্তর বজায় রাখতে সক্ষম নয়।
- সুতরাং, ২০৪৭ সালের মধ্যে **'বিকশিত ভারত'** (Viksit Bharat)-এর স্বপ্ন সফল করতে হলে কেবল উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর্যায় থেকে বেরিয়ে এসে **দক্ষ এবং উৎপাদনশীল প্রবৃদ্ধি** নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্তমূলক উত্তরণ প্রয়োজন, যেখানে **উৎপাদন খাত** (Manufacturing) হবে মূল স্তম্ভ।

উৎপাদন শিল্প: ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় ভূমিকা এবং এর অনুপস্থিত যোগসূত্র

A. জাতীয় উন্নয়নে উৎপাদন শিল্পের ভূমিকা

- **শিল্পসমূহের মধ্যে যোগসূত্র** (Bridge Between Sectors): প্রতিটি সফল উন্নয়নের ইতিহাসে—বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং চীনের মতো পূর্ব এশীয় অর্থনীতিগুলোতে—**উৎপাদন শিল্প** নিম্ন-উৎপাদনশীল কৃষি এবং উচ্চ-উৎপাদনশীল আধুনিক শিল্পের মধ্যে একটি **গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র** (Critical bridge) হিসেবে কাজ করেছে, যা একটি মসৃণ ও ব্যাপক ভিত্তিক **কাঠামোগত রূপান্তর** (Structural transformation) নিশ্চিত করেছে।
- **বড় আকারে কর্মসংস্থান** (Employment at Scale): উৎপাদন শিল্প বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে শুষে নিতে সক্ষম, এমনকি যাদের উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদেরও স্থিতিশীল এবং **আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান** (Formal employment) প্রদানে এটি অনন্য—যা কেবল পরিষেবা শিল্প (Services sector) ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী বড় আকারে অর্জন করতে পারে না।
- **অর্থনৈতিক সমীক্ষার অবস্থান: ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা** স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, ভারতের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে এবং বড় আকারে কর্মসংস্থান তৈরিতে উৎপাদন শিল্প কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন শিল্পকে আরও বড় এবং আরও উৎপাদনশীল করার প্রয়োজনীয়তাকে এটি পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

B. ভারতের উৎপাদন শিল্পের ব্যবধান: কেন এই শিল্প পিছিয়ে রয়েছে?

- **উৎপাদন-চালিত নয়, বরং পরিষেবা-চালিত:** ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রধানত **পরিষেবা-চালিত** (Services-driven)। পরিষেবা শিল্প ভালো ফল করলেও, বিশাল কর্মীবাহিনীকে শুষে নিতে বা পুরো অর্থনীতিতে ব্যাপক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উৎপাদন শিল্প যথেষ্ট প্রসারিত হয়নি।
- **কৃষিতে আটকে পড়া শ্রমশক্তি:** দুর্বল উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ফলে ভারতের শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ এখনও নিম্ন-উৎপাদনশীল **কৃষিতে** (Agriculture) আটকে আছে। তারা আরও উৎপাদনশীল এবং উন্নত বেতনের শিল্পে স্থানান্তরিত হতে পারছে না—যা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

- **প্রতিষ্ঠান কাঠামোয় মধ্যম সারির অভাব (Missing Middle):** ভারতের উৎপাদন শিল্পে হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও নিম্ন-উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান রয়েছে, নয়তো বড় প্রতিষ্ঠান; কিন্তু বড় হওয়ার সক্ষমতা সম্পন্ন **মধ্যম সারির প্রতিষ্ঠানের (Mid-sized firms)** সংখ্যা অত্যন্ত কম। বিপরীতে, পূর্ব এশীয় দেশগুলো শক্তিশালী মধ্যম ও বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল যা রপ্তানি ও শিল্প প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ভারতের এই **'নিখোঁজ মধ্যম' (Missing middle)** একটি প্রধান কাঠামোগত দুর্বলতা।
- **পরিকাঠামো সত্ত্বেও দক্ষতার অভাব:** সাম্প্রতিক সময়ে পরিকাঠামোতে (Infrastructure) বড় ধরনের বিনিয়োগ সত্ত্বেও উৎপাদন শিল্পে দক্ষতার অভাব রয়ে গেছে। এর অর্থ হলো বিনিয়োগ করা মূলধনের রিটার্ন সম্ভাবনার চেয়ে কম। এই সমস্যাটি কেবল হার্ডওয়্যারের নয়, বরং প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হয় তার সাথে জড়িত।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

A. দুর্বল ব্যবসায়িক গতিশীলতা এবং সৃজনশীল ধ্বংসের সমস্যা

- **সৃজনশীল ধ্বংস (Creative Destruction):** অর্থনীতিবিদরা 'সৃজনশীল ধ্বংস'কে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেন যেখানে নতুন ও আরও দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো পুরনো ও কম উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের জায়গা দখল করে নেয়—ফলে মূলধন ও শ্রম আরও ভালো কাজের জন্য উন্মুক্ত হয়। আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এটিই প্রধান ইঞ্জিন।
- **ধীরগতির পরিবর্তন:** ভারতে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীর। অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘকাল টিকে থাকে, অন্যদিকে উৎপাদনশীল নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজনীয় **ঋণ (Credit)**, ভূমি এবং শ্রম পেতে লড়াই করে—যা সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীলতাকে কমিয়ে দেয়।

B. জম্বি ফার্ম (Zombie Firms): অর্থনীতির ওপর একটি স্থায়ী বোঝা

- **জম্বি ফার্ম:** জম্বি ফার্ম হলো এমন কোম্পানি যারা অর্থনৈতিকভাবে আর লাভজনক নয়—তারা এমনকি তাদের ঋণের সুদ দেওয়ার মতো আয়ও করতে পারে না—তবুও তারা টিকে থাকে। এগুলো প্রকৃত ব্যবসায়িক সাফল্যের পরিবর্তে ব্যাংকের ঋণ বা **নিয়ন্ত্রণমূলক ছাড়ের (Regulatory forbearance)** মাধ্যমে বেঁচে থাকে।
- **সমস্যার ব্যাপকতা:** ২০২৫ সালের একটি গবেষণা পত্র (Zombie Firms in Emerging Markets) অনুসারে, যদিও মোট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় জম্বি ফার্মের সংখ্যা কম, কিন্তু তারা মোট ঋণ ও সম্পদের একটি বিশাল অংশ দখল করে রাখে—যার অর্থ অর্থনীতির সম্পদের একটি বড় অংশ **অনুৎপাদনশীল খাতে (Unproductive use)** আটকে আছে।
- **উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের সুযোগ নষ্ট করা (Crowding Out):** ঋণ, শ্রম এবং মূলধন দখল করে রাখার মাধ্যমে জম্বি ফার্মগুলো সেই উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর পথ রোধ করে যারা প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারত। এটি সরাসরি ভারতের উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যকে ব্যাহত করে।
- **ধীর এবং স্থায়ী অবনতি:** গবেষণায় দেখা গেছে, জম্বি হওয়া কোনো আকস্মিক সংকট নয়, বরং একটি ধীর ও স্থায়ী অবনতি। কোনো প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে জম্বি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার অনেক আগেই এর আর্থিক পতন শুরু হয়।
- **ব্যাংক ঋণের নেতিবাচক প্রভাব:** গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব প্রতিষ্ঠান মূলত ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন পায়, তাদের জম্বি হওয়ার প্রবণতা বেশি। এটি ভারতের ব্যাংক-নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত দুর্বলতা নির্দেশ করে।

C. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা যা অদক্ষ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে

- **লোকসান স্বীকারে অনিচ্ছা:** ভারতের আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোগুলো ঐতিহাসিকভাবে সংকটাপন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করার পরিবর্তে সেগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে। এর কারণ হলো ব্যাংকগুলোর **খেলাপি ঋণ (Bad loans)** স্বীকার করতে অনিচ্ছা এবং দেউলিয়া প্রক্রিয়া নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।
- **দেউলিয়া প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা (Insolvency Bottlenecks): দেউলিয়া ও ঋণশোধ অক্ষমতা আইন, ২০১৬ (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)** একটি যুগান্তকারী সংস্কার হলেও, এটি এখনও ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালে (NCLT) সক্ষমতার অভাব এবং দীর্ঘসূত্রতার সম্মুখীন হচ্ছে।

- **অনমনীয় ফ্যাক্টর মার্কেট:** ভূমি, শ্রম এবং মূলধন বাজারের অদক্ষতা উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে।

উৎপাদন শিল্প ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগসমূহ

- **উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা স্কিম** (Production Linked Incentive - PLI Scheme)**:** ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ এবং অটোমোবাইলসহ ১৪টি প্রধান শিল্পে বড় আকারের উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে এবং ভারতকে **গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে** (Global value chains) যুক্ত করতে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- **পিএম গতিশক্তি** (PM GatiShakti) **— ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান:** এটি একটি মাল্টি-মোডাল পরিকাঠামো সংযোগ পরিকল্পনা যা লজিস্টিক খরচ কমাতে এবং পণ্যের চলাচল সহজ করে উৎপাদন শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে।
- **জাতীয় লজিস্টিক নীতি** (National Logistics Policy)**, ২০২২:** ২০৩০ সালের মধ্যে লজিস্টিক খরচ জিডিপির ১৪-১৬% থেকে কমিয়ে ৮%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
- **দেউলিয়া ও ঋণশোধ অক্ষমতা আইন** (IBC)**, ২০১৬:** এটি অলাভজনক ব্যবসার বিদায় এবং তাদের সম্পদ উৎপাদনশীল কাজে পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ দেয়।
- **শ্রম কোড সংস্কার** (Labour Code Reforms)**:** ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে ৪টি **শ্রম কোড** (Labour Codes)-এ একীভূত করা হয়েছে যাতে নিয়মকানুন সহজ হয় এবং উৎপাদন শিল্পে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
- **মেক ইন ইন্ডিয়া এবং এমএসএমই** (MSME) **সংস্কার:** ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় হতে সহায়তা করার জন্য **সহজ ব্যবসা** (Ease of doing business), জামানতবিহীন ঋণ এবং আনুষ্ঠানিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা-চালিত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের পথ

- **গ্লোবাল ভ্যালু চেইন** (GVC) **একীভূতকরণ গভীর করা:** বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের একটি বড় অংশ দখল করতে ভারতকে ইলেকট্রনিক্স, রাসায়নিক এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের মতো উচ্চ-প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা কমাতে হবে। এছাড়া বাণিজ্য সহজীকরণ উন্নত করার মাধ্যমে নিজেকে একটি নির্ভরযোগ্য **উৎপাদন অংশীদার** (Manufacturing partner) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- **উৎপাদন শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন** (R&D) **বৃদ্ধি:** শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গবেষণা, প্রযুক্তি গ্রহণ এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এটি উৎপাদন শিল্পে ধারাবাহিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।
- **দেউলিয়া কাঠামোর** (Insolvency Framework) **শক্তিশালীকরণ:** ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের (NCLT) সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিষ্পত্তির সময়সীমা হ্রাস এবং পাওনাদারদের অধিকার উন্নত করতে হবে। এটি **জম্বি ফার্মের** (Zombie firms) দ্রুত বিদায় এবং উৎপাদনশীল কাজে সম্পদের দ্রুত পুনঃবণ্টন নিশ্চিত করবে।
- **অর্থায়নকে ইকুইটির** (Equity) **দিকে স্থানান্তরিত করা:** গভীর মূলধন বাজার, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেম এবং অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। এটি ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে, জম্বি ফার্ম তৈরির ঝুঁকি হ্রাস করবে এবং ব্যবসায়িক খাতের সামগ্রিক **স্থিতিস্থাপকতা** (Resilience) উন্নত করবে।
- **ঋণ বণ্টনের সংস্কার:** ব্যাংকগুলোতে কঠোর 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' (EWS) এবং আগাম **খেলাপি ঋণ** (NPA) শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে ঋণের প্রবাহ কমিয়ে উৎপাদনশীল এন্টারপ্রাইজগুলোর দিকে ঋণের দিক পরিবর্তন করবে।
- **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং শ্রম কোড বাস্তবায়ন:** নিয়মকানুন পালনের বোঝা হ্রাস করা এবং চারটি **শ্রম কোড** (Labour Codes) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা ছাড়াই বড় হতে, পুনর্গঠন করতে এবং বাজারের অবস্থার সাথে সাড়া দিতে সাহায্য করবে।

উপসংহার

২০৪৭ সালের মধ্যে **'বিকশিত ভারত'** (Viksit Bharat)-এর স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ভারতকে কেবল উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভর না করে টেকসই **উৎপাদনশীলতা-চালিত উন্নয়নের** (Productivity-led development) দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী উৎপাদন শিল্প, সম্পদের দক্ষ বণ্টন এবং গভীর **কাঠামোগত সংস্কার** (Structural reforms); যা উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় হতে সাহায্য করবে এবং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহজে বিদায় নেওয়ার সুযোগ দেবে।

Q. Why has India's manufacturing sector not emerged as a strong engine of productivity growth and labour absorption despite rapid economic expansion? Discuss with suitable measures. (15 Marks)

3.1.6. ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস রিজার্ভ: জ্বালানি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

দীর্ঘ চার বছর পর সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জ্বালানি খাতে ভারতের **কাঠামোগত দুর্বলতা** বা খামতিকে সবার সামনে নিয়ে এসেছে। অপরিশোধিত তেলের ক্রমবর্ধমান দাম, টাকার অবমূল্যায়ন (দাম কমে যাওয়া), মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর টান—ভারতের **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ** (SPR) এবং গ্যাস সঞ্চয় পরিকাঠামোর অপর্যাপ্ততাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR) কী?

কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPRs) হলো অপরিশোধিত তেলের এমন এক বিশাল ভাণ্ডার, যা কোনো দেশ আকস্মিক সরবরাহ ঘাটতি, ভূ-রাজনৈতিক সংকট বা অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবিলা করার জন্য জমা করে রাখে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **উদ্দেশ্য:** হঠাৎ তেলের সরবরাহে টান পড়লে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করা, অভ্যন্তরীণ বাজারে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা।
- **সংরক্ষণ পদ্ধতি:** তেলের বাষ্পীভবন রোধ করতে, অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমাতে এবং যেকোনো বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাধারণত এই তেল মাটির নিচে বিশাল **লবণের গুহা** (salt caverns) বা **পাথুরে গুহায়** (rock caverns) সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়।
- **বৈশ্বিক মানদণ্ড:** আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (IEA)-র নিয়ম অনুযায়ী, সদস্য দেশগুলিকে কমপক্ষে **৯০ দিনের** নেট তেল আমদানির সমপরিমাণ জরুরি তেল মজুত রাখতে হয়।
- **মালিকানা:** এটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং অর্থায়নকৃত। বেসরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক মজুতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ভারতের বর্তমান পেট্রোলিয়াম রিজার্ভের পরিস্থিতি

১. **ধারণক্ষমতা এবং কতদিনের জোগান**

- **নির্দিষ্ট কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ** (SPR) **ক্ষমতা: ৫.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন** (MMT) (প্রায় ৩৯ মিলিয়ন ব্যারেল)।
- **বিশুদ্ধ SPR জোগান:** এটি সম্পূর্ণ ক্ষমতায় থাকলে ভারতের প্রায় **৯.৫ দিনের** নেট অপরিশোধিত তেল আমদানির চাহিদা মেটাতে পারে। (বর্তমানে এটি ধারণক্ষমতার প্রায় **৬৪%** পূর্ণ রয়েছে)।
- **মোট জাতীয় জোগান:** সব মিলিয়ে **৭৪ দিনের** সঞ্চয় ক্ষমতা রয়েছে (যার মধ্যে ৯.৫ দিনের সরকারি SPR এবং তেল বিপণন সংস্থাগুলির কাছে থাকা ৬৪.৫ দিনের বাণিজ্যিক/রিমাইনারি মজুত অন্তর্ভুক্ত)।

২. **পরিকাঠামোগত অবস্থান**

ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস লিমিটেড (ISPRL) দ্বারা পরিচালিত এই রিজার্ভগুলি দুটি ধাপে মাটির নিচের পাথুরে গুহায় তৈরি করা হয়েছে:

প্রথম ধাপ (সম্পূর্ণ সচল)

- **বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ:** ১.৩৩ MMT
- **ম্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক:** ১.৫০ MMT *(সংযুক্ত আরব আমিরাতের **ADNOC** সংস্থার সাথে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব অন্তর্ভুক্ত)*
- **পাদুর, কর্ণাটক:** ২.৫০ MMT

দ্বিতীয় ধাপ (উন্নয়নশীল / উচ্চ অগ্রাধিকার যুক্ত)

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের অধীনে আরও **৬.৫ MMT** ধারণক্ষমতা বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা ভারতের নিজস্ব SPR জোগানকে প্রায় ২২ দিনে নিয়ে যাবে:

- **চণ্ডীখোল, ওড়িশা:** ৪.০ MMT
- **পাদুর, কর্ণাটক (দ্বিতীয় ধাপ):** ২.৫ MMT

৩. **গ্যাস এবং অন্যান্য হাইড্রোকার্বন বাফার**

- **এলএনজি (LNG - প্রাকৃতিক গ্যাস):** এর জন্য ভারতের কোনো নির্দিষ্ট ভূগর্ভস্থ কৌশলগত সঞ্চয় ব্যবস্থা নেই। বাণিজ্যিক রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনালগুলিতে একটি ভাসমান **১০% বাফার নীতি** বা বাধ্যতামূলক নিয়মের ওপর এটি নির্ভর করে, যা প্রায় **৬০ দিনের** ব্যবহারিক সুবিধা দেয়।
- **এলপিজি (LPG):** এটি অভ্যন্তরীণ রোলিং স্টক এবং সাম্প্রতিক উৎপাদন বৃদ্ধির (প্রতিদিন ৫৪,০০০ টন) মাধ্যমে বজায় রাখা হয়, যা দৈনিক ৮০,০০০০ টনের জাতীয় চাহিদার বিপরীতে **৪৫ দিনের** ব্যাকআপ বা বাফার দেয়।

ভারত কেন ঝুঁকিপূর্ণ?

- **অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা:** ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের ৮৫%-এর বেশি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৫০% আমদানি করে। ফলে বৈশ্বিক সরবরাহে সামান্য বিঘ্ন ঘটলেই দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।
- **অত্যন্ত কম কৌশলগত বাফার:** ভারতের নিজস্ব SPR-এ মাত্র ১০ দিনেরও কম সময়ের অপরিশোধিত তেল মজুত থাকে, যা আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (IEA) নির্দেশিত ৯০ দিনের বৈশ্বিক মানদণ্ডের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।
- **কৌশলগত গ্যাস সঞ্চয় ব্যবস্থার অভাব:** ভারতে এলএনজি (LNG) এবং এলপিজি (LPG)-র জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূগর্ভস্থ কৌশলগত রিজার্ভ নেই। ফলে কৃষি (সার উৎপাদন) এবং গৃহস্থালির মতো জরুরি খাতগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের চড়া দামের মুখে সরাসরি অরক্ষিত হয়ে পড়ে।
- **আর্থিক এবং মুদ্রার দুর্বলতা:** বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত শেষ হয়ে যায়, **ভারতীয় টাকা** দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেশে মারাত্মক ধরনের আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।
- **ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব:** বিশাল কোনো কৌশলগত জ্বালানি ভাণ্ডার না থাকায়, ভারতকে নিরবচ্ছিন্ন এবং সস্তায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সবসময় জটিল বৈশ্বিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলির মুখোমুখি হয়ে পথ চলতে হয়।

আন্তর্জাতিক তুলনা

দেশ	SPR ধারণক্ষমতা	প্রধান বৈশিষ্ট্য
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States)	**~৭১৪ মিলিয়ন ব্যারেল**	১৯৭৩ সালের তেল সংকটের পর এটি তৈরি করা হয়।
চীন (China)	**~৯০০ মিলিয়ন ব্যারেল**	বিশাল আকারে কৌশলগত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।
ভারত (India)	**~৩৯ মিলিয়ন ব্যারেল**	রিজার্ভ বা সঞ্চয় ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

ভারতের জন্য কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR) ব্যবস্থার কৌশলগত প্রভাব

- **সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা (Macroeconomic Insulation):** একটি শক্তিশালী SPR ব্যবস্থা বিশ্ববাজারের তেলের ধাক্কা থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করে। এটি **ভারতীয় টাকা**-র বড় পতন রোধ করে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখে।
- **ভূ-রাজনৈতিক শক্তি এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Geopolitical Lever and Strategic Autonomy):** বিশাল জ্বালানি মজুত ভারতকে বাইরের কূটনৈতিক চাপ ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রতিরোধ করার শক্তি দেয়, যার ফলে ভারত স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে জ্বালানি চুক্তি করার স্বাধীনতা পায়।
- **জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি (National Security and Defence Readiness):** জরুরি পরিস্থিতিতে জ্বালানির নিশ্চিত জোগান থাকলে সামুদ্রিক অবরোধ বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও দেশের সামরিক অভিযান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিকাঠামো সম্পূর্ণ সচল থাকে।
- **আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ (Fiscal Stability and Deficit Control):** বিশ্ববাজারে তেলের দাম যখন আকাশছোঁয়া থাকে, তখন এই রিজার্ভ থেকে তেল ব্যবহার করলে তেল কোম্পানিগুলির লোকসান কমে। এটি সরকারকে হঠাৎ বড় ধরনের **আর্থিক ঘাটতি**-র মুখে পড়া থেকে বাঁচায়।
- **সরবরাহ শৃঙ্খল এবং খাদ্য নিরাপত্তা (Supply Chain and Food Security):** রিজার্ভের পরিধি বাড়িয়ে এর মধ্যে এলএনজি (LNG) গ্যাস যুক্ত করলে সার কারখানাগুলিতে কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন জোগান নিশ্চিত হয়, যা সরাসরি ভারতের কৃষি উৎপাদন ও **খাদ্য নিরাপত্তা**-কে রক্ষা করে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **পিপিপি (PPP) এবং বাণিজ্যিকীকরণের দিকে রূপান্তর:** দ্বিতীয় ধাপের সম্প্রসারণে (চণ্ডীখোল এবং পদুর) একটি বাণিজ্যিক ও কৌশলগত **পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)** মডেল ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদেশি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে স্টোরেজ বা গুদাম লিজ দেওয়া হচ্ছে, তবে সংকটের সময়ে তেলের ওপর ভারতের সার্বভৌম প্রথম অধিকার (Sovereign first right) বজায় থাকবে।
- **আন্তর্জাতিক জ্বালানি কূটনীতি:** ভারতের গুহায় (যেমন ম্যাঙ্গালোর) সরাসরি বিদেশি তেল মজুত রাখার জন্য ভারত বৈশ্বিক তেল জায়ান্ট—যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ADNOC-এর সাথে চুক্তি করেছে। এর ফলে কোনো খরচ ছাড়াই ভারত একটি বাড়তি জরুরি জ্বালানি ভাণ্ডার পাচ্ছে।
- **প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য বাধ্যতামূলক ভাসমান বাফার ব্যবস্থা:** ভূগর্ভস্থ সঞ্চয় ব্যবস্থার অভাব মেটাতে সরকার একটি নিয়ম চালু করেছে, যেখানে দেশের এলএনজি (LNG) টার্মিনালগুলিকে তাদের কাছে আসা মোট গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট **১০% বাফার** অংশ সবসময় রাষ্ট্রের জরুরি ব্যবহারের জন্য মজুত রাখতে হয়।

ভারতের নিজস্ব SPR তৈরি এবং পরিচালনায় যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে

- **বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ (High Capital Investment):** মাটির নিচে বিশাল গুহা তৈরি করা এবং সেগুলিকে লক্ষ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল দিয়ে পূর্ণ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক বড় অঙ্কের **প্রাথমিক আর্থিক বিনিয়োগ**-এর প্রয়োজন হয়।
- **ভূতাত্ত্বিক এবং জমি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা:** উপযুক্ত ভূতাত্ত্বিক পরিকাঠামো, যেমন লাইনিং ছাড়া পাথুরে গুহা বা লবণের স্তূপ (salt domes) খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যাপক ভৌগোলিক ম্যাপিং এবং জটিল **জমি অধিগ্রহণ** প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।
- **ধীরগতির পরিকাঠামো বাস্তবায়ন:** ভারতের SPR কর্মসূচির দ্বিতীয় ধাপটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, পিপিপি (PPP) মডেলে রূপান্তর এবং দীর্ঘ নির্মাণ মেয়াদের কারণে বেশ কিছুটা বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছে।
- **তেলের গুণগত অবক্ষয় এবং ব্যয়বহুল ব্যবস্থাপনা:** দীর্ঘ সময় ধরে মাটির নিচে অপরিশোধিত তেল জমিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত নজরদারি ও উচ্চ পরিচালন ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। তেলের গুণগত মান যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর বাণিজ্যিক **সাইক্লিং** (তেল বের করা ও নতুন তেল ঢোকানো) করতে হয়।

- **বেসরকারি খাতের আগ্রহের অভাব:** কঠোর সরকারি নিয়মকানুন এবং কৌশলগত পরিকাঠামোয় আর্থিক লাভের হার কম হওয়ার কারণে এই রিজার্ভগুলি তৈরি ও পরিচালনার কাজে বিদেশি তেল কোম্পানি বা বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা বেশ কঠিন।

আগামী দিনের করণীয়

- **দ্বিতীয় ধাপের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করা:** চণ্ডীখোল এবং পদুরে পরিকল্পিত দ্বিতীয় ধাপের গুহাগুলির কাজ ভারতের দ্রুত শেষ করা উচিত, যাতে দেশের কৌশলগত সঞ্চয় ক্ষমতা আরও **৬.৫ MMT** বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমান সুরক্ষাকবচ দ্বিগুণ হয়।
- **কৌশলগত গ্যাস সঞ্চয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা:** আন্তর্জাতিক বাজারের আকস্মিক উত্থান-পতন থেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সার ও গৃহস্থালির রান্নার গ্যাস খাতকে রক্ষা করতে সরকারের উচিত এলএনজি (LNG) এবং এলপিজি (LPG)-র জন্য নির্দিষ্ট **ভূগর্ভস্থ সঞ্চয়াগার** তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- **বাণিজ্যিকীকরণ এবং পিপিপি মডেলের সঠিক ব্যবহার:** ভারতের উচিত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলিকে নমনীয় বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়া, যাতে তারা ভারতের গুহাগুলিতে তেল মজুত রাখতে উৎসাহিত হয়, তবে সংকটের সময়ে সেই তেল ব্যবহারের প্রথম অধিকার ভারতেরই থাকবে।
- **লবণের গুহা সঞ্চয় প্রযুক্তির (Salt Cavern Storage) সন্ধান:** পাথুরে গুহার তুলনায় লবণের গুহায় তেল মজুত করা অনেক সাশ্রয়ী, দ্রুত এবং সহজ। রাজস্থানের মতো অঞ্চলগুলিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতের **সংরক্ষণ ক্ষমতা** ব্যাপকভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
- **উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি নিশ্চিত করা:** শারীরিক সঞ্চয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি ভারতকে সক্রিয় জ্বালানি কূটনীতি চালাতে হবে। বিশ্ববাজারের যেকোনো পরিস্থিতিতে তেলের জোগান ঠিক রাখতে দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ চুক্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে তেল আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

উন্নত প্রযুক্তি এবং সুদৃঢ় বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারতের SPR নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ দেশের **অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা** নিশ্চিত করবে। এটি ভারতের জ্বালানি খাতের দুর্বলতাকে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনে রূপান্তরিত করবে এবং ভবিষ্যতে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শক্তি জোগাবে।

Q. Discuss how inadequate strategic petroleum and LNG reserves increase India's vulnerability to global geopolitical and economic shocks. Suggest measures to strengthen India's long-term energy security architecture. (15 Marks)

3.1.7. ভারতের ইভি (EV) রূপান্তর এবং পাওয়ার গ্রিডের চ্যালেঞ্জ

প্রেক্ষাপট

হরমুজ প্রণালীতে (Strait of Hormuz) উত্তেজনার ফলে অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে **বৈদ্যুতিক যানবাহন** (EVs) বা ইভি-র দিকে রূপান্তরের বিষয়টি আবার নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তবে আসল বড় চ্যালেঞ্জটি কিন্তু শুধুমাত্র ইভি গাড়ি ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আসল চ্যালেঞ্জ হলো এমন একটি **পাওয়ার গ্রিড** বা বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক তৈরি করা যা গণপরিবহন ব্যবস্থার এই বিশাল বিদ্যুতায়নের চাপ সামলাতে পারে।

ভারতের ইভি রূপান্তরের বর্তমান পরিস্থিতি

- ভারতে বর্তমানে প্রায় **৪২০ মিলিয়ন (৪২ কোটি) নথিভুক্ত যানবাহন** রয়েছে।
- **মোট বিক্রি:** বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ **২.৫৫ মিলিয়ন (২৫.৫ লক্ষ) ইউনিটের** একটি বড় মাইলফলক অতিক্রম করেছে, যা বছরে **২৫% শক্তিশালী বৃদ্ধি (YoY Growth)** নির্দেশ করে।
- **সামগ্রিক প্রসার:** ভারতের মোট নথিভুক্ত যানবাহনের মধ্যে ইভি-র পরিমাণ এখন **৮.৬৪%** (যা আগের অর্থবর্ষে ৭.৭% ছিল)।
- **লক্ষ্য বনাম বাস্তবতা:** এই অগ্রগতির গতি ঠিকঠাক থাকলেও, ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারের **৩০% ইভি প্রসারের** যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য রয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে।

একটি "দ্বিতীয় পাওয়ার সিস্টেমের" হিসাব-নিকাশ

- **বিশাল পরিধি:** ভারতে প্রায় ৪২ কোটি নথিভুক্ত যানবাহন রয়েছে। এই সমস্ত গাড়িকে সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়িত করতে প্রতি বছর **৯০০ টিডব্লিউএইচ (TWh) থেকে ১,১০০ টিডব্লিউএইচ** অতিরিক্ত বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে।
- **২০৪৭ সালের লক্ষ্য:** ২০৪৭ সালের মধ্যে যদি মাঝারি মানের **৫০% গাড়িও ইভিতে রূপান্তর** করা সম্ভব হয়, তাহলেও প্রায় **৫০০ টিডব্লিউএইচ** অতিরিক্ত বিদ্যুৎ লাগবে। এটি ভারতের বর্তমান বার্ষিক মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় **এক-তৃতীয়াংশের (১/৩)** সমান।
- **দুই চাকার গাড়ির মায়া বা বিভ্রান্তি:** ৩০৯ মিলিয়ন (৩০.৯ কোটি) বৈদ্যুতিক দুই চাকার গাড়ি (যা সবচেয়ে বড় গাড়ির বিভাগ) সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হলেও বছরে মাত্র **৫৫ থেকে ৭৫ টিডব্লিউএইচ** বিদ্যুৎ খরচ করবে। এটি সম্পূর্ণ রূপান্তরের পর মোট প্রত্যাশিত ইভি বিদ্যুৎ চাহিদার **৭% এরও কম**।
  - *সহজ কথায়:* দুই চাকার গাড়ির রাজনৈতিক দৃশ্যমানতা যত বেশি, গ্রিডের ওপর এদের আসল প্রভাব কিন্তু ততটাই কম।

মালবাহী গাড়ি: আসল কঠিন কাজ

মালবাহী এবং পণ্য পরিবহনের গাড়িগুলি মোট নথিভুক্ত যানবাহনের **মাত্র ২%**, কিন্তু এরাই ইভি-র সিংহভাগ বিদ্যুতের চাহিদা তৈরি করবে।

- একটি মাত্র **ভারী মালবাহী গাড়ি (Heavy Goods Vehicle - HGV)** থেকে যে পরিমাণ দূষণ ছড়ায়, তা প্রায় **২৫টি যাত্রীবাহী গাড়ির** সমান। তাই রাস্তা বিদ্যুতায়ন করার আসল অর্থ হলো দেশের **সরবরাহ শৃঙ্খল (supply chain) বিদ্যুতায়ন** করা।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **পিএম ই-ড্রাইভ স্কিম (PM E-DRIVE Scheme):** এটি পুরনো ফেম (FAME) পরিকাঠামোকে প্রতিস্থাপন করেছে। এই স্কিমে **১০,৯০০ কোটি টাকার** বাজেট রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক দুই চাকার গাড়ি, তিন চাকার গাড়ি, ই-অ্যাম্বুলেন্স এবং ই-ট্রাকের জন্য সরাসরি আর্থিক ছাড় বা ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।
- **অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল (ACC)-এর জন্য পিএলআই স্কিম:** ব্যাটারির জন্য বিদেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে দেশে **৫০ গিগাওয়াট আওয়ার (GWh)** ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক ব্যাটারি সেল উৎপাদন কারখানা তৈরির উদ্দেশ্যে এই আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে।
- **অটোমোবাইল এবং অটো উপাদানের জন্য পিএলআই স্কিম:** উচ্চ প্রযুক্তির বৈদ্যুতিক যানবাহনের যন্ত্রাংশ দেশীয় স্তরে তৈরি নিশ্চিত করতে স্থানীয় উৎপাদকদের নগদ অর্থ সহায়তার মাধ্যমে **পরিচ্ছন্ন শক্তি সরবরাহ শৃঙ্খলকে** শক্তিশালী করাই এর লক্ষ্য।
- **জিএসটি এবং কর ছাড়:** ক্রেতাদের আর্থিক বোঝা কমাতে ইভি-র ওপর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (GST) কমিয়ে মাত্র **৫%** করা হয়েছে (যেখানে জ্বালানি চালিত প্রথাগত গাড়ির ওপর ২৮% পর্যন্ত কর নেওয়া হয়)।
- **হাইওয়ে চার্জিং নির্দেশিকা:** ঘনবসতিপূর্ণ শহরের কেন্দ্রস্থল এবং **ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (পণ্য পরিবহনের বিশেষ পথ)** জুড়ে মোট **৭২,৩০০টি পাবলিক ফাস্ট চার্জার** স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্তরের এই পরিকাঠামো নির্মাণে অর্থায়ন করা হচ্ছে।

প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং গ্রিডের দুর্বলতা

- **তাৎক্ষণিক সর্বোচ্চ চাহিদা এবং গ্রিডের অস্থিরতা:** গ্রিডের ওপর চাপ বার্ষিক মোট ব্যবহারের কারণে পড়ে না, বরং পড়ে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের সর্বোচ্চ চাহিদার বা **তাৎক্ষণিক লোডের (Instantaneous Demand)** কারণে। কোটি কোটি গাড়ি যদি একই সাথে **সন্ধ্যা ৭টার পিক আওয়ারে (সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারের সময়)** চার্জ করা শুরু করে, তবে গ্রিডে হঠাৎ কয়েকশো গিগাবাইট অতিরিক্ত লোড যুক্ত হবে। এর ফলে গ্রিড ভেঙে পড়া, বিদ্যুৎ বিপর্যয় এবং সাধারণ গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের দাম একলাফে অনেক বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **উৎসের শক্তির মিশ্রণ বা "কয়লার ফাঁদ" (The Coal Trap):** ইভি-র জন্য প্রয়োজনীয় এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ যদি মূলত **কয়লা** পুড়িয়েই তৈরি করা হয়, তবে ভারত কেবল খনিজ তেলের নির্ভরতা (উপসাগরীয় দেশ) কমিয়ে কয়লার নির্ভরতায় (অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া) জড়িয়ে পড়বে। এতে কার্বন নির্গমন কমবে না। যে বিদ্যুৎ দিয়ে গাড়ি চলছে, সেই বিদ্যুৎ যদি জ্বালানি তেলের চেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন না হয়, তবে বিদ্যুতায়নের মূল যুক্তিটাই খাটে না।
- **বণ্টন এবং আর্থিক বাধা:** মালবাহী ডিপোগুলিতে হাই-টেনশন (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন) বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য গাড়ি পরিচালনাকারীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিগুলি (Discoms) ইতিমধ্যেই বিশাল **পুঞ্জীভূত আর্থিক ক্ষতির** মুখে রয়েছে এবং স্থানীয় স্তরে বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য তাদের কাছে প্রয়োজনীয় বাজেট নেই।
- **ভবিষ্যতের ই-বর্জ্য সংকট:** কোটি কোটি ইভি ব্যাটারি একসময় তাদের আয়ুষ্কাল শেষ করবে। এই বিশাল পরিমাণের ব্যাটারি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনর্ব্যবহার বা **রিসাইকেল (Recycle)** করার মতো ভারী শিল্প পরিকাঠামো ভারতে এখনও তৈরি হয়নি, যা ভবিষ্যতে পরিবেশের জন্য এক নতুন বর্জ্য সংকট তৈরি করতে পারে।

ভবিষ্যতের করণীয়

- **সমন্বিত সক্ষমতা পরিকল্পনা:** ইভি (EV)-র বিদ্যুতের চাহিদাকে জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে (National Electricity Policy) কেবল একটি সাধারণ পয়েন্ট হিসেবে না রেখে, একে অন্যতম **প্রধান চলক বা পরিবর্তনশীল উপাদান (primary variable)** হিসেবে যুক্ত করতে হবে। ২০৪৭ সাল পর্যন্ত যানবাহনের ৩০%, ৫০% এবং ১০০% বিদ্যুতায়নের সম্ভাব্য পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে মাথায় রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা সাজাতে হবে।
- **স্মার্ট চার্জিংয়ের মানদণ্ড বাধ্যতামূলক করা (Mandate Smart Charging Standards):** আইনি বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে, সমস্ত নতুন চার্জিং পরিকাঠামো বা যন্ত্রপাতিতে যেন উৎপাদন স্তরেই **স্মার্ট-চার্জিং সক্ষমতা** থাকে। এর ফলে ভবিষ্যতে আলাদা করে নতুন প্রযুক্তি জোড়ার বা পরিবর্তনের অতিরিক্ত খরচ (retrofitting costs) এড়ানো যাবে।
- **চাহিদা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Demand-Side Management - DSM):** কাঠামোগত কিছু কৌশল বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে; যেমন—দিনের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুতের ভিন্ন দাম নির্ধারণ বা **টাইম-অফ-ইউজ (ToU) প্রাইসিং**, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়ে কর্মক্ষেত্রে গাড়ি চার্জ করার বাধ্যবাধকতা, চার্জিং হাবগুলিতে বড় ব্যাটারি স্টোরেজ স্থাপন এবং হালকা যানবাহনের জন্য **ব্যাটারি সোয়াপিং নেটওয়ার্ক** (ব্যাটারি অদলবদল ব্যবস্থা) গড়ে তোলা।
- **যৌথ পাওয়ার ম্যাপিং বা বিদ্যুৎ মানচিত্র তৈরি (Joint Power Mapping):** বৈদ্যুতিক ট্রাক বা ভারী গাড়িগুলি বাণিজ্যিক স্তরে ব্যাপকভাবে বাজারে আসার আগেই দেশের **স্বর্ণ চতুর্ভুজ (Golden Quadrilateral)** এবং **ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (DFCs)** বা পণ্য পরিবহনের বিশেষ পথগুলির জন্য একটি সুসমন্বিত বিদ্যুৎ মানচিত্র তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- **আন্তঃ-মন্ত্রক শাসন ব্যবস্থা (Inter-Ministerial Governance):** পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং বণ্টন অর্থায়ন (Distribution Finance) মন্ত্রকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি **আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা** গড়ে তুলতে হবে, যাতে কোনো একটি বিভাগ বাকিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে পরিকল্পনা না করে।

- **ইভি-প্রস্তুত ডিসকম সংস্কার (EV-Ready Discom Reforms):** বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিগুলির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS)-এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট **"ইভি-প্রস্তুতি মানদণ্ড" (EV-readiness benchmarks)** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উপসংহার

পরিবেশবান্ধব ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ভারতকে কেবল স্কুটারের বাইরে গিয়ে তার সামগ্রিক বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবস্থায় **বিপ্লবী পরিবর্তন** আনতে হবে। সুদূরপ্রসারী সক্ষমতা পরিকল্পনা, স্মার্ট-চার্জিংয়ের আইনি বাধ্যবাধকতা এবং **বহুমুখী পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পোর্টফোলিও** (diversified clean energy portfolio) ব্যবহারের মাধ্যমেই গ্রিডের বর্তমান দুর্বলতাগুলিকে দূর করে একে শূন্য-কার্বন নির্গমনকারী মালবাহী লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান মেরুদণ্ড হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

Q. "The political visibility of India's two-wheeler electric transition risks obscuring a deeper infrastructure challenge rooted in supply chain electrification." Critically analyze the challenges faced by India's electrical grid in light of full fleet electrification by 2047. (15 Marks)

3.1.8. ভারতে টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি

ভূমিকা

- পশ্চিম এশিয়ার চলমান উত্তেজনা এবং জ্বালানি ও সারের ক্রমবর্ধমান দাম সার উৎপাদনের জন্য **আমদানিকৃত উপকরণের (Imported Inputs)** ওপর ভারতের নির্ভরশীলতাকে উন্মোচিত করেছে। ভারত তার ইউরিয়া চাহিদার প্রায় ৮০% অভ্যন্তরীণভাবে মেটালেও, এই খাতটি আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, দেশে পর্যাপ্ত **রক ফসফেট (Rock Phosphate)** ভাণ্ডার না থাকায় ফসফ্যাটিক সার মূলত আমদানি করা হয়।
- সৌর শক্তি ব্যবহার করে জলের ইলেকট্রোলাইসিসের মাধ্যমে উৎপাদিত **গ্রিন অ্যামোনিয়া (Green Ammonia)** সারের বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে, তবে জলকষ্টপ্রবণ অঞ্চলে এর স্থায়িত্ব সীমিত।
- একই সাথে, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস সার ভারতের **খাদ্য নিরাপত্তার (Food Security)** জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা সার ভর্তুকিতে ব্যয় করা সত্ত্বেও, ভর্তুকির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অংশ কার্যকর কৃষি উৎপাদনের পরিবর্তে **অদক্ষতা এবং দূষণের (Inefficiency and Pollution)** মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায়।

রাসায়নিক সার সম্পর্কে ধারণা

রাসায়নিক সার হলো শিল্পজাত পদার্থ যা উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির উচ্চ ঘনত্ব ধারণ করে। এটি মূলত **হেবার-বশ প্রক্রিয়ার (Haber-Bosch Process)** মাধ্যমে উৎপাদিত হয়।

- **তিনটি প্রধান পুষ্টি উপাদান: NPK**
  - **নাইট্রোজেন (N):** পাতা ও কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। ভারতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রূপ হলো **ইউরিয়া (Urea)**।
  - **ফসফরাস (P):** শিকড়ের বিকাশ এবং বীজ গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান রূপ হলো **DAP (Di-ammonium Phosphate)**, যা ভারত প্রায় সম্পূর্ণ আমদানি করে।
  - **পটাশিয়াম (K):** উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং জল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা সাধারণত **MOP (Muriate of Potash)** হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- আদর্শ অনুপাত ৪:২:১ হলেও ভারতের কিছু অঞ্চলে NPK **অনুপাত বর্তমানে ৩৪:১০:১**-এ পৌঁছেছে, যা মৃত্তিকার পুষ্টির চরম ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে।

কৃষি উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় সারের গুরুত্ব

A. **কৃষি উৎপাদনশীলতা:**

- **উচ্চ ফলনশীল** (HYV) **বীজ** তাদের জেনেটিক সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীল।
- সীমিত আবাদি জমিতে রবি, খরিফ এবং জায়েদ মরসুমে দ্রুত পুষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে **বহুমুখী শস্য পর্যায়** (Multiple Cropping) নিশ্চিত করে।
- খাদ্যশস্যের পাশাপাশি তৈলবীজ, ডাল এবং গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য সার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

B. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক তাৎপর্য:**

- কৃষি ভারতের ৪২% কর্মসংস্থান এবং ১৭-১৮% GDP-তে অবদান রাখে।
- সার উদ্বৃত্ত উৎপাদন বজায় রাখে, যা Public Distribution System (PDS) বা জনবন্টন ব্যবস্থার ভিত্তি।
- স্থিতিশীল কৃষি উৎপাদন **খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি** (Food Inflation) নিয়ন্ত্রণে এবং Consumer Price Index (CPI) স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে।
- ২০২৬ সালের খরিফ মরসুমের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ফসফ্যাটিক এবং পটাশিয়াম সারের জন্য **৪১,৫৩৪ কোটি টাকা ভর্তুকি** অনুমোদন করেছে।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **আমদানি নির্ভরতা:** রক ফসফেট, পটাশ এবং সালফারের অভাব ভারতকে আমদানির ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz) দিয়ে বিশ্বের ৩০% সার বাণিজ্য হয়, যা ভূ-রাজনৈতিক উত্তজনাপ্রবণ।
- **ভর্তুকির বোঝা এবং নীতিগত বিকৃতি:** ভারত বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়। ইউরিয়া **পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি** (NBS Framework)-এর বাইরে থাকায় এটি সস্তা এবং এর অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।
- **অল্প দক্ষতা:** ইউরিয়ার **নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা** (NUE) অত্যন্ত কম; মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শস্য দ্বারা শোষিত হয়, বাকিটা উদ্বায়ীভবন বা চুইয়ে পড়ার মাধ্যমে নষ্ট হয়।
- **মৃত্তিকার অবক্ষয় ও ফার্টিলাইজার ট্র্যাপ:** অতিরিক্ত সার ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার জৈব পদার্থ কমে যায়। এটি **ফার্টিলাইজার ট্র্যাপ** (Fertilizer Trap) তৈরি করে, যেখানে ফলন ধরে রাখতে কৃষকরা আরও বেশি সার দিতে বাধ্য হন।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- PM-PRANAM **প্রকল্প:** রাজ্যগুলোকে সারের ব্যবহার কমাতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার প্রচার করে।
- **ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো DAP:** পুষ্টি ব্যবহারের দক্ষতা (NUE) বাড়াতে এবং আমদানি খরচ কমাতে তরল ন্যানো সার ব্যবহার।
- **নিশিক্ত ইউরিয়া** (Neem Coated Urea)**:** নাইট্রোজেন নির্গমনের গতি ধীর করতে প্রবর্তিত।
- Soil Health Card (SHC) **প্রকল্প:** মৃত্তিকা পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।
- **দলহন আত্মনির্ভরতা মিশন (২০২৫):** অড়হর, বিউলি এবং মসুর ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য। তবে এপ্রিল ২০২৬-এর তথ্য অনুযায়ী, ডাল চাষের এলাকা মাত্র ১.২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এর দুর্বল বাস্তবায়ন নির্দেশ করে।

ভারতে সারের ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির ভবিষ্যতের পথ

- **সার সরবরাহ বৃদ্ধি থেকে পুষ্টি ব্যবহারের দক্ষতার দিকে মনোযোগ স্থানান্তর:** ভারতকে কেবল ভর্তুকি-চালিত সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে সারের ব্যবহারের দক্ষতা বা **Fertilizer Use Efficiency** বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কম সার প্রয়োগ করে অধিক ফলন নিশ্চিত করাই এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত। কৃষি, সার, জল, খাদ্য এবং পরিবেশ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে **Interministerial National Nitrogen Steering Committee**-কে পুনরুজ্জীবিত করা জরুরি।
- **শস্যের ধরণ এবং সংগ্রহ নীতি (Procurement Policies) সংস্কার:** সরকারি সংগ্রহ প্রক্রিয়া কেবল ধান ও গমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ডাল, তৈলবীজ এবং মিলেটকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহারের প্রবণতা কমাবে এবং **শস্য বৈচিত্র্যকরণে (Crop Diversification)** উৎসাহ দেবে। শিম্বগোত্রীয় শস্যের (Legumes) চাষ বাড়ানো প্রয়োজন, কারণ এগুলো প্রাকৃতিকভাবে নাইট্রোজেন ধরে রাখে। ধান চাষের ২০% এলাকা যদি ডাল চাষের অধীনে আনা যায়, তবে তা সার সাশ্রয় করার পাশাপাশি জলের অপচয় রোধ করবে।
- **জৈব ও জৈবিক পুষ্টির উৎসের প্রসার:** মৃত্তিকার জৈব কার্বন (Soil Organic Carbon) পুনরুদ্ধার করতে এবং রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে গোবর সার, কম্পোস্ট, **Biochar** এবং **জৈব সার (Biofertilizers)**-এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। সারের সুপারিশের ক্ষেত্রে প্রথমে জৈব সারকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার কেবল অভাব পূরণে ব্যবহার করতে হবে। ৪০% জৈব, ৩০% জৈবিক এবং ৩০% রাসায়নিক সারের একটি সুষম মিশ্রণ দীর্ঘমেয়াদী **সুস্থিতি** নিশ্চিত করতে পারে।
- **প্রিসিশন এগ্রিকালচার (Precision Agriculture) এবং দক্ষ পুষ্টি সরবরাহ:** নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক মৃত্তিকা পরীক্ষা, **Drip Fertigation** এবং ড্রোনের মাধ্যমে পাতায় স্প্রে করার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুষ্টির অপচয় রোধ করতে হবে। এই প্রযুক্তিগুলো সঠিক পরিমাণে সার সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং দূষণ কমায়।
- **গবেষণা এবং জলবায়ু সহনশীল শস্যের জাত শক্তিশালীকরণ:** উচ্চ পুষ্টি দক্ষতা সম্পন্ন এবং কম সার প্রয়োজন এমন শস্যের জাত উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ভারতীয় গবেষণা অনুযায়ী, উন্নত ধানের জাত ফলন না কমিয়েই নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম।
- **সারের কাঠামোগত নীতি সংস্কার:** মূল্যের বিকৃতি সংশোধন এবং নাইট্রোজেনের অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে ইউরিয়াকে **পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি (NBS Framework)**-এর আওতায় আনা প্রয়োজন। **Direct Benefit Transfer (DBT)**-এর পরিধি বাড়ানো এবং **iFMS** ব্যবস্থা শক্তিশালী করলে ভর্তুকি সঠিক জায়গায় পৌঁছাবে এবং সারের অপব্যবহার রোধ হবে।

উপসংহার

- ভারতের সার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মূলত নীতিগত বিকৃতি, সংগ্রহ প্রক্রিয়ার ভারসাম্যহীনতা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাবজনিত একটি **সিস্টেমিক ব্যর্থতা (Systemic Failure)**। এর সমাধানের জন্য বিচ্ছিন্ন হস্তক্ষেপের বদলে পুরো চাষ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।
- শস্য সংগ্রহে সাহসী সংস্কার, ডাল ও শিম্বগোত্রীয় শস্য চাষে প্রকৃত উৎসাহ প্রদান, মৃত্তিকার স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সারের দামের কাঠামোগত সংশোধনের মাধ্যমেই ভারত **'ফার্টিলাইজার ট্র্যাপ'** থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটি একইসাথে খাদ্য নিরাপত্তা, আর্থিক সুস্থিতি এবং পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করবে।

Q. India's fertilizer crisis is not merely a supply issue, but a structural challenge linked to cropping patterns, subsidy distortions, and declining soil health. Examine. 15 Marks

3.1.9. ভারতের রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ভূমিকা

- বৈশ্বিক বাণিজ্যের ব্যাঘাত, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিশ্বব্যাপী চাহিদা হ্রাসের সত্ত্বেও ভারতের **রপ্তানি খাত** (export sector) উল্লেখযোগ্য **স্থিতিস্থাপকতা** (resilience) প্রদর্শন করেছে।
- ২০২৬ সালের এপ্রিলে পণ্য রপ্তানি প্রায় ১৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, পাশাপাশি অ-তৈল (non-oil) রপ্তানিও প্রায় ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতের ক্রমবর্ধমান **বহুমুখীকরণ** (diversification) এবং **সরবরাহ শৃঙ্খলের শক্তিকে** (supply chain strength) প্রতিফলিত করে।
- তবে, ভারত এখনও **ব্যয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা** (cost competitiveness), **লজিস্টিকস দক্ষতা** (logistics efficiency), **মানের মানদণ্ড** (quality standards) এবং **বৈশ্বিক বাজার একীকরণের** (global market integration) সাথে সম্পর্কিত বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

ভারতের রপ্তানি অর্থনীতির উদীয়মান প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি

ক. ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিমিয়াম স্মার্টফোন উৎপাদন

- **উচ্চ-মূল্যের উৎপাদনের দিকে রূপান্তর (High-Value Manufacturing):** ভারত দ্রুত সাধারণ সংযোজন কেন্দ্র থেকে একটি অত্যাধুনিক বৈশ্বিক উৎপাদন হাবে পরিণত হয়েছে। **'চীন প্লাস ওয়ান' (China Plus One)** সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠনের সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলো এখন চীন থেকে সরে এসে ভারতে বিনিয়োগ করছে।
- **PLI-চালিত পরিবর্তন: উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (PLI)** প্রকল্প উপাদান উৎপাদনে উৎসাহিত করেছে, যা এই খাতকে উচ্চ-মূল্যের প্রিমিয়াম ডিভাইসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ২০২৫ ক্যালেন্ডার বছরে স্মার্টফোন রপ্তানি রেকর্ড **৩০ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছেছে (মূলত অ্যাপল-এর কারণে), যা মোট ইলেকট্রনিক্স রপ্তানিকে **৪ ট্রিলিয়ন টাকার** মাইলফলক পার করতে সাহায্য করেছে।

খ. পরিষেবা খাত এবং গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC)

- **বাণিজ্যের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে পরিষেবা:** ভারতের পরিষেবা খাত বৈদেশিক বাণিজ্যের সবচেয়ে স্থিতিশীল স্তম্ভে পরিণত হয়েছে, যা পণ্য বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। মোট রপ্তানিতে পরিষেবার অংশ ২০১৪ সালের ৩৯% থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে **৪৯%** হয়েছে।
- **সাধারণ আইটি আউটসোর্সিং-এর ঊর্ধ্বে: গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC)** গুলোর বিস্ফোরক বৃদ্ধি উচ্চ-মানের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)** এবং আর্থিক সমাধান প্রদানের মাধ্যমে ভারতের **জ্ঞান রপ্তানিকে (Knowledge Exports)** বিশ্বজুড়ে উন্নত করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পরিষেবা রপ্তানি **৩৮৭.৬ বিলিয়ন ডলারের** সর্বকালীন উচ্চতা স্পর্শ করেছে।

গ. প্রতিরক্ষা দেশীয়করণ এবং কৌশলগত রপ্তানি পরিবর্তন

- **আমদানিকারক থেকে রপ্তানিকারক:** ভারত একটি গভীর কৌশলগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে—প্রতিরক্ষা আমদানির ওপর ঐতিহাসিক নির্ভরতা কমিয়ে উন্নত সামরিক হার্ডওয়্যারের নেট রপ্তানিকারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর মূলে রয়েছে **'আত্মনির্ভর ভারত' (Atmanirbhar Bharat)** ম্যান্ডেট এবং নেতিবাচক আমদানি তালিকা।
- **রেকর্ড প্রতিরক্ষা রপ্তানি:** ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা রপ্তানি রেকর্ড **২৩,৬২২ কোটি টাকায়** পৌঁছেছে। ভারত এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং আর্মেনিয়া সহ ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করে এবং ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে **ব্রহ্মোস (BrahMos)** মিসাইল চুক্তির চেষ্টা করছে।

ঘ. কৌশলগত বাণিজ্য বহুমুখীকরণ এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)

- **নতুন গন্তব্য, নতুন পথ:** সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে অন্তত ২০টি রপ্তানি খাত ১৭টি বা তার বেশি নতুন গন্তব্য যুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, হস্তচালিত পণ্য (Handloom) এখন ২০২৪-২৫ সালের তুলনায় আরও ২৯টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে, যা ভারতের **বহুমুখীকরণ (Diversification)** প্রচেষ্টার প্রভাব প্রমাণ করে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সুফল:** ভারত-ইএফটিএ (India-EFTA) চুক্তি ১৫ বছরে **১০০ বিলিয়ন ডলারের** আইনিভাবে বাধ্যতামূলক সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রতিশ্রুতি দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং নিউজিল্যান্ডের সাথে নতুন চুক্তিগুলো ভারতের প্রধান রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাসে সহায়তা করছে। UNCTAD বর্তমানে বাণিজ্য বহুমুখীকরণে ভারতকে 'গ্লোবাল সাউথ'-এ তৃতীয় স্থানে রেখেছে।

ঙ. ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

- **জেনেরিকের বাইরে ফার্মা:** ভারতের ওষুধ শিল্প সাধারণ জেনেরিক ওষুধ থেকে উন্নত **বায়োলজিক্যালস** (Biologicals) এবং জটিল ফর্মুলেশন তৈরির দিকে এগোচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ওষুধ রপ্তানি ৯.৪% বৃদ্ধি পেয়ে **৩০ বিলিয়ন ডলারের** মাইলফলক অতিক্রম করেছে।
- **ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের স্থিতিস্থাপকতা:** ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাত হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ২০২৬ সালের এপ্রিলে গত বছরের তুলনায় বেশি রপ্তানি হয়েছে। উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন অটোমোটিভ, এভিয়েশন এবং পরিকাঠামো সরবরাহ শৃঙ্খলের উন্নতির কারণে এই খাতের রপ্তানি জানুয়ারি ২০২৬-এ **১০.৪০ বিলিয়ন ডলার** ছাড়িয়েছে।

চ. কৃষি রপ্তানি এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উৎপাদন

- **স্থিতিশীল কৃষি রপ্তানি:** ২০২৫ সালে ভারতের কৃষি রপ্তানি **৫১.৯ বিলিয়ন ডলারের** মাইলফলক বজায় রেখেছে। এখানে কাঁচা পণ্যের পরিবর্তে জলবায়ু-সহনশীল, **মূল্য-সংযোজিত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য** (Value-added processed foods) যেমন রেডি-টু-ইট খাবার এবং **অর্গানিক মিলেট** (Organic Millets) রপ্তানির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে, যা মেগা ফুড পার্ক এবং APEDA-র মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- **সোলার মডিউল রপ্তানি:** বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে ভারত সোলার মডিউল রপ্তানি ২০২৫ সালের এপ্রিল-অক্টোবরের মধ্যে ৩০.৭% বৃদ্ধি করেছে, যার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানি শক্তিতে এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে সৌর ফটোভোলটাইক (PV) উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ হওয়া বহু বিলিয়ন ডলারের PLI প্রকল্পের মাধ্যমে।

ভারতের রপ্তানি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সীমাবদ্ধকারী প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক. কাঠামোগত লজিস্টিকস প্রতিবন্ধকতা

- **উচ্চ লজিস্টিকস খরচ:** 'পিএম গতিশক্তি' (PM GatiShakti) প্রকল্পের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সড়ক পরিবহনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে ভারতের লজিস্টিকস খরচ এখনও অনেক বেশি। পণ্য পরিবহনের প্রায় ৭১% সড়কপথে, ১৮% রেলপথের মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Water Transport) মাত্র ২%-এ সীমাবদ্ধ। এটি ভারতীয় পণ্যের চূড়ান্ত বাজারমূল্য (Landed Cost) বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য বিঘ্ন:** পশ্চিম এশিয়া সংকটের কারণে ২০২৬ সালের এপ্রিলে ওই অঞ্চলে রপ্তানি ২৮% হ্রাস পেয়েছে এবং আমদানি ৩২% কমেছে। এটি ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতি ভারতের **সুভেদ্যতাকে** (Vulnerability) প্রকাশ করে।

খ. কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM) এবং সবুজ পরিপালন

- **নতুন বাণিজ্য বাধা হিসেবে CBAM:** ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM), যা ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে তার আর্থিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, ভারতের কার্বন-নিবিড় রপ্তানি পণ্য যেমন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম

এবং সিমেন্টের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় ইস্পাত রপ্তানিকারকরা ২০-৩৫% অতিরিক্ত করের বোঝা সম্মুখীন হতে পারেন, যা ইউরোপের বাজারে ভারতীয় ধাতুর মূল্যের সুবিধাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

- **MSME পরিপালন ব্যবধান:** অনেক ভারতীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (MSME) কাছে CBAM পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক **কার্বন অ্যাকাউন্টিং পরিকাঠামো (Carbon Accounting Infrastructure)** নেই। এর ফলে তারা হয় উচ্চ কার্বন ট্যাক্সের মুখে পড়বে, না হয় লাভজনক ইউরোপীয় বাজার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে।

গ. ঋণের ব্যবধান এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) নিম্ন ব্যবহার

- **MSME ঋণের ব্যবধান:** বর্তমানে MSME খাতের ঋণের ব্যবধান প্রায় **৩০ লক্ষ কোটি টাকার** মতো। রপ্তানি ঋণের সুদের হার বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের তুলনায় ২-৪% বেশি, যা ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন করে তোলে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির নিম্ন ব্যবহার:** বেশ কিছু উচ্চ-পর্যায়ের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) থাকা সত্ত্বেও, পুরনো চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে দেশীয় রপ্তানিকারকদের ব্যবহারের হার ২৫%-এর নিচে (উন্নত দেশগুলোতে যা ৭০-৮০%)। জটিল **রুলস অফ অরিজিন (Rules of Origin)** এবং সচেতনতার অভাবই এর প্রধান বাধা।

ঘ. ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচার, শুল্ক-বহির্ভূত বাধা এবং কেন্দ্রীকরণ ঝুঁকি

- **ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচার (Inverted Duty Structure):** যখন কাঁচামালের ওপর করের হার তৈরি পণ্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন তাকে ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচার বলে। এটি ইলেকট্রনিক্স এবং রাসায়নিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে দেশীয় **মূল্য সংযোজনকে (Value Addition)** নিরুৎসাহিত করে।
  - ওষুধ তৈরির কাঁচামাল বা **অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API)**-এর জন্য ৭০%-এর বেশি চীনের ওপর নির্ভরতা ভারতের ওষুধ রপ্তানিকে সরবরাহ বিঘ্নের ঝুঁকিতে ফেলে।
- **শুল্ক-বহির্ভূত বাধা (Non-Tariff Barriers):** ভারতীয় রপ্তানিকারকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ক্রমবর্ধমান কঠোর **স্যানিটারি এবং ফাইটোস্যানিটারি (SPS)** ব্যবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে।
  - HS04 কোডের অধীনে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত ৩৪৪টি চালান প্রত্যাখানের সম্মুখীন হয়েছে।
  - এছাড়া, ভারতের রপ্তানি ঝুড়ি এখনও মূলত পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং রত্ন ও অলংকারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল। এই পণ্যগুলোর বৈশ্বিক দামের অস্থিরতা ভারতের **বাণিজ্য ভারসাম্যকে (Trade Balance)** কাঠামোগতভাবে দুর্বল করে তোলে।

ভারতের রপ্তানি প্রতিদ্বন্দ্বিতা শক্তিশালী করার ভবিষ্যতের পথ

- **একীভূত ডিজিটাল বাণিজ্য স্থাপত্য (Unified Digital Trade Architecture):** ভারতকে একটি এআই-চালিত (AI-driven) **'সিঙ্গেল উইন্ডো ২.০'** কার্যকর করতে হবে, যা শুল্ক, শিপিং এবং গুণমান শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে একীভূত করবে। এটি **'রুলস অফ অরিজিন'** যাচাইকরণকে স্বয়ংক্রিয় করবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) জন্য ঘর্ষণহীন বাণিজ্য নিশ্চিত করতে 'ট্রাস্টেড সাপ্লায়ার গ্রিন-চ্যানেল ক্লিয়ারেন্স' প্রদান করবে।
- **কৌশলগত উপাদান উৎপাদন এবং PLI ৩.০:** নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্য সংযোজন (Assembly) থেকে সরে এসে **গভীর-স্তরের উপাদান উৎপাদনের (Deep-tier component manufacturing)** দিকে নজর দিতে হবে। বিরল মৃত্তিকা প্রক্রিয়াকরণ (Rare earth processing), সেমিকন্ডাক্টর সামগ্রী এবং রাসায়নিক মধ্যবর্তী পণ্যের জন্য **PLI ৩.০** চালু করে আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।
- **সবুজ রপ্তানি ঋণ এবং কার্বন অ্যাকাউন্টিং কাঠামো:** ইস্পাত এবং টেক্সটাইল খাতের কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য একটি **'সবুজ রপ্তানি ঋণ' (Green Export Credit)** সুবিধা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি, দেশীয় কার্বন অ্যাকাউন্টিং কাঠামো রপ্তানিকারকদের **CBAM** পরিপালন করতে অগ্রিম সহায়তা করবে।

- **বন্দর-ভিত্তিক শিল্পায়ন এবং মোডাল রিব্যালেন্সিং:** ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরগুলোকে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় মেগা পোর্টের সাথে যুক্ত করতে হবে। পণ্য পরিবহন সড়কপথ থেকে উপকূলীয় শিপিং এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে স্থানান্তরিত করলে পণ্যের **ল্যান্ডেড কস্ট** (Landed Cost) ২০-৩০% হ্রাস পাবে, যা ভারতের মূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সহায়তা কেন্দ্র এবং ট্রেড অ্যাটাচে:** জেলা স্তরে FTA **সহায়তা কেন্দ্র** স্থাপন করতে হবে যা পণ্য-ভিত্তিক শুল্ক তথ্য প্রদান করবে। এছাড়া, জিসিসি (GCC) এবং আফ্রিকার মতো উদীয়মান বাজারগুলোতে নিবেদিত **'ট্রেড অ্যাটাচে'** (Trade Attaches) নিয়োগ করতে হবে, যাতে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিগুলোর সুবিধা ভারত পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।
- **বৈচিত্র্যময় বাণিজ্য অর্থায়ন এবং রপ্তানি ফ্যাক্টরিং:** ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেমকে (TReDS) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করতে হবে। একটি **সার্বভৌম রপ্তানি বীমা তহবিল** (Sovereign Export Insurance Fund) গঠন করলে MSME-গুলোর জন্য জামানতবিহীন কার্যকরী মূলধন আনলক হবে এবং অপ্রচলিত উচ্চ-বৃদ্ধির বাজারগুলোর পথ প্রশস্ত হবে।
- **গুণমান সমন্বয় এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (MRA):** প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে **পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (MRA)** স্বাক্ষর করতে হবে যাতে ভারতীয় ল্যাবরেটরির শংসাপত্র বিশ্বব্যাপী গৃহীত হয়। কৃষি ও ওষুধ রপ্তানির বারবার প্রত্যাখ্যান রোধ করতে জাতীয় গুণমান পরিকাঠামো এবং অত্যাধুনিক টেস্টিং ক্লাস্টারে বিনিয়োগ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের শক্তিশালী রপ্তানি কর্মক্ষমতা তার বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টার প্রাথমিক সাফল্যকে প্রতিফলিত করে। তবে এই গতি বজায় রাখতে লজিস্টিকস, অর্থায়ন, গুণমান মানদণ্ড এবং উৎপাদন সক্ষমতায় গভীর **কাঠামোগত সংস্কার** (Structural Reforms) প্রয়োজন, যাতে দেশ একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রপ্তানি-চালিত অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

Q. India's export diversification strategy has improved resilience against global trade disruptions, but structural bottlenecks continue to limit export competitiveness. Examine. 15 Marks

3.2. পরিবেশ

3.2.1. কার্বন ট্যাক্স দেশের টাকা দেশেই রাখা উচিত

ভূমিকা

- ইউরোপীয় ইউনিয়নের **কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম** (CBAM) — যা **১ জানুয়ারি, ২০২৬** থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়েছে — এটি ইউরোপের একটি সাহসী জলবায়ু পদক্ষেপ। তবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে এটি ক্রমশ 'সবুজ পোশাক' পরিহিত একটি **বাণিজ্য বাধা** (Trade Barrier) হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।
- এক্ষেত্রে গভীরতর প্রশ্নটি এটি নয় যে, **কার্বন প্রাইসিং** (Carbon Pricing) বা কার্বনের মূল্য নির্ধারণ বৈধ কি না; বরং প্রশ্ন হলো, ভারত কি কেবল একজন **নিষ্ক্রিয় নিয়ম-পালনকারী** (Passive Rule-taker) হিসেবেই থেকে যাবে, নাকি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যাপী **সবুজ অর্থনীতিতে** (Green Economy) নিজেকে একজন **সার্বভৌম নিয়ম-প্রণেতা** (Sovereign Rule-maker) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রেক্ষাপট: ইউরোপীয় ইউনিয়নের CBAM সম্পর্কে ধারণা

- **CBAM কী?:** কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM) হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) একটি নীতি, যার মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করা নির্দিষ্ট কিছু আমদানিকৃত পণ্যের ওপর **কার্বন খরচ (Carbon Cost)** আরোপ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো আমদানিকৃত পণ্যগুলোকে ইইউ-তে উৎপাদিত পণ্যের সমপর্যায়ে আনা, কারণ ইইউ-এর উৎপাদকরা ২০০৫ সাল থেকে কার্যকর বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন বাজার — **EU Emissions Trading System (ETS)**-এর অধীনে ইতিমধ্যে তাদের কার্বন নির্গমনের জন্য মূল্য পরিশোধ করে।
- **ভিত্তি হিসেবে EU ETS:** ইউরোপীয় উৎপাদকদের তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের সমপরিমাণ **কার্বন অ্যালাউন্স (Carbon Allowances)** কিনতে হয়। প্রথাগতভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর এমন কোনো কার্বন খরচ ছিল না, যা তাদের মূল্যের দিক থেকে বাড়তি সুবিধা দিত। CBAM আমদানিকৃত পণ্যের **অন্তর্নিহিত কার্বনের (Embedded Carbon)** ওপর প্রবেশপথেই মূল্য নির্ধারণ করে এই বৈষম্য দূর করে।
- **মূল উদ্দেশ্য:** আমদানিকৃত পণ্যের কার্বনের ওপর মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে একটি **সমপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্র (Level Playing Field)** তৈরি করা এবং বাণিজ্যকে জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
- **নীতিগত সংযোগ:** CBAM সরাসরি ইইউ-এর **গ্রিন ডিল (Green Deal)** এবং ২০৫০ সালের মধ্যে **নেট-জিরো (Net-zero)** নির্গমন অর্জনের লক্ষ্যের সাথে যুক্ত। এটি **GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)**-এর বৈশ্বিক বাণিজ্য নিয়মের সাথেও সম্পর্কিত, বিশেষ করে **আর্টিকেল III (ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট)**।
- **আওতাভুক্ত ক্ষেত্র:** প্রাথমিকভাবে এটি ছয়টি কার্বন-নিবিড় খাতের ওপর প্রযোজ্য — **ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সার, বিদ্যুৎ এবং হাইড্রোজেন**। ভবিষ্যতে আরও প্রায় ১৮০টি পণ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টিং পর্যায় ছিল। **১ জানুয়ারি, ২০২৬** থেকে পূর্ণাঙ্গ পরিপালন (Full Compliance) পর্যায় শুরু হয়েছে। ২০২৬ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে ইইউ উৎপাদকদের জন্য বিনামূল্যে কার্বন অ্যালাউন্স সুবিধা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।
- **কার্যপদ্ধতি:** আমদানিকারকদের **CBAM সার্টিফিকেট** কিনতে হবে যা EU ETS মূল্যের সাথে যুক্ত (বর্তমানে প্রতি টন কার্বনে গড়ে **৫০–৬৫ ইউরো**)। এটি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় খরচ। তবে, যদি পণ্যের **উৎপত্তিস্থল দেশেই (Country of Origin)** ইতিমধ্যে কার্বন মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তবে CBAM রেগুলেশনের **আর্টিকেল ৯** অনুযায়ী তা বিয়োগ বা বাদ দেওয়া যেতে পারে।
- **ভারতের ওপর প্রভাব:** ভারতের ইউরোপে রপ্তানি করা **ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম** (বার্ষিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি) সরাসরি CBAM-এর আওতায় পড়ছে। ইস্পাত রপ্তানিতে প্রতি টনে আনুমানিক **১০০–১৫০ মার্কিন ডলার** অতিরিক্ত খরচ হতে পারে, যা ইউরোপীয় বাজারে ভারতের **প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা (Competitiveness)** কমিয়ে দিতে পারে।

ভারতের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **ভর্তুকির অসমতা — ইইউ উৎপাদক বনাম ভারতীয় রপ্তানিকারক:** ইউরোপীয় উৎপাদকরা ডিকার্বোনাইজেশনের জন্য বিশাল **ভর্তুকি (Subsidies)**, কম সুদে সরকারি অর্থায়ন এবং CBAM চালু হওয়ার পরেও বিনামূল্যে ETS allowances পাচ্ছে — যা কার্যত তাদের প্রকৃত কার্বন খরচ কমিয়ে দিচ্ছে। বিপরীতে, ভারতীয় রপ্তানিকারকরা এ ধরনের কোনো রাষ্ট্রীয় সহায়তা পায় না এবং তাদের সম্পূর্ণ **CBAM চার্জ** বহন করতে হচ্ছে, যা একটি বৈষম্যমূলক আর্থিক বোঝা তৈরি করছে।
- **WTO এবং GATT-এর সামঞ্জস্যতা নিয়ে উদ্বেগ:** CBAM-এর নকশা GATT Article III-এর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে, যা দেশীয় উৎপাদকদের অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে অভ্যন্তরীণ চার্জ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। যেহেতু ইইউ উৎপাদকরা ভর্তুকি পাচ্ছে এবং কম কার্বন খরচ দিচ্ছে, তাই CBAM প্রকৃত কার্বন সামঞ্জস্যের বদলে একটি **ছদ্মবেশী সংরক্ষণবাদ (Disguised Protectionism)** হতে পারে।

- **ভারতের জন্য FTA-তে কোনো ছাড় নেই:** ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬-এ সম্পন্ন হওয়া **ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)**-তে ভারতকে কোনো CBAM ছাড় দেওয়া হয়নি। ইইউ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে কোনো দেশকেই আলাদা সুবিধা দেওয়া হবে না, যার ফলে নতুন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কাঠামো থাকা সত্ত্বেও ভারত CBAM-এর ঝুঁকিতে রয়ে গেছে।
- **ইউরোপীয় তহবিলে কার্বন রাজস্বের নির্গমন:** বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী, CBAM থেকে প্রাপ্ত সমস্ত রাজস্ব **ইইউ-এর বাজেটে** জমা হবে। অর্থাৎ ভারতীয় রপ্তানিকারকদের দেওয়া কার্বন ট্যাক্স ইউরোপের 'গ্রিন ট্রানজিশন'-এ অর্থায়ন করবে — যা **জলবায়ু বিচার (Climate Justice)** নীতির পরিপন্থী। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত নয় উন্নত দেশের ডিকার্বোনাইজেশনে নিজেদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিনিময়ে অর্থ সাহায্য করা।
- **কার্বন নীতির ওপর সার্বভৌমত্ব রক্ষা:** CBAM ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর কার্বন মূল্য নির্ধারণের **বহির্ভূত ক্ষমতা (Extraterritorial Power)** দেয়। এটি ভারতকে তার নিজস্ব গতিতে এবং নিজস্ব সম্পদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার **সার্বভৌম অধিকার** থেকে বঞ্চিত করে।

ভারতের কৌশলগত প্রতিক্রিয়া: CCTS, CBAM Article 9 এবং IBAM

ভারত শূন্য থেকে শুরু করছে না। **কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম (CCTS)**-এর মাধ্যমে ভারত ইতিমধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ কার্বন মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি তৈরি করেছে। প্রস্তাবিত **ইন্ডিয়া বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (IBAM)** একটি আইনি ও কৌশলগত পথ দেখায়।

১. **Carbon Credit Trading Scheme (CCTS):** ২০২২ সালের জ্বালানি সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইনের অধীনে ২০২৩ সালে সরকার এটি চালু করে। এটি **ইস্পাত, সিমেন্ট এবং অ্যালুমিনিয়াম**—এর মতো প্রধান শিল্পগুলোতে কার্বন মূল্য নির্ধারণ করবে যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনে স্বীকৃত।

২. **CBAM Article 9 — ভারতের জন্য আইনি সুযোগ:** CBAM রেগুলেশনের ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনো পণ্য তার **উৎপত্তিস্থল দেশে (Country of Origin)** ইতিমধ্যে কার্বন মূল্য পরিশোধ করে থাকলে তা ইইউ সীমান্তে বাদ দেওয়া বা ক্রেডিট হিসেবে নেওয়া যাবে। যদি CCTS ইইউ দ্বারা স্বীকৃত হয়, তবে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা দ্বৈত কর এড়াতে পারবেন।

৩. **FTA Annex 14-A — কূটনৈতিক লিভার:** ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির এই অ্যানেক্সটি CBAM বাস্তবায়নের বিষয়ে কারিগরি আলোচনার সুযোগ দেয়। এতে একটি **Most-Favoured-Nation (MFN)** ক্লজ রয়েছে—অর্থাৎ ইইউ যদি অন্য কোনো দেশকে কোনো ছাড় দেয়, তবে ভারতও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই সুবিধা পাবে।

৪. **IBAM কী?: India Border Adjustment Mechanism (IBAM)** হলো একটি প্রস্তাবিত নীতি যেখানে ভারত নিজেই তার রপ্তানি পণ্যের ওপর কার্বন চার্জ আরোপ করবে। এতে কার্বন করের টাকা ইউরোপের তহবিলে না গিয়ে **ভারতের হাতেই থাকবে**।

৫. **IBAM কীভাবে CBAM-কে নিষ্ক্রিয় করবে:** যদি IBAM সঠিকভাবে কার্যকর হয় এবং ইইউ-এর স্বীকৃতি পায়, তবে রপ্তানিকারকদের মোট খরচ বাড়বে না। ইউরোপে যে কর দিতে হতো, তা তারা ভারতেই দেবে এবং ইইউ সীমান্তে সেই রসিদ দেখিয়ে ছাড় পাবে। ফলে প্রতিটা **টাকা বা রুপি ভারতেই থেকে যাবে**।

৬. **রিং-ফেন্সড গ্রিন ফান্ড (Green Transition Fund):** IBAM থেকে অর্জিত রাজস্ব একটি বিশেষ তহবিলে রাখা হবে যা শুধুমাত্র **সবুজ হাইড্রোজেন (Green Hydrogen)**, আধুনিক ব্লাস্ট ফার্নেস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতো পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

বৈশ্বিক উদাহরণ: ভারতের জন্য শিক্ষা

- **যুক্তরাজ্য (UK):** তাদের নিজস্ব UK ETS আছে এবং তারা ইইউ-এর সাথে এমন আলোচনা করছে যাতে তাদের রপ্তানিকারকদের দ্বৈত কার্বন কর দিতে না হয়।

- **কানাডা:** তাদের Output-Based Pricing System (OBPS)-কে ইইউ-এর সমতুল্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে যাতে তাদের রপ্তানিকারকরা CBAM থেকে রেহাই পায়।
- **দক্ষিণ কোরিয়া:** ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর তাদের K-ETS বাজারটি বেশ পরিপক্ক, যা তাদের রপ্তানিকারকদের CBAM-এর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সুরক্ষা কবজ হিসেবে কাজ করছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: CBAM-কে হুমকি থেকে সুযোগে রূপান্তরের কৌশল

- **CCTS-এর বাস্তবায়ন এবং পরিধি ত্বরান্বিত করা:** ভারতকে অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) ব্যবস্থার মাধ্যমে Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)-কে দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এর আওতা ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট এবং সারের মতো সমস্ত **CBAM-প্রভাবিত ক্ষেত্রে** সম্প্রসারিত করতে হবে। একটি সুশৃঙ্খল CCTS হলো **CBAM Article 9** অনুযায়ী কর ছাড় পাওয়ার জন্য ভারতের প্রধান হাতিয়ার।
- **Annex 14-A-কে সক্রিয় কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার:** ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) **Annex 14-A**-কে কেবল একটি সাধারণ অংশ হিসেবে না দেখে আলোচনার একটি জীবন্ত টেবিল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কারিগরি আলোচনার মাধ্যমে **CCTS** এবং **IBAM**-কে নির্ভরযোগ্য কার্বন মূল্য হিসেবে আগাম স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। এছাড়া রুপি ও ইউরোর কার্বন মূল্যের সমতা নির্ধারণের স্বচ্ছ প্রোটোকল তৈরি করতে হবে যাতে IBAM চালুর আগেই তা আইনিভাবে সুরক্ষিত থাকে।
- **নির্বাহী আদেশের বদলে আইনের মাধ্যমে IBAM গঠন:** India Border Adjustment Mechanism (IBAM)-কে কেবল সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে না এনে **সংসদীয় আইনের** (Legislation) মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে। এটি একে আইনি স্থায়িত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা দেবে, যা ইইউ-এর **Article 9**-এর অধীনে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অপরিহার্য। এই আইনে তহবিলের কাঠামো, রাজস্বের ব্যবহার এবং অডিট বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট থাকতে হবে।
- **বহুপাক্ষিক মঞ্চে জলবায়ু বিচারের** (Climate Justice) **পক্ষে সওয়াল:** ভারতকে WTO, UNFCCC এবং G20-এর মতো মঞ্চে CBAM-এর কাঠামোগত অসমতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে **Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)** নীতি অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষ ছাড় বা বিশেষ ব্যবস্থার দাবি জানাতে হবে।
- **IBAM রাজস্ব সরাসরি শিল্প ডিকার্বোনাইজেশনে বিনিয়োগ:** আন্তর্জাতিকভাবে IBAM-এর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে এর রাজস্ব কীভাবে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যয় হচ্ছে তার ওপর। ভারতকে একটি স্বতন্ত্র অডিট ব্যবস্থার অধীনে **Green Transition Fund** গঠন করতে হবে। এই তহবিলের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কতটা হ্রাস পেল তা বার্ষিক জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এর মাধ্যমে বিশ্বকে দেখাতে হবে যে ভারতের কার্বন রাজস্ব সাধারণ রাজকোষে না গিয়ে প্রকৃত **সবুজ রূপান্তর বা ডিকার্বোনাইজেশনে** ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসংহার

CBAM ভারতের জন্য তার অর্থনৈতিক **সার্বভৌমত্ব** এবং জলবায়ু নেতৃত্ব প্রদর্শনের জন্য একই সাথে একটি চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ। কৌশলগতভাবে IBAM বাস্তবায়ন এবং অভ্যন্তরীণ কার্বন বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ভারত বাইরের এই চাপকে নিজের **সবুজ অর্থনীতিতে** (Green Transition) রূপান্তরের চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে পারে।

Q. The European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) represents a shift from free trade to climate-linked trade regulation. Critically examine its implications for India's trade interests and global climate justice. 15 Marks

3.2.2. মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত ব্যবস্থাপনা: সহাবস্থান এবং টেকসই সংরক্ষণ

ভূমিকা

- **মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত (HWC)** এখন আর কেবল একটি প্রান্তিক সংরক্ষণ উদ্বেগ নয়; এটি একটি নির্ণায়ক **সামাজিক-বাস্তুসংস্থানিক সংকট (Socio-ecological crisis)** হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা জৈববৈচিত্র্য সুরক্ষা, গ্রামীণ জীবিকা এবং **টেকসই উন্নয়নের (Sustainable development)** সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে।
- যেহেতু ভারত **২০৭০ সালের মধ্যে** HWC-এর জন্য একটি **বৈশ্বিক হটস্পট (Global hotspot)** হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে, তাই একটি বিজ্ঞানসম্মত, **সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক (Community-centred)** এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

মানুষ-পশু সংঘাত বোঝা: এটি কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

১. **HWC-এর সংজ্ঞা**

- **ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (IUCN)** মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতকে মানুষ এবং বন্যপ্রাণীর মধ্যে এমন একটি মিথস্ক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যার ফলে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে, বন্যপ্রাণীর সংখ্যায় অথবা সামগ্রিক পরিবেশে **নেতিবাচক প্রভাব (Negative impacts)** পড়ে।
- এটি কেবল শারীরিক আক্রমণের চেয়েও গভীর কিছু; এটি আসলে সম্প্রসারিত মানব বসতি এবং বন্যপ্রাণীর **বাসস্থানের (Habitats)** মধ্যে স্থান, খাদ্য এবং বেঁচে থাকার লড়াই নিয়ে একটি **গভীর প্রতিযোগিতা**।

২. **ভারতে সমস্যার ব্যাপকতা**

- ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে, ভারতে **হাতির আক্রমণে ২,৭০০-এরও বেশি** মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে **বাঘের আক্রমণে ৩৪৯ জন** প্রাণ হারিয়েছেন, যা এই সংকটের বিশালতাকে তুলে ধরে।
- একই সাথে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া (Electrocution), ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ এবং বিষক্রিয়ার ফলে শত শত হাতির মৃত্যু হয়েছে; যা প্রমাণ করে যে এই সংঘাতের বলি হচ্ছে উভয় পক্ষই।
- পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৭০ সালের মধ্যে ভারত মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের একটি **বৈশ্বিক হটস্পটে** পরিণত হবে, যা তাৎক্ষণিক এবং নিরবচ্ছিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

৩. **একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট**

- ব্রাজিল, কেনিয়া, তানজানিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলিতে হাতি, বড় বিড়াল প্রজাতির প্রাণী (যেমন বাঘ/সিংহ) এবং বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ে নিয়মিত HWC-এর খবর পাওয়া যায়। এই প্রাণীদের বিচরণ করার জন্য বিশাল **আঞ্চলিক পরিসর (Territorial ranges)** এবং **ঋতুভিত্তিক করিডোর (Seasonal corridors)** প্রয়োজন।
- যখন উন্নয়নের ফলে এই প্রাকৃতিক করিডোরগুলো ব্যাহত হয়, তখন সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে; কারণ বন্যপ্রাণীরা খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে কৃষি জমি এবং **শহরতলি এলাকায় (Peri-urban areas)** প্রবেশ করে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।
- এটি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, **ফসল নষ্ট করা** এবং **গবাদি পশু শিকার (Livestock predation)** মূলত পরিবেশগত সীমাবদ্ধতার সাথে প্রাণীদের মানিয়ে নেওয়ার একটি পদ্ধতি (Adaptive responses), এটি কোনো আগ্রাসনের লক্ষণ নয়। এটি প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণের চেয়ে বরং গভীর **বাস্তুসংস্থানিক ভারসাম্যহীনতাকে (Ecological imbalance)** বেশি প্রতিফলিত করে।

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বৃদ্ধির কারণসমূহ

১. **বাসস্থানের ক্ষতি এবং খণ্ডবিখণ্ডতা — প্রধান চালিকাশক্তি**

- প্রাকৃতিক বনভূমিকে কৃষি জমি, রাস্তা এবং শহুরে বসতিতে রূপান্তর করার ফলে বন্যপ্রাণীদের **বাসস্থান সরাসরি ধ্বংস** হচ্ছে। এর ফলে প্রাণীরা খাদ্য, জল এবং আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষের বসতি এলাকায় প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে।
- **রৈখিক পরিকাঠামো (Linear infrastructure)** যেমন মহাসড়ক, রেলপথ এবং খাল বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলকে দ্বিখণ্ডিত করে। এটি ল্যান্ডস্কেপগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে এবং প্রাচীন **পরিযায়ী পথ (Migratory routes)** বা করিডোরগুলো বন্ধ করে দেয়। এর ফলে যানবাহনের সাথে সংঘর্ষ এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণীদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।
  - একটি মর্মান্তিক উদাহরণ: অসমে ট্রেনের সাথে সংঘর্ষে ৮টি হাতির মৃত্যু, যা সরাসরি হাতি চলাচলের করিডোরের ওপর দিয়ে **রেললাইন** যাওয়ার ফল।
  - কর্ণাটকের কোডাগু (Kodagu) জেলায় কফি এবং আদা চাষের বিস্তারের ফলে হাতির পরিযায়ী পথগুলো ব্যাহত হয়েছে, যা ব্যাপক **ফসলহানি (Crop-raiding)** এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. **মানুষের আধিপত্য থাকা পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া — অভ্যাসগত সমস্যা**

- বানর, হাতি এবং চিতাবাঘের মতো বুদ্ধিমান ও অভিযোজনক্ষম প্রজাতিরা মানুষের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত বা **অভ্যস্ত (Habituated)** হয়ে উঠতে পারে। তারা ধীরে ধীরে লোকালয় এবং খামারগুলোকে নির্ভরযোগ্য খাদ্যের উৎস হিসেবে চিনতে শেখে এবং মানুষের প্রতি তাদের সহজাত ভয় হারিয়ে ফেলে।
- মহারাষ্ট্রে **"সুগার বেবি" (Sugar babies)** নামে পরিচিত চিতাবাঘগুলো ঘন আখ ক্ষেতের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা গবাদি পশু শিকার করে বেঁচে থাকে এবং স্থানান্তর করার পরেও বনে ফিরে যায় না, যার ফলে প্রথাগত প্রশমন ব্যবস্থাগুলো এখানে কার্যকর হয় না।

৩. **জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলের অভাব — একটি উদীয়মান উদ্দীপক**

- দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং অনিয়মিত মৌসুমি বায়ুসহ আবহাওয়ার পরিবর্তন বনের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো শুকিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে প্রাণীরা জলের সন্ধানে গ্রামের পুকুর এবং সেচ পাম্পের দিকে চলে আসছে।
- গাছের ফল ধরার সময় পরিবর্তিত হওয়ায় ভালুক এবং বানররা লোকালয়ে খাবার খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে, খাদ্যের সহজলভ্যতা কমে যাওয়ায় **হিমালয়ী বাদামী ভালুক (Himalayan brown bears)** ক্রমবর্ধমান হারে সমতলের দিকে নেমে আসছে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের** ফলে সম্পদের প্রাপ্যতা কমে যাবে এবং মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়কেই একসাথে নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য করবে, যা ভবিষ্যতে এই সংঘাতকে আরও তীব্রতর করে তুলবে।

৪. **বাসস্থানের ক্ষমতার তুলনায় প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি**

- কার্যকর **সংরক্ষণ আইন (Conservation laws)** এবং সুরক্ষা কর্মসূচির ফলে বাঘ, হাতি এবং চিতাবাঘের সংখ্যা সফলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নির্দিষ্ট সংরক্ষিত এলাকার সীমানার মধ্যে প্রাণীদের ঘনত্ব অনেক বেড়ে গেছে।
- যখন প্রাণীরা এই **পরিপূর্ণ রিজার্ভ (Saturated reserves)** থেকে বেরিয়ে আসে, তখন মানুষের সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা আরও ঘনঘন এবং তীব্রতর হয়। এটি একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে **সংরক্ষণের সাফল্যই (Conservation success)** সংঘাতের জন্ম দেয়।

মানুষ-পশু সংঘাত কমাতে সরকারের গৃহীত প্রধান পদক্ষেপসমূহ

১. **সাংবিধানিক ও বিচার বিভাগীয় ভিত্তি**

- সংবিধানের **৫১এ(জি) অনুচ্ছেদ [Article 51A(g)]** বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও উন্নত করাকে প্রত্যেক নাগরিকের একটি **মৌলিক কর্তব্য** হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে—যা সমস্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার নৈতিক ও সাংবিধানিক ভিত্তি।
- সুপ্রিম কোর্ট, **অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড অফ ইন্ডিয়া বনাম এ. নাগরাজা (২০১৪)** এবং **গুজরাট রাজ্য বনাম মির্জাপুর মতি কুরেশি কাসাব জামাত (২০০৫)** মামলায় স্বীকৃতি দিয়েছে যে প্রাণীরা আইনি অধিকার এবং কল্যাণমূলক সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য এবং তাদের আনুষ্ঠানিক আইনি মর্যাদা প্রদান করেছে।

২. **আইনি কাঠামো — সংরক্ষণের মেরুদণ্ড**

- **বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২ (WPA)** হলো প্রধান আইনি দলিল যা জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করে; এর ২০০৬ সালের সংশোধনীতে প্রাণীদের চলাচল সহজ করতে এবং HWC কমাতে **বন্যপ্রাণী করিডোরকে** আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ (Biological Diversity Act)** বাস্তুসংস্থান, প্রজাতি এবং জিনগত বৈচিত্র্যের সামগ্রিক সংরক্ষণের লক্ষ্য রাখে, যা বিদ্যমান বন্যপ্রাণী আইনগুলোকে সহায়তা করে।
- লোকসভায় **বন্যপ্রাণী করিডোর বিল, ২০১৯** (বেসরকারি সদস্য বিল) পেশ করা হয়েছিল যা মূলত বন্যপ্রাণী করিডোরগুলোর আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষার মাধ্যমে HWC মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তৈরি।

৩. **নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন**

- **জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মপরিকল্পনা (NWAP) ২০১৭-৩১** বিপন্ন প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং তথ্য-ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে **সম্প্রদায়-ভিত্তিক সহাবস্থানকে** উৎসাহিত করে।
- NDMA **নির্দেশিকা** এখন আনুষ্ঠানিকভাবে HWC-কে একটি **দুর্যোগ ঝুঁকি (Disaster risk)** হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পে আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা ও আবাসস্থল ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়।

৪. **প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ — উদ্ভাবনের প্রয়োগ**

- **গজরাজ সিস্টেম (Gajraj System):** ভারতীয় রেলওয়ে এটি মোতায়েন করেছে, যা ফাইবার-অপটিক সেন্সর এবং **AI নজরদারি** ব্যবহার করে রেললাইনে হাতির উপস্থিতি শনাক্ত করে এবং সংঘর্ষ প্রতিরোধ করে হাতির প্রাণ বাঁচায়।
- **TrailGuard AI:** এটি একটি কমপ্যাক্ট ক্যামেরা সিস্টেম যা AI ব্যবহার করে সংরক্ষিত এলাকায় মানুষ, শিকারি এবং যানবাহন শনাক্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ কার্যকরভাবে হ্রাস করে।

৫. **প্রজাতি-নির্দিষ্ট সংরক্ষণ কর্মসূচি**

- **প্রজেক্ট টাইগার (১৯৭৩):** এটি আবাসের ক্ষতি মোকাবিলায় কোর (Core) এবং বাফার (Buffer) জোনসহ **ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার** তৈরি করে এবং সীমানায় মানুষ-বাঘ সংঘাত পরিচালনা করে।
- **সংরক্ষণাগারের বাইরের বাঘ (TOTR) প্রকল্প:** ভারতের প্রায় ৩০% বাঘ যারা সংরক্ষিত বনের বাইরে থাকে, তাদের সাথে মানুষের সংঘাত কমাতে **AI, GPS এবং ক্যামেরা** ব্যবহার করা হয়।
- **প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট (১৯৯২):** এটি হাতির আবাসস্থল এবং করিডোর রক্ষা করে, যাতে পরিযায়ী পথগুলো সুরক্ষিত থাকে এবং ফসলহানি বা পরিবহন নেটওয়ার্কে দুর্ঘটনা হ্রাস পায়।

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কার্যকরভাবে প্রশমনে আগামী পথ

১. **ল্যান্ডস্কেপ-স্তরের পরিকল্পনা**

- ভারতকে বিচ্ছিন্ন সংরক্ষিত এলাকার পরিবর্তে সম্পূর্ণ **ল্যান্ডস্কেপ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা** গ্রহণ করতে হবে, যাতে বৈজ্ঞানিকভাবে ম্যাপ করা বন্যপ্রাণী করিডোরগুলোর মাধ্যমে প্রাণীরা অবাধে চলাচল করতে পারে।
- আবাসস্থলের খণ্ডবিখণ্ডতা রোধ করার জন্য পরিকল্পনার শুরু থেকেই জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জোনিং বিধিনিষেধে বন্যপ্রাণীর বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয়** অপরিহার্য, কারণ প্রাণীদের চলাচল প্রায়শই প্রশাসনিক সীমানা অতিক্রম করে।

২. **মাঠ পর্যায়ে প্রতিরোধ ও নিবৃত্তি**

- মানুষের বসতির কাছে **সৌরবিদ্যুৎ চালিত বেড়া**, পরিখা এবং পাথরের দেয়াল—এর পাশাপাশি আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা এবং প্রাণীর গতিবিধি ট্র্যাক করার জন্য **মোবাইল অ্যাপের** ব্যবহার বিপজ্জনক মোকাবিলা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।
- ভুটান এবং নেপালের শিকারি-রোধী গবাদি পশুর খাঁচা এবং সম্প্রদায়-পরিচালিত বাফার জোনগুলোর মতো স্থানীয়ভাবে পরীক্ষিত সমাধানগুলো সফল প্রমাণিত হয়েছে।

৩. **অর্থনৈতিক ও জীবিকা নির্বাহের সহায়তা**

- ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্যপ্রাণীর প্রতি সহনশীলতা গড়ে তুলতে ফসল বা গবাদি পশুর ক্ষতির **ক্ষতিপূরণ প্রকল্পগুলো** হতে হবে সময়োপযোগী, স্বচ্ছ এবং বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- মৌমাছি পালন বা **ইকোট্যুরিজমের** মতো বিকল্প জীবিকাকে উৎসাহিত করতে হবে যা বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির সাথে ইতিবাচক অর্থনৈতিক যোগসূত্র তৈরি করে।
- বতসোয়ানা ও নামিবিয়ার মডেল অনুযায়ী, যখন স্থানীয় সম্প্রদায় পর্যটন রাজস্বের অংশ পায়, তখন তারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বেশি আগ্রহী হয়।

৪. **আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার**

- সংঘাতের ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বন, কৃষি, পুলিশ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থায়ী **জেলা ও রাজ্য স্তরের** HWC **টাস্ক ফোর্স** গঠন করা প্রয়োজন।
- সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য **'মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রভাব মূল্যায়ন' (HWCIA)** বাধ্যতামূলক করা এবং অবকাঠামো পরিকল্পনায় বন্যপ্রাণী পারাপারের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৫. **সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা**

- গ্রাম স্তরের কমিটির মাধ্যমে **অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা** এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে বনের প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বন্যপ্রাণীর প্রতি সামাজিক সহনশীলতা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব।
- শিক্ষা ও সচেতনতাকে নিছক অতিরিক্ত নয়, বরং HWC নীতির **মূল স্তম্ভ** হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

উপসংহার

- মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কোনো বিচ্ছিন্ন পরিবেশগত সমস্যা নয়, বরং এটি অস্থিতিশীল ভূমি ব্যবহার এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের সরাসরি ফলাফল।
- ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে **সহাবস্থানের** এমন একটি মডেল তৈরির মধ্যে যেখানে সংরক্ষণ, সম্প্রদায়ের কল্যাণ, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়কেই রক্ষা করতে একসঙ্গে কাজ করবে।

Q. Evaluate the effectiveness of India's legal, institutional, and technological measures in mitigating Human–Wildlife Conflict. What further reforms are required to ensure long-term coexistence? (15 Marks)

3.2.3. ভারতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংকট: কেন্দ্রীভূত শাসনের সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের পথ

ভূমিকা

- ভারতের বর্জ্য সংকট একটি প্রধান **পরিবেশগত**, **জনস্বাস্থ্য** এবং **শাসনতান্ত্রিক** চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। উপচে পড়া ল্যান্ডফিল (আবর্জনার স্তূপ), দূষিত নদী, প্লাস্টিক-আবদ্ধ ড্রেন এবং ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলকেই প্রভাবিত করছে।
- যদিও **কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬**-এর লক্ষ্য হলো বর্জ্য শাসনকে শক্তিশালী করা, কিন্তু এর অতিরিক্ত **কেন্দ্রীকরণ**, **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো**, **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন**, প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং ব্যবহারিক বাস্তবায়ন নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য বোঝা

ক. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SWM) কী?

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পরিবার, শিল্প, প্রতিষ্ঠান, বাজার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপন্ন বর্জ্যের **পৃথকীকরণ (Segregation)**, সংগ্রহ, পরিবহন, **পুনর্ব্যবহার (Recycling)**, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিরাপদ অপসারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বোঝায়।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন— **পচনশীল বর্জ্য**, প্লাস্টিক বর্জ্য, **ই-বর্জ্য (e-waste)**, স্যানিটারি বর্জ্য, বিপজ্জনক গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং নির্মাণ বর্জ্য; যার প্রত্যেকটির জন্য আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে কেবল বর্জ্য সংগ্রহ নয়, বরং **জনগণের অংশগ্রহণ**, আচরণগত পরিবর্তন, কম্পোস্টিং পরিকাঠামো, **বৈজ্ঞানিক ল্যান্ডফিল** এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণও অন্তর্ভুক্ত।

খ. ভারতে ক্রমবর্ধমান বর্জ্য সংকট

- ভারত প্রতিদিন প্রায় **১.৬ লক্ষ টন** পৌর কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন করে এবং নগরায়ন, উপভোক্তাবাদ ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে এই পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- যদিও প্রায় ৭০-৭৫% বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়, তবে এর মধ্যে সামান্য অংশই **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ** করা হয়। বাকি বিশাল পরিমাণ বর্জ্য ল্যান্ডফিল এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ডে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়।
- দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলো **মিথেন নির্গমন**, ল্যান্ডফিলে আগুন, বিষাক্ত **লিচেট (Leachate)** এবং মারাত্মক বায়ু ও জল দূষণের মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
- গ্রামীণ ভারতেও প্লাস্টিক বর্জ্য, স্যানিটারি বর্জ্য এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ার ফলে পরিবেশগত সমস্যা প্রকট হচ্ছে।

গ. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬

- এই বিধিগুলো **পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬**-এর অধীনে তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত ১৯৭২ সালের **স্টকহোম ঘোষণা (Stockholm Declaration)** অনুযায়ী ভারতের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সংবিধানের **২৫৩ অনুচ্ছেদের** অধীনে প্রণীত হয়েছিল।
- অনুচ্ছেদ ২৫৩ সংসদকে আন্তর্জাতিক চুক্তির খাতিরে রাজ্যের বিষয়গুলোতেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়, যা পরিবেশ শাসনে **কেন্দ্রের ভূমিকাকে** শক্তিশালী করে।
- তবে, এই সাংবিধানিক ক্ষমতা যেন স্থানীয় প্রশাসন, **জনস্বাস্থ্য** এবং **পৌর শাসনের** ওপর অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনেকাংশেই জমির প্রাপ্যতা, জনবসতির ধরণ, **আর্থিক সক্ষমতা** এবং নাগরিক অংশগ্রহণের মতো **স্থানীয় কারণের** ওপর নির্ভর করে, যা প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কার্যকর ও বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

১. জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য

- **জনস্বাস্থ্যের জন্য:** বর্জ্যের অনুপযুক্ত নিষ্পত্তি জল দূষণ, রোগের বিস্তার, মশার প্রজনন এবং খোলা জায়গায় আবর্জনা পোড়ানো বা ল্যান্ডফিলের নির্গমনের কারণে **শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার** কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
  - দুর্বল স্যানিটারি ব্যবস্থা বিশেষ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নিকটবর্তী এবং **নিম্ন আয়ের বসতিগুলোতে** বসবাসকারী মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে, যেখানে পরিবেশগত স্বাস্থ্যঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। তাই জনস্বাস্থ্য উন্নত করা, রোগ প্রতিরোধ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য **বৈজ্ঞানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা** প্রয়োজন।
- **পরিবেশ সুরক্ষার জন্য:** খোলা জায়গায় ময়লা ফেলা এবং অপরিকল্পিত ল্যান্ডফিল থেকে প্রচুর পরিমাণে **মিথেন গ্যাস** নির্গত হয়, যা **জলবায়ু পরিবর্তন** এবং বিশ্ব উষ্ণায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

- অপরিশোধিত বর্জ্য ভূগর্ভস্থ জল, নদী, হ্রদ, কৃষিজমি এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রকে দূষিত করে, যার ফলে **জীববৈচিত্র্য** এবং পরিবেশগত ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু প্রশমন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং **টেকসই নগর উন্নয়নের** জন্য কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

২. **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এবং সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে**

- সঠিকভাবে **পৃথকীকরণ (Segregation)**, পুনর্ব্যবহার (Recycling), কম্পোস্টিং এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ বর্জ্যকে দরকারী সম্পদে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে, যেমন— সার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ, জৈব-শক্তি এবং শিল্পের কাঁচামাল। এটি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমিয়ে, **সম্পদের দক্ষতা (Resource Efficiency)** বৃদ্ধি করে, **সবুজ কর্মসংস্থান (Green Jobs)** সৃষ্টি করে এবং নতুন কাঁচামালের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি **বৃত্তাকার অর্থনীতিকে** সমর্থন করে।

৩. **বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্য শাসন সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং দায়বদ্ধতাকে শক্তিশালী করে**

- কার্যকর বর্জ্য শাসনের জন্য শক্তিশালী **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো (Cooperative Federalism)** প্রয়োজন, কারণ মহানগর, পাহাড়ি শহর, উপকূলীয় অঞ্চল, আদিবাসী এলাকা এবং গ্রামীণ জনপদে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখানে **সাবসিডিয়ারিটি নীতি (Principle of Subsidiarity)** গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যার অর্থ হলো শাসনের কাজগুলো স্থানীয় বাস্তবতা এবং মানুষের প্রয়োজনের নিকটতম স্তরে (তৃণমূল স্তরে) সম্পাদিত হওয়া উচিত।
- বর্জ্য উৎপাদনের ধরণ, সংগ্রহ ব্যবস্থা, জমির প্রাপ্যতা, জনসংশ্লিষ্টতা এবং আঞ্চলিক পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে **স্থানীয় সরকারের (Local Governments)** ধারণা অনেক ভালো থাকে। তাই **বিকেন্দ্রীভূত শাসন (Decentralised Governance)** স্বচ্ছতা, স্থানীয় দায়বদ্ধতা, নাগরিকদের মালিকানাবোধ এবং প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত **কেন্দ্রীকরণ** প্রায়শই স্থানীয় উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় এবং রাজ্যগুলোকে কেবল বাস্তবায়নকারী সংস্থায় পরিণত করে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬-এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে**

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০২৬ একটি উচ্চমাত্রার **কেন্দ্রীভূত শাসন কাঠামো (Centralised Governance Structure)** প্রতিফলিত করে, যেখানে কেন্দ্র সরকার পরিচালনার রূপরেখা তৈরি করে এবং রাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলো মূলত কেবল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে।
- এই পদ্ধতি **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে (Cooperative Federalism)** দুর্বল করে, কারণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক সক্ষমতা, আর্থিক সম্পদ, পরিবেশগত অবস্থা এবং শাসনের চ্যালেঞ্জগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামো **অঞ্চল-ভিত্তিক বাস্তবতা (Region-specific Realities)** মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হতে পারে এবং স্থানীয় উদ্ভাবন ও নমনীয়তার সুযোগ কমিয়ে দেয়।

২. **'একই নীতি সবার জন্য' (One-Size-Fits-All) পদ্ধতি তৃণমূল বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে**

- ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা; কারণ মহানগর, পাহাড়ি শহর, উপকূলীয় অঞ্চল, আদিবাসী এলাকা এবং গ্রামীণ জনপদ সম্পূর্ণ ভিন্ন **ভৌগোলিক ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার** সম্মুখীন হয়।
- তা সত্ত্বেও, এই বিধিগুলো পরিকাঠামো, আর্থিক সক্ষমতা এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্যগুলো পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা না করেই সবার ওপর **একই ধরনের বাধ্যবাধকতা (Compliance Expectations)** আরোপ করে, যা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবাস্তব বোঝা তৈরি করতে পারে।

৩. **গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলোর দুর্বল সক্ষমতা**

- অধিকাংশ **গ্রাম পঞ্চায়েতের** প্রযুক্তিগত কর্মী, ডিজিটাল পরিকাঠামো, আর্থিক সম্পদ এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার অভাব রয়েছে।

- গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা, পারিবারিক স্তরে **কম্পোস্টিং** (Composting), সহজতর বর্জ্য সংগ্রহ এবং স্থানীয় বাস্তবতার উপযোগী **ক্লাস্টার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ** (Cluster-based Processing) ব্যবস্থার ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত।

৪. **ডিজিটাল কমপ্লায়েন্সের বোঝা এবং দুর্বল আর্থিক সহায়তা**

- CPCB (কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল রিপোর্টিং, অডিট এবং কেন্দ্রীভূত নজরদারির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রকৃত পরিষেবার চেয়ে **কাগজকলম এবং ডাটা এন্ট্রির** দিকে মনোযোগ বেশি চলে যেতে পারে।
- একই সাথে, পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলো আর্থিক সংকট, দুর্বল রাজস্ব উৎপাদন এবং অনিয়মিত অনুদানের ওপর নির্ভরশীলতার সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।

৫. **বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার ঝুঁকি** (Risk of Judicialisation)

- বিধিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হলে **জনস্বার্থ মামলা** (PIL) এবং বিচারবিভাগীয় নজরদারি বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে শাসনব্যবস্থা প্রকৃত পরিবেশগত ফলাফল এবং নাগরিক অংশগ্রহণের পরিবর্তে কেবল **কম্প্লায়েন্স রিপোর্ট** (Compliance Reports) বা আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

১. **জার্মানির বিকেন্দ্রীভূত রিসাইক্লিং মডেল**

- জার্মানি শক্তিশালী **পৌর স্বায়ত্তশাসন** (Municipal Autonomy), নাগরিক অংশগ্রহণ, উৎপাদকের দায়িত্ব এবং কঠোর **উৎস পৃথকীকরণ** (Source Segregation) অনুশীলনের ভিত্তিতে একটি দক্ষ বিকেন্দ্রীভূত রিসাইক্লিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।
- স্থানীয় পরিকাঠামো এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী অঞ্চল-ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থা নকশা করার জন্য স্থানীয় সরকারগুলোকে **নমনীয়তা** (Flexibility) প্রদান করা হয়।

২. **জাপানের সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক বর্জ্য শাসন**

- জাপান অত্যন্ত সুশৃঙ্খল **সম্প্রদায়-ভিত্তিক বর্জ্য পৃথকীকরণ** ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে নাগরিকরা কঠোর স্থানীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্জ্য বাছাই এবং পুনর্ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
- শক্তিশালী **স্থানীয় দায়বদ্ধতা** (Local Accountability) এবং সামাজিক শৃঙ্খলা জাপানকে ল্যান্ডফিলের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং রিসাইক্লিং দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করেছে।

৩. **সুইডেনের বৃত্তাকার অর্থনীতি** (Circular Economy) **পদ্ধতি**

- সুইডেন উন্নত প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী **বৃত্তাকার অর্থনীতি** নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বর্জ্যকে শক্তি এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদে সফলভাবে রূপান্তরিত করেছে।
- দক্ষ পৃথকীকরণ ব্যবস্থা এবং **স্থানীয় উদ্ভাবন** (Local Innovation) সারা দেশে ল্যান্ডফিলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে।

ভারতে টেকসই বর্জ্য শাসন কাঠামো তৈরির পথ

১. **জাতীয় মানের সাথে রাজ্যের নমনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখা**

- কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ন্যূনতম পরিবেশগত মানদণ্ড নির্ধারণ করা, পাশাপাশি রাজ্যগুলোকে তাদের নিজস্ব পরিবেশগত, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং **আর্থিক বাস্তবতা** (Fiscal Realities) অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নকশা করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া। এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে** শক্তিশালী করবে।

২. **স্থানীয় সরকারগুলোকে আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতায়ন করা**

- তৃণমূল স্তরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলোর পর্যাপ্ত **আর্থিক সহায়তা**, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, **প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন** এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

- স্থানীয় সংস্থাগুলোকে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল কেবল 'বাস্তবায়নকারী সংস্থা' হিসেবে না দেখে, প্রকৃত **স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান** হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৩. **ভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক বর্জ্য মডেল**

- ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চ্যালেঞ্জগুলো ভিন্ন হওয়ায় আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নকশা করা উচিত।
- **মেগাসিটিগুলোর** জন্য উন্নত বর্জ্য-প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো এবং বৈজ্ঞানিক ল্যান্ডফিল প্রতিকার প্রয়োজন। অন্যদিকে, **গ্রামীণ এলাকা** এবং ছোট শহরগুলোর জন্য **কমিউনিটি কম্পোস্টিং** এবং ক্লাস্টার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার মতো বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৪. **নাগরিক অংশগ্রহণকে বর্জ্য শাসনের কেন্দ্রে রাখা**

- টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা **আচরণগত পরিবর্তন** (Behavioural Change), সম্প্রদায়ের মালিকানাবোধ এবং পৃথকীকরণ ও স্যানিটেশন অনুশীলনে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে।
- **ওয়ার্ড কমিটি**, **গ্রামসভা**, এবং রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (RWA)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় বর্জ্য শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলতে হবে।

৫. **রাজ্যগুলোকে উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা**

- রাজ্যগুলোকে অঞ্চল-ভিত্তিক উদ্ভাবন যেমন— অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি এবং স্থানীয় রিসাইক্লিং বাজার তৈরির জন্য উৎসাহিত করা উচিত। সফল রাজ্য-স্তরের পরীক্ষাগুলো পরবর্তীতে জাতীয় স্তরে অনুকরণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

ভারতের বর্জ্য সংকট কেবল **কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ** এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশগতভাবে টেকসই দেশ গড়ার জন্য **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো**, ক্ষমতায়নকৃত স্থানীয় সরকার, **বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো** এবং **জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের** ওপর ভিত্তি করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো প্রয়োজন।

Q. India's waste crisis cannot be solved through excessive centralisation alone." Examine the challenges associated with the Solid Waste Management Rules, 2026 and suggest suitable measures. 15 Marks

3.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

3.3.1. সাইবার যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক আইনি জবাবদিহিতার সংকট

প্রেক্ষিত

- **আমেরিকা, ইসরায়েল এবং ইরানের** মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা উন্মোচিত করেছে যে আধুনিক যুদ্ধ এখন আর কেবল শারীরিক যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।
- প্রচলিত সামরিক হামলার পাশাপাশি, এই সংঘাতগুলোতে সংবাদপত্রের ওয়েবসাইট হ্যাক করা, যোগাযোগের অ্যাপ্লিকেশনে বিঘ্ন ঘটানো এবং **তথ্য পরিবেশ** (Information Environment) ম্যানিপুলেট করার জন্য **সাইবার অপারেশনের** সক্রিয় ব্যবহার দেখা গেছে।
- এই পরিবর্তনটি বৈশ্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি নিষ্পত্তিমূলক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে **ডিজিটাল বিঘ্ন** (Digital Disruption) সামরিক কৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যা একই সাথে বেসামরিক অবকাঠামো, প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক এবং সরকারি ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করছে।

সাইবার যুদ্ধ এবং ডিজিটাল বিঘ্নের আধুনিক ল্যান্ডস্কেপ বোঝা

- **সাইবার যুদ্ধ সম্পর্কে:** সাইবার যুদ্ধ বলতে রাষ্ট্র বা অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলোর দ্বারা **হ্যাকিং**, ডিজিটাল বিঘ্ন এবং তথ্য ম্যানিপুলেশনের ব্যবহারকে বোঝায় যা শত্রুকে দুর্বল করার জন্য ব্যবহৃত হয়; এটি প্রায়শই শারীরিক সামরিক অভিযানের আগে বা পাশাপাশি পরিচালিত হয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা:** সাইবার অপারেশনগুলো প্রায়শই **গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো** (Critical Infrastructure), প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে, যা প্রথাগত শারীরিক যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে সংঘাতকে বিস্তৃত করে।
- **অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলোর** (Non-State Actors) **ক্রমবর্ধমান ভূমিকা:** বেশ কিছু অ-রাষ্ট্রীয় সাইবার গোষ্ঠী, যেমন **'হান্দালা হ্যাক টিম'** (Handala Hack Team), বিদেশি সংস্থাগুলোর ওপর হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে, যার মধ্যে একটি মার্কিন-ভিত্তিক চিকিৎসা প্রযুক্তি সংস্থাও রয়েছে; এটি বৈশ্বিক সংঘাতে সাইবার যোদ্ধাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে তুলে ধরে।
- **বেসামরিক ও বাণিজ্যিক খাতের ওপর প্রভাব:** সাইবার অপারেশনগুলো বিদ্যুৎ গ্রিড, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, জল সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং প্রতিরক্ষা যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করে, যার ফলে বেসামরিক জীবনের ওপর এর প্রভাব **বিপর্যয়কর** (Catastrophic) হতে পারে।
- **নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ:** প্রচলিত যুদ্ধের বিপরীতে, সাইবার আক্রমণ সরাসরি সামরিক মোকাবিলা ছাড়াই সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে, যা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর অধীনে এগুলি শনাক্ত করা, **আরোপ করা** (Attribute) এবং নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি কঠিন করে তোলে।

সাইবার স্পেসে আইনি সীমারেখা টানা কেন এত কঠিন?

- আন্তর্জাতিক আইনে কিছু প্রাসঙ্গিক নীতি বিদ্যমান রয়েছে। **জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ২(৪)** এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করে এবং **রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের** (State Responsibility) নীতি রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে অন্যায় কাজের জন্য দায়ী করে—উভয় নীতিই তাত্ত্বিকভাবে সাইবার স্পেসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- যাইহোক, মূল চ্যালেঞ্জ হলো এটি নির্ধারণ করা যে কখন একটি সাইবার অপারেশন পর্যাপ্ত পরিমাণে গুরুতর হয়ে ওঠে যাতে সেটিকে **বলপ্রয়োগের নিষিদ্ধ ব্যবহার** (Prohibited Use of Force) বা আন্তর্জাতিকভাবে অন্যায় কাজ হিসেবে গণ্য করা যায়।
- **সাইবার ক্ষতির 'গ্রে জোন'** (Grey Zone of Cyber Harm):
  - সাইবার আক্রমণগুলো প্রায়শই পরোক্ষ, সাময়িক বা অ-শারীরিক ক্ষতি করে যা প্রচলিত অস্ত্রের দ্বারা হওয়া ধ্বংসলীলার তুলনায় পরিমাপ করা অনেক বেশি কঠিন।
  - নির্বাচনী ডেটাবেস ব্যাহত করা, হাসপাতালের নেটওয়ার্ক ধীর করে দেওয়া বা আর্থিক বাজারে হস্তক্ষেপ করা বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো **যুদ্ধের কাজ** (Act of War) হিসেবে গণ্য হবে কি না তা আইনত অস্পষ্ট থেকে যায়।
  - **'তালিন ম্যানুয়াল'** (Tallinn Manual), যা ন্যাটো (NATO) সাইবার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত একটি অ-বাধ্যতামূলক একাডেমিক নথি, সাইবার অপারেশন কখন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করে, তবে এতে **আইনি প্রয়োগযোগ্যতা** (Legal Enforceability) এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার অভাব রয়েছে।
- এটি একটি গভীর সমস্যাযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে সাইবার স্পেসে উল্লেখযোগ্য এবং ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করা সত্ত্বেও কোনো আনুষ্ঠানিক আইনি প্রতিক্রিয়া শুরু হয় না, যার ফলে ভুক্তভোগীরা কোনো অর্থবহ প্রতিকার পায় না।

সাইবার দ্বন্দ্বে আইনি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **আরোপণ সমস্যা** (Attribution Problem): **প্রমাণ ছাড়াই জানা**

- সাইবার অপারেশনগুলো সাধারণত **লুকানো নেটওয়ার্ক** (Hidden Networks), প্রক্সি সার্ভার এবং একাধিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা আদালতের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।

- কোনো হামলার পেছনে কারা রয়েছে সে সম্পর্কে সরকারগুলোর কাছে **গোয়েন্দা তথ্যের** (Intelligence) ভিত্তিতে দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকতে পারে, কিন্তু সেই তথ্যকে আদালতে গ্রহণযোগ্য আইনি প্রমাণে রূপান্তর করা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চ্যালেঞ্জ।
- এটি রাজনৈতিক নিশ্চয়তা এবং **আইনি প্রমাণের** (Legal Proof) মধ্যে একটি গুরুতর ব্যবধান তৈরি করে; এবং নির্ভরযোগ্য আরোপণ বা শনাক্তকরণ ছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কোনো রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২. **ফোরাম বা বিচারালয় সমস্যা: বিচারের কোনো জায়গা নেই**

- **আন্তর্জাতিক বিচার আদালত** (ICJ) কেবল সেই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে যারা এর এক্তিয়ার মেনে নিতে সম্মত হয়; কিন্তু সাইবার অপারেশনে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলো খুব কমই এই সম্মতি দেয়।
- দেশের অভ্যন্তরীণ আদালতগুলো **সার্বভৌম দায়মুক্তি** (Sovereign Immunity) বা আইনি রক্ষাকবচের বাধার সম্মুখীন হয়, যা বিদেশি সরকারগুলোকে অন্য দেশের আইনি ব্যবস্থায় অভিযুক্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়।
- এর ফলে, রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত সাইবার হামলার শিকার হওয়া পক্ষগুলোর কাছে বিচার বা ক্ষতিপূরণ চাওয়ার মতো অত্যন্ত সীমিত আইনি পথ খোলা থাকে।

৩. **রাজনৈতিক ও কৌশলগত হিসাব-নিকাশ যা আইনি পদক্ষেপকে বাধা দেয়**

- রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা এড়িয়ে চলে, কারণ এতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে, কূটনৈতিক প্রতিহিংসা ডেকে আনতে পারে অথবা সংবেদনশীল গোয়েন্দা সক্ষমতা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হতে পারে।
- এই কারণে, বেশিরভাগ সাইবার ঘটনা আদালত বা আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়ার পরিবর্তে **নেপথ্য কূটনীতি** (Back-channel Diplomacy) এবং রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়, যা জবাবদিহিতার সংস্কৃতিকে আরও দুর্বল করে দেয়।

৪. **প্রমাণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ: জটিল, শ্রেণীবদ্ধ এবং উপস্থাপন করা কঠিন**

- সাইবার মামলাগুলোতে অত্যন্ত উচ্চমানের প্রযুক্তিগত ডেটা, শ্রেণীবদ্ধ গোয়েন্দা তথ্য এবং কারণ-ফলাফলের জটিল শৃঙ্খল জড়িত থাকে, যা মূল্যায়ন করার মতো সরঞ্জাম বা দক্ষতা আদালতের কাছে প্রায়ই থাকে না।
- কে আক্রমণ করেছে, এটি কতটা ক্ষতি করেছে এবং ঠিক কীভাবে এই ক্ষতি হয়েছে—তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পর্যায়ের **প্রযুক্তিগত নির্ভুলতা** (Technical Precision) প্রয়োজন, তা আইনি কার্যধারায় অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন।

আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা এবং কেন সেগুলি ব্যর্থ হচ্ছে

- **বুদাপেস্ট কনভেনশন (২০০১):** সাইবার অপরাধের ওপর এটি সবচেয়ে বহুল পরিচিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, যার সদস্য সংখ্যা ৬৮টিরও বেশি। এটি আন্তঃসীমান্ত সাইবার অপরাধ তদন্ত ও বিচারে সহযোগিতার ওপর জোর দেয়।
- **জাতিসংঘ সাইবার অপরাধ সম্মেলন (২০২৪):** এটি সাইবার হুমকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে।
- **UN GGE এবং OEWG:** জাতিসংঘের এই দলগুলো সাইবার স্পেসে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল আচরণের নিয়মনীতি বা **নর্মস** (Norms) তৈরিতে ঐকমত্য তৈরির কাজ করছে, যদিও এখন পর্যন্ত কোনো বাধ্যতামূলক চুক্তি হয়নি।
- **এই কাঠামোগুলোর প্রধান সীমাবদ্ধতা:** এগুলি মূলত সাইবার অপরাধ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতার ওপর আলোকপাত করে। ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অংশ হিসেবে **রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত সাইবার যুদ্ধের** (State-sponsored Cyber Warfare) বিষয়টি মোকাবেলায় এগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যর্থ। সশস্ত্র যুদ্ধের সময় সাইবার অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো **বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি** (Binding International Treaty) এখনো নেই।

ভারতের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং সাইবার নীতিমালা প্রণয়নে এর প্রয়োজনীয় ভূমিকা

- অর্থনীতি, প্রশাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং জ্বালানির মতো ক্ষেত্রগুলোতে ভারতের দ্রুত ডিজিটাল সম্প্রসারণ এবং **UPI, আধার** (Aadhaar) ও পাওয়ার গ্রিডের মতো প্ল্যাটফর্মের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ভারতের **গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে** (Critical Infrastructure) সাইবার হামলার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলেছে।

- CERT-In-এর তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে ভারতে ১৩ লক্ষেরও বেশি সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে বৈরী রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত আক্রমণও রয়েছে; যা শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক সাইবার নীতিমালার জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।
- **ভবিষ্যতে ভারতের করণীয়:**
  - সাইবার স্পেসে দায়িত্বশীল আচরণের স্পষ্ট নিয়ম এবং বাধ্যতামূলক জবাবদিহিতা ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি করতে জাতিসংঘের UN GGE এবং OEWG-তে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।
  - **জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা নীতি** (National Cyber Security Policy) শক্তিশালী করা এবং CERT-In ও NCIIPC-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
  - উন্নততর আরোপণ বা শনাক্তকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সাইবার হুমকির সমন্বিত মোকাবেলার জন্য সমমনা দেশগুলোর সাথে শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাইবার সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলা।
  - রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত সাইবার যুদ্ধের জন্য একটি আইনিভাবে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি তৈরিতে অবদান রাখা, যেখানে জবাবদিহিতা এবং স্পষ্ট শনাক্তকরণ বা **আরোপণ মানদণ্ড** (Attribution Standards) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
  - দক্ষ সাইবার জনবল তৈরি, উন্নত হুমকি শনাক্তকরণ অবকাঠামো এবং নিয়মিত সাইবার রেজিলিয়েন্স মহড়ার মাধ্যমে দেশীয় সাইবার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বড় বিনিয়োগ করা।

উপসংহার

সাইবার যুদ্ধ আধুনিক সংঘাতের প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে, যার ফলে একটি বিপজ্জনক **জবাবদিহিতার শূন্যতা** (Accountability Gap) তৈরি হয়েছে যা শত্রু পক্ষগুলো অনবরত ব্যবহার করে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি সাইবার স্পেসে জবাবদিহিতার জন্য নির্ভরযোগ্য, প্রয়োগযোগ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারে, তবে আইনের নাগালের বাইরে বড় আকারের ক্ষতি চলতেই থাকবে—যা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, বেসামরিক নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থার অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

Q. Cyber warfare is outpacing the evolution of international legal accountability. Critically examine the challenges posed by cyber warfare and suggest measures for strengthening global cyber governance.

3.4. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

3.4.1. ভারতের মহাকাশ কূটনীতি

ভূমিকা

ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ISRO-এর নেতৃত্বে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি আজ স্বনির্ভরতা থেকে কৌশলগত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্তরে পৌঁছেছে। বর্তমান সময়ে **মহাকাশ কূটনীতি** বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতার বিবর্তন

প্রথম পর্যায়: প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরি (১৯৬০-এর দশক – ১৯৭০-এর দশক)

- **"অনুসন্ধানী" যুগ:** এই সময়ে ভারতের মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণার অবকাঠামো বা পরিকাঠামো তৈরি করা।

- **প্রধান সাফল্য:** ১৯৬৩ সালে আমেরিকার তৈরি **নাইকি-অ্যাপাচি** (Nike-Apache) রকেট উৎক্ষেপণ; ১৯৭৫ সালে ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ **আর্যভট্ট** সোভিয়েত ইউনিয়নের রকেটের সাহায্যে মহাকাশে পাঠানো।
- **সামাজিক প্রভাব:** SITE **(সাইট)** কর্মসূচির মাধ্যমে আমেরিকান উপগ্রহ ব্যবহার করে ভারতের ২,৪০০টিরও বেশি গ্রামে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, যা প্রমাণ করে যে মহাকাশ প্রযুক্তি গ্রামীণ উন্নয়নেও কার্যকর।

দ্বিতীয় পর্যায়: বিকাশ ও ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত (১৯৮০-এর দশক – ১৯৯০-এর দশক)

- **ইঞ্জিন প্রযুক্তিতে উন্নতি:** ফ্রান্সের **ভাইকিং** (Viking) প্রযুক্তির সহায়তায় ভারত সফলভাবে নিজস্ব **বিকাশ** (Vikas) **ইঞ্জিন** তৈরি করে।
- **ক্রায়োজেনিক সংকট:** ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে আমেরিকা MTCR-এর অজুহাত দেখিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন চুক্তি আটকে দেয়। এর ফলে ভারত নিজেই এই প্রযুক্তি তৈরির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং স্বনির্ভর হওয়ার পথে এগিয়ে যায়।
- **বাণিজ্যিক নির্ভরতা:** ভারী INSAT উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ভারত তখন ফ্রান্সের **আরিয়ানস্পেস** (Arianespace)-এর ওপর নির্ভর করত।

তৃতীয় পর্যায়: বিশ্বমানের পরিষেবা প্রদানকারী (২০০০ – ২০১৯)

- **নির্ভরযোগ্যতা:** ভারতের PSLV রকেট বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। ২০১৭ সালে ভারত একটি মাত্র অভিযানে রেকর্ড **১০৪টি উপগ্রহ** উৎক্ষেপণ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়।
- **বৈজ্ঞানিক সমন্বয়:** ভারতের প্রথম চন্দ্রাভিযান **চন্দ্রযান-১** আমেরিকা ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বহন করে চাঁদে জলের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এছাড়া মঙ্গল অভিযানে (**মঙ্গলযান**) ভারত আমেরিকার ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের সহায়তা নেয়।
- **নরম শক্তি** (Soft Power)**:** দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য ভারত **সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট** (GSAT-9) উপহার হিসেবে পাঠিয়ে "মহাকাশ কূটনীতি"র নতুন নজির গড়ে।

চতুর্থ পর্যায়: কৌশলগত অংশীদার ও বাণিজ্যিক শক্তি (২০২০ – ২০২৬)

- **যৌথ উদ্ভাবন:** ভারত এখন আর কেবল প্রযুক্তির ক্রেতা নয়, বরং অংশীদার। আমেরিকার নাসার সাথে NISAR এবং জাপানের সাথে LUPEX-এর মতো মিশনে ভারত "সহ-বিকাশকারী" হিসেবে কাজ করছে।
- **মানুষবাহী মহাকাশ অভিযান: গগনযান** মিশনের জন্য রাশিয়া থেকে প্রশিক্ষণ এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের থেকে মহাকাশ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। ২০২৫ সালের **অ্যাক্সিওম-৪** (Axiom-4) মিশনের মাধ্যমে একজন ভারতীয় মহাকাশচারী আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) যাবেন।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার:** NSIL এবং IN-SPACe-এর মতো সংস্থা তৈরির মাধ্যমে মহাকাশ খাতে ১০০% **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ** (FDI) এবং OneWeb-এর মতো বেসরকারি বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর প্রবেশের পথ সুগম করা হয়েছে।

ভারতের মহাকাশ কূটনীতির মূল স্তম্ভসমূহ

১. **মহাকাশ পরিষেবার প্রধান প্রদানকারী (গ্লোবাল সাউথ নেতৃত্ব)**

- **দক্ষতা বৃদ্ধি:** UNNATI-এর মতো প্রোগ্রামের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কর্মকর্তাদের ন্যানো-স্যাটেলাইট তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারত তার সাশ্রয়ী উদ্ভাবন বিশ্বকে দেখাচ্ছে।
- **উন্নয়নের জন্য মহাকাশ:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (**সেন্টিনেল এশিয়া**), টেলি-মেডিসিন এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করছে।
- **আঞ্চলিক যোগাযোগ: সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট** প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে ভারতের কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছে।

২. **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ও সমতা**

- **ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক:** একদিকে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলোর সঙ্গে **আর্টেমিস অ্যাকর্ডস** (Artemis Accords) এবং NISAR-এর মতো আধুনিক প্রজেক্টে যুক্ত হওয়া, অন্যদিকে রাশিয়া এবং BRICS জোটের দেশগুলোর সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্ব বজায় রাখা।
- **নিরাপত্তা ক্ষমতা:** মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে **ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে** (Indo-Pacific) নজরদারি এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩. **বাণিজ্যিক প্রসার ও শাসনব্যবস্থা**

- **বাজার দখল:** PSLV ও SSLV-এর মতো সাশ্রয়ী রকেটের মাধ্যমে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারতের অংশীদারিত্ব বাড়ানো।
- **নীতি নির্ধারণ:** মহাকাশে সবার সমান অধিকার এবং টেকসই ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করে ভারত এখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইনের অন্যতম প্রধান নীতি-নির্ধারক হয়ে উঠেছে।

৪. **স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা (মহাকাশ নীতিশাস্ত্র)**

- **মহাকাশ পরিস্থিতি সচেতনতা** (SSA): মহাকাশের আবর্জনা বা ধ্বংসাবশেষ ট্র্যাক করতে ভারত **প্রজেক্ট নেত্র** (Project NETRA)-এর মতো উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে মহাকাশ পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে।
- **বৈশ্বিক দায়িত্ব:** মহাকাশে অস্ত্রের ব্যবহার রোধ এবং আন্তর্জাতিক আইন (যেমন- লায়বিলিটি কনভেনশন) মেনে চলার মাধ্যমে ভারত বিশ্বস্ত দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রধান দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পৃক্ততা

১. **দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা**

- **আমেরিকা (NASA):**
  - NISAR: একটি যৌথ পৃথিবী-পর্যবেক্ষণ মিশন (২০২৬ সালে উৎক্ষেপণ), যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করবে।
  - **আর্টেমিস অ্যাকর্ডস** (Artemis Accords): আমেরিকার নেতৃত্বাধীন চন্দ্র অভিযান কর্মসূচিতে ভারতের অংশগ্রহণ।
  - **অ্যাক্সিওম-৪** (Axiom-4): আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) একজন ভারতীয় মহাকাশচারী পাঠানোর জন্য যৌথ মিশন।
- **ফ্রান্স** (CNES):
  - TRISHNA: জলবায়ু এবং জল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি যৌথ থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজিং মিশন।
  - **মহাকাশ চিকিৎসা** (Space Medicine): গগনযান মিশনের জন্য জীবন-রক্ষা ব্যবস্থা (Life-support systems) তৈরিতে সহযোগিতা।
- **জাপান** (JAXA):
  - LUPEX: লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন মিশন, চাঁদের দক্ষিণ মেরু অন্বেষণের জন্য একটি যৌথ রোভার-ল্যান্ডার প্রকল্প।
- **রাশিয়া** (Roscosmos):
  - **গগনযান** মিশনে ঐতিহাসিক অংশীদার (মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণ এবং স্পেস স্যুট তৈরিতে সহায়তা)।

২. **বহুপাক্ষিক সম্পৃক্ততা** (Multilateral Engagements)

- **ব্রিকস** (BRICS) **স্পেস কাউন্সিল:**
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পর্যবেক্ষণের তথ্য শেয়ার করার জন্য একটি **রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন** তৈরি করা।

- **গ্লোবাল সাউথ এবং সার্ক (SAARC):**
  - **সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট:** প্রতিবেশী দেশগুলোকে বিনামূল্যে যোগাযোগ পরিষেবা প্রদান।
  - **উন্নতি (UNNATI) প্রোগ্রাম:** ন্যানো-স্যাটেলাইট অ্যাসেম্বলিংয়ের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর কর্মকর্তাদের ইসরো (ISRO) কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- **কোয়াড (QUAD) স্পেস ওয়ার্কিং গ্রুপ:**
  - ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে **সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা (MDA)** এবং জলবায়ু পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ।
- **মহাকাশ ও বড় দুর্যোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চার্টার:**
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় বিশ্ববাসীকে সাহায্য করার জন্য ভারত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট ডেটা সরবরাহ করে।

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতার কৌশলগত গুরুত্ব

১. **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** আমেরিকার (**আর্টেমিস অ্যাকর্ডস**) সাথে উচ্চ-প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বের পাশাপাশি রাশিয়া ও ফ্রান্সের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতকে কোনো নির্দিষ্ট শক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে দেয় না এবং ভারতের স্বাধীন ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রাখে।

২. **জাতীয় নিরাপত্তার গুণক:** NISAR এবং **কোয়াড (QUAD)**-এর মতো যৌথ উদ্যোগগুলো সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা এবং সীমান্ত নজরদারি বৃদ্ধি করে। এটি "ডার্ক শিপিং" ট্র্যাক করতে এবং সংবেদনশীল সীমান্ত পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

৩. **গ্লোবাল সাউথ নেতৃত্ব: সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট** এবং **উন্নতি (UNNATI)** প্রোগ্রামের মাধ্যমে মহাকাশ প্রযুক্তিকে "নরম শক্তি" (Soft Power) হিসেবে ব্যবহার করে ভারত চীনের "স্পেস সিল্ক রোড"-এর একটি সাশ্রয়ী বিকল্প প্রদান করছে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে ভারতের নেতৃত্বকে মজবুত করছে।

৪. **বাণিজ্যিক ও বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি:** OneWeb এবং Axiom-এর মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব এবং **১০০% সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)** নীতির মাধ্যমে ২০৩৩ সালের মধ্যে বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারতের অংশীদারিত্ব **২% থেকে বাড়িয়ে ১০%** করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

৫. **শাসনব্যবস্থার নীতি-নির্ধারক:** COPUOS এবং **আর্টেমিস অ্যাকর্ডস**-এ সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে ভারত এখন মহাকাশ নীতিশাস্ত্র, ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চে একজন "নীতি-নির্ধারক" হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত ঝুঁকি**

- **"প্রযুক্তি অস্বীকার"-এর ইতিহাস:** আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও, উচ্চ-প্রযুক্তি (যেমন: রেডিয়েশন-হার্ডেন্ড চিপস, উন্নত সেমিকন্ডাক্টর) হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলোর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং MTCR-এর কারণে এখনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
- **কৌশলগত ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ:** আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠতা রাশিয়ার মতো পুরনো বন্ধুদের দূরে ঠেলে দিতে পারে (যা গগনযানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ) অথবা আমেরিকা ও চীনের মধ্যকার "শীতল যুদ্ধ"-এর মাঝে ভারতকে ফেলে দিতে পারে।
- **আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা:** চীনের **"স্পেস সিল্ক রোড"** উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিচ্ছে, যা গ্লোবাল সাউথ-এ ভারতের সাশ্রয়ী কূটনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

২. **বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা**

- **বাজারের অংশীদারিত্বের ব্যবধান:** ৫৪০ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারতের অংশ মাত্র **২%**। পুরনো PSLV-এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং SSLV উৎপাদনে ধীরগতির কারণে ছোট স্যাটেলাইটের বাজারে SpaceX আধিপত্য বিস্তার করছে।

- **এফডিআই (FDI) ও বেসরকারি অংশগ্রহণ:** যদিও ১০০% সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটি স্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ **জাতীয় মহাকাশ আইন (National Space Act)** না থাকায় বিনিয়োগকারীরা বীমা এবং দায়বদ্ধতার বিষয়ে এখনো সন্দিহান।

৩. **টেকসই মহাকাশ ও শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা**

- **কক্ষপথের যানজট:** মেগা-কনস্টেলেশন (যেমন: স্টারলিঙ্ক) উপগ্রহের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা সংঘর্ষের ঝুঁকি বাড়ায়। ভারতের **প্রজেক্ট নেত্র (NETRA)** উন্নতি করলেও মহাকাশ পরিস্থিতি সচেতনতায় (SSA) এখনো আমেরিকা ও রাশিয়ার চেয়ে পিছিয়ে আছে।
- **আইনি শূন্যতা:** মহাকাশের খনিজ সম্পদ আহরণ বা কক্ষপথ দখলের বিষয়ে কোনো আন্তর্জাতিক ঐকমত্য নেই। ভারত যখন নিজস্ব স্পেস স্টেশন (BAS) তৈরির পরিকল্পনা করছে, তখন কক্ষপথের সুবিধাজনক জায়গাগুলো আগেভাগে দখল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকছে।

৪. **প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা**

- **একক মহাকাশ বন্দরের ওপর নির্ভরতা:** প্রায় সব আন্তর্জাতিক উৎক্ষেপণ **শ্রীহরিকোটা**র ওপর নির্ভরশীল। **কুলশেখরপত্তনম**-এ দ্বিতীয় বন্দর তৈরির কাজ চললেও, এই বিলম্ব ভারতের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি উৎক্ষেপণ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে।
- **সরঞ্জামের নির্ভরশীলতা:** "আত্মনির্ভর ভারত" সত্ত্বেও, মহাকাশ গবেষণার উন্নত ইলেকট্রনিক্স আমদানির ওপর ভারত এখনো অনেক বেশি নির্ভরশীল।

৫. **নৈতিক ও মানবিক দ্বিধা**

- **সম্পদের অগ্রাধিকার:** সমালোচকরা প্রায়ই ভারতের অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তুলনায় উচ্চ-ব্যয়বহুল মহাকাশ মিশনগুলোর (যেমন: মঙ্গলযান-২ বা শুকযান) যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
- **কেসলার সিনড্রোম (Kessler Syndrome):** ভারতীয় মাটি থেকে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক উৎক্ষেপণ মহাকাশে ধ্বংসাবশেষ বা আবর্জনা বৃদ্ধির সমস্যায় অবদান রাখছে। এর ফলে বাণিজ্যিক লাভ এবং মহাকাশের **দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের (LTS)** মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

ভবিষ্যৎ পথপন্থা

১. **আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করা**

- **মহাকাশ আইনের বিধিবদ্ধকরণ:** বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হলো একটি ব্যাপক **জাতীয় মহাকাশ আইন (National Space Act)** পাস করা। এটি দায়বদ্ধতা, বিমা এবং মেধা সম্পত্তির বিষয়ে আইনি নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে এবং বৈশ্বিক বেসরকারি বড় কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করা সহজ হবে।
- **IN-SPACe-কে আরও গতিশীল করা:** আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগ এবং স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ দ্রুত করার জন্য IN-SPACe-কে একটি শক্তিশালী **"সিঙ্গল উইন্ডো"** ক্লিয়ারেন্স হাউসে রূপান্তর করা।

২. **"শিল্প সহযোগিতার" দিকে রূপান্তর**

- **প্রযুক্তির ক্রয়ের বদলে সহ-উৎপাদন:** কেবল বিদেশ থেকে প্রযুক্তি কেনার বদলে তা যৌথভাবে তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া। **iCET (ভারত-আমেরিকা)**-এর মতো উদ্যোগগুলোকে ব্যবহার করে ভারতে সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট স্থাপন করা, যা বিশেষভাবে মহাকাশ গবেষণার উপযোগী চিপ তৈরি করবে।
- **বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে অন্তর্ভুক্তি:** ভারতের MSME (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) সংস্থাগুলোকে বোয়িং, এয়ারবাস এবং স্পেসএক্স-এর মতো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তোলা। এর ফলে ভারত কেবল উপগ্রহ উৎক্ষেপণের স্থান নয়, বরং মহাকাশ গবেষণার একটি **"ম্যানুফ্যাকচারিং হাব"** বা উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হবে।

৩. **"মহাকাশ কূটনীতি"র পরিধি বাড়ানো**

- **"বিকশিত" গ্লোবাল সাউথের জন্য মহাকাশ:** কেবল উপগ্রহ উপহার দেওয়া নয়, বরং ভারতের উচিত একটি **"স্পেস-জি২০"** (Space-G20) সচিবালয়ের নেতৃত্ব দেওয়া। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জলবায়ু পর্যবেক্ষণের ডেটা ব্যবহারের নিয়মগুলো সহজ করা যাবে।
- **ত্রিপাক্ষিক জোট:** ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সামুদ্রিক নজরদারি বাড়াতে **ভারত-ফ্রান্স-সংযুক্ত আরব আমিরাত** বা **ভারত-জাপান-অস্ট্রেলিয়া**র মতো ত্রিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

৪. **মহাকাশ স্থায়িত্বে (LTS) নেতৃত্ব প্রদান**

- **SSA-তে নিয়ম তৈরি:** মহাকাশ পরিস্থিতি সচেতনতা বা SSA-এর জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম তৈরিতে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। মহাকাশের আবর্জনা কমানোর প্রযুক্তি এবং **"জিরো ডেব্রি"** (শূন্য ধ্বংসাবশেষ) মিশনের ওপর জোর দিয়ে ভারত নিজেকে মহাকাশের একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরতে পারে।
- **কক্ষপথের ভিড় ব্যবস্থাপনা:** বিশাল উপগ্রহ নেটওয়ার্ক বা মেগা-কনস্টেলেশনগুলোর মাধ্যমে কক্ষপথ দখল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ (UN) ও COPUOS-এ শক্ত অবস্থান নেওয়া, যাতে ছোট দেশগুলোও মহাকাশ ব্যবহারের সমান সুযোগ পায়।

৫. **গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা**

- **কোয়ান্টাম ও ডিপ-টেক:** কোয়ান্টাম যোগাযোগ এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক প্রপালশন প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এই **ভবিষ্যৎমুখী প্রযুক্তিগুলোই** আগামী দশকে মহাকাশে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করবে।
- **ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন (BAS): অ্যাক্সিওম-৪ (২০২৫-২৬)** মিশন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরির কাজকে ত্বরান্বিত করা।

উপসংহার

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতা আজ পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে কৌশলগত সমমর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত মহাকাশ পরিষেবার একজন **"প্রধান প্রদানকারী"** হয়ে উঠছে, যা **বিকশিত ভারত** গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশটির নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করছে।

Q. "India's space cooperation has evolved from a developmental necessity to a strategic instrument of foreign policy." Discuss in the context of recent global partnerships. (15 Marks)

3.5. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

3.5.1. ভারতের নগর অগ্নি নিরাপত্তা: চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকার

প্রেক্ষাপট

দিল্লির সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডগুলি (শাহদারা, পালাম, দ্বারকা) **নগর পরিকল্পনা**, ভবনের নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং তীব্র গ্রীষ্মের মাসগুলিতে **বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর** মধ্যে থাকা মারাত্মক ত্রুটিগুলিকে সামনে এনেছে।

ভূমিকা

নগর অগ্নি নিরাপত্তা বলতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুনের ঝুঁকি কমানোর জন্য ডিজাইন করা প্রতিরোধমূলক এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বোঝায়। ভারতে দ্রুত নগরায়নের ফলে প্রায়ই **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড** (NBC) লঙ্ঘন করা হয়, যা এড়ানো সম্ভব এমন অনেক ট্র্যাজেডির জন্ম দেয়।

ভারতে নগর অগ্নি নিরাপত্তার সাংবিধানিক বিধান

- **ধারা ২৪৩ডব্লিউ (243W) এবং ১২তম তফসিল:** ১৯৯২ সালের **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের** মাধ্যমে এটি চালু করা হয়।
  - ১২তম তফসিলের **৭ নম্বর এন্ট্রি** হিসেবে **"অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা" (Fire Services)** তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
  - এটি পৌরসভাগুলিকে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ এবং জীবন রক্ষার কাজ করার ক্ষমতা দেয়।
- **রাজ্য তালিকা (এন্ট্রি ৬):** জনস্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন, যার মধ্যে অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত, তা ব্যক্তিগতভাবে **রাজ্যগুলির** আইনি এক্তিয়ারের অধীনে পড়ে।

ভারতে ঘনঘন নগর অগ্নিকাণ্ডের কারণ

১. **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) লঙ্ঘন:** অনেক ভবনে বাধ্যতামূলক **অগ্নি নির্গমন পথ** (Fire Exits), খোলা ছাদ এবং রিফিউজ এরিয়া (আশ্রয়স্থল) নেই। অননুমোদিত নির্মাণ এবং অবৈধ সম্প্রসারণ প্রায়ই বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়, যা আগুনের সময় ভবনটিকে **"ধোঁয়ার প্রকোষ্ঠে"** পরিণত করে।

২. **বৈদ্যুতিক ওভারলোডিং এবং নিম্নমানের ওয়্যারিং:** গ্রীষ্মকালে এসি-র মতো উচ্চ-শক্তির সরঞ্জামের ব্যবহার পুরনো তারের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। **মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (MCB)** বাইপাস করার ফলে শর্ট সার্কিটের সময় সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হতে পারে না।

৩. **নিরাপত্তা ব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব:** চুরির ভয়ে বারান্দা এবং জানালায় স্থায়ী **লোহার গ্রিল** লাগানো হয়, যা বিপদের সময় বাসিন্দাদের ভেতরে আটকে ফেলে। একইভাবে, আধুনিক **ইলেকট্রনিক লক** বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা আগুনের সময় প্রায়ই কাজ করতে ব্যর্থ হয়।

৪. **অদক্ষ নগর পরিকল্পনা এবং যানজট:** সরু গলি এবং মাথার ওপর ঝুলে থাকা **বিপজ্জনক বিদ্যুতের তার** দমকলের গাড়িগুলিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বাধা দেয়। অবৈধ পার্কিং এবং নিচু প্রবেশদ্বারগুলি ভারী হাইড্রোলিক সরঞ্জাম চলাচলে সমস্যা তৈরি করে।

৫. **মিশ্র-ব্যবহারের ভবনের অবহেলা:** আবাসিক ভবনগুলিকে প্রায়শই ছোট কারখানা বা **দাহ্য পদার্থের গুদাম** হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই জায়গাগুলিতে অগ্নি নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় কঠোর প্রোটোকল মানা হয় না।

৬. **অডিট এবং প্রয়োগের অভাব:** স্থানীয় পৌরসভাগুলিতে পরিদর্শকের অভাবে প্রায়ই নথিপত্র পরীক্ষা না করেই Fire NOC দেওয়া হয়। নিয়মিত অডিট না হওয়ায় স্মোক ডিটেক্টর এবং স্প্রিঙ্কলারের মতো সরঞ্জামগুলি অকেজো হয়ে থাকে।

ভারতে নগর অগ্নি নিরাপত্তার জন্য সরকারি উদ্যোগ

১. **আইনি ও নীতিগত কাঠামো**

- **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) ২০১৬:** ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS) দ্বারা প্রকাশিত এই কোডের ৪র্থ অংশ অগ্নি নিরাপত্তার প্রধান নির্দেশিকা। এটি উচ্চ ভবনে **অগ্নি-প্রতিরোধী দরজা**, নির্দিষ্ট প্রস্থের প্রস্থানের পথ এবং অগ্নি নির্বাপক লিফটের মতো কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক করে।
- **মডেল বিল্ডিং বাই-ল (২০১৬):** আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক (MoHUA) দ্বারা জারি করা এই নির্দেশিকা স্থানীয় পৌরসভাগুলিকে তাদের ভবন অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় **NBC-র মানদণ্ড** অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করে।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক ও কৌশলগত নির্দেশিকা**

- **NDMA নির্দেশিকা (২০১২):** ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি অগ্নি ও জরুরি পরিষেবার আধুনিকীকরণের জন্য নির্দিষ্ট প্রোটোকল জারি করেছে। এটি রাজ্য সরকারগুলির প্রশিক্ষণ, জনবল এবং সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য একটি রোডম্যাপ প্রদান করে।
- **SFAC (Standing Fire Advisory Council):** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে কর্মরত এই সংস্থাটি অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সরকারকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেয়।

৩. **আর্থিক আধুনিকীকরণ (১৫তম অর্থ কমিশন)**

পরিকাঠামোগত ব্যবধান দূর করতে **১৫তম অর্থ কমিশন** উল্লেখযোগ্য বাজেট বরাদ্দ করেছে:

- **রাজ্য-স্তরের বরাদ্দ:** রাজ্যগুলিতে **"অগ্নি নির্বাপক পরিষেবার আধুনিকীকরণের"** জন্য প্রায় **৫,০০০ কোটি টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **নগর অনুদান:** নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত অনুদানের একটি অংশ **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা** এবং অগ্নি প্রস্তুতি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক উদ্যোগ

- **অগ্নি নিরাপত্তা অডিট (Fire Safety Audits):** হাসপাতাল ও মলের মতো **"বিশেষ ভবন"** গুলিতে সার্টিফাইড অডিটর দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন এবং Fire NOC নবায়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ (NFSC):** নাগপুরে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটি পেশাদার ফায়ার অফিসার তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং ডিগ্রি কোর্স প্রদান করে।
- **আপদা মিত্র প্রকল্প (Aapda Mitra Scheme):** এটি একটি সম্প্রদায়-ভিত্তিক উদ্যোগ যেখানে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ উদ্ধার, প্রাথমিক অগ্নি নিরাপত্তা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- **অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা সপ্তাহ (Fire Service Week):** সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর **১৪ থেকে ২০শে এপ্রিল** পর্যন্ত এটি পালন করা হয়, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে মক ড্রিল এবং নিরাপত্তার পাঠ দেওয়া হয়।

নগর অগ্নি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ

পৌরসভার দুর্বল প্রয়োগ: দুর্নীতি বা কারিগরি কর্মীর অভাবে ভবন নির্মাণের সময় বিল্ডিং বাই-ল এবং **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC)**-এর মানদণ্ডগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়।

- **পুরানো পরিকাঠামো:** শহরের পুরানো ও ঘিঞ্জি এলাকাগুলোতে সরু গলি এবং মাথার ওপর ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক তার আধুনিক দমকলের গাড়ি প্রবেশে শারীরিক বাধা সৃষ্টি করে।
- **জনবল ও সরঞ্জামের অভাব:** অধিকাংশ রাজ্যের অগ্নি নির্বাপক পরিষেবাগুলোতে প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে এবং উচ্চ ভবনে আগুন নেভানোর জন্য প্রয়োজনীয় **লং-রিচ হাইড্রোলিক ল্যাডার** বা উন্নত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।
- **সক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে অভাব:** অনেক ভবনে স্মোক ডিটেক্টর এবং স্প্রিঙ্কলারের মতো সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো সময়ের সাথে সাথে অকেজো হয়ে পড়ে।
- **অনিয়ন্ত্রিত মিশ্র-ব্যবহারের ভবন:** আবাসিক এলাকায় ছোট শিল্প কারখানা এবং গুদামঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা তৈরি হচ্ছে, যেখানে যথাযথ শিল্প নিরাপত্তা প্রোটোকল মানা হয় না।
- **জনসচেতনতার অভাব:** সাধারণ মানুষের মধ্যে "নিরাপত্তা সংস্কৃতির" অভাবের কারণে তারা জরুরি নির্গমন পথ বন্ধ করে দেয় বা স্থায়ী **লোহার গ্রিল** স্থাপন করে, যা বিপদের সময় ঘরগুলোকে মৃত্যুকূপে পরিণত করে।

নগর অগ্নি নিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন

দেশ	অনুশীলনের নাম	ব্যাখ্যা
আমেরিকা (USA)	NFPA স্ট্যান্ডার্ড এবং NEC কমপ্লায়েন্স	ন্যাশনাল ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন (NFPA) ৩০০টিরও বেশি কোড নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে **ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোড (NEC)** প্রতি ৩ বছর অন্তর আপডেট করা হয় যাতে উন্নত সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক আগুন রোধ করা যায়।
জাপান	অগ্নি-সহনশীল নগর পরিকল্পনা (Bousai)	টোকিওতে **"ফায়ার কন্টেইনমেন্ট জোন"** এবং ভূমিকম্প-সহনশীল বিল্ডিং কোড ব্যবহার করা হয়। এতে স্বয়ংক্রিয় গ্যাস শাট-অফ ভালভ এবং **"সিসমিক ব্রেকার"** বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে দুর্যোগ পরবর্তী আগুন রোধ করা যায়।

সিঙ্গাপুর	**বাধ্যতামূলক ফায়ার সেফটি ম্যানেজার (FSM)**	সিঙ্গাপুর সিভিল ডিফেন্স ফোর্স (SCDF) সমস্ত সরকারি ও শিল্প ভবনের জন্য একজন প্রত্যয়িত **ফায়ার সেফটি ম্যানেজার** নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে, যারা বছরে দুবার মক ড্রিল এবং প্রতিদিন নিরাপত্তা অডিট নিশ্চিত করেন।

নগর অগ্নি নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ পথ

১. **NBC-এর কঠোর প্রয়োগ:** পৌরসভাগুলিকে **সম্পত্তি কর এবং বিমার প্রিমিয়ামকে** ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) পালনের সাথে যুক্ত করতে হবে, যাতে নিরাপত্তা কেবল একটি পছন্দ নয় বরং একটি আর্থিক উৎসাহে পরিণত হয়।

২. **বাধ্যতামূলক বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা অডিট:** ১৫ বছরের বেশি পুরনো ভবনগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমিক তৃতীয়-পক্ষীয় বৈদ্যুতিক পরিদর্শন চালু করতে হবে যাতে **ওভারলোডেড সার্কিট** শনাক্ত করা যায় এবং উন্নত মানের সার্কিট ব্রেকার স্থাপন নিশ্চিত করা যায়।

৩. **অগ্নি নির্বাপক পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ: ১৫তম অর্থ কমিশনের অনুদান** ব্যবহার করে সরু গলিতে প্রবেশযোগ্য ছোট দমকল গাড়ি, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি এবং আইওটি (IoT) ভিত্তিক হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে যা জলের স্তর কমলে সংকেত দেবে।

৪. **রেট্রোফিটিং এবং নকশা উদ্ভাবন:** ঘিঞ্জি আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তা এবং জরুরি নির্গমন—উভয়ই বজায় রাখতে **"সুইং-অ্যাওয়ে" বা খোলা যায় এমন গ্রিল** এবং অগ্নি-প্রতিরোধী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।

৫. **সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রস্তুতি: আপদা মিত্র** প্রকল্পকে আরও বিস্তৃত করতে হবে যাতে প্রতিটি আবাসিক কল্যাণ সমিতিতে (RWA) একদল **"ফায়ার মিত্র"** তৈরি করা যায় যারা নিয়মিত মক ড্রিল এবং নির্গমন পথ পরিষ্কার রাখা তদারকি করবেন।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা:** বড় আবাসিক কমপ্লেক্সের জন্য সিঙ্গাপুরের মডেলে **প্রত্যয়িত ফায়ার সেফটি ম্যানেজার** নিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হবে, যারা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য আইনত দায়বদ্ধ থাকবেন।

উপসংহার

নগর অগ্নি নিরাপত্তাকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পরিষেবা থেকে সরিয়ে **সক্রিয় সুশাসনের** একটি স্তম্ভে পরিণত করতে হবে। **NBC কমপ্লায়েন্স**, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং জন-প্রস্তুতির সমন্বয়ে ভারত এমন স্থিতিস্থাপক শহর গড়ে তুলতে পারে যেখানে কাঠামোগত সুবিধার চেয়ে মানুষের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

Q. Recent urban fire accidents in India expose deeper failures in urban planning, electrical safety, and disaster preparedness. Examine the major challenges in ensuring fire safety in Indian cities and suggest measures to improve urban resilience. (15 Marks)

3.6. প্রতিরক্ষা

3.6.1. ভারতের নতুন নিরাপত্তা নীতি

প্রেক্ষাপট

২০২৫ সালের ২২শে এপ্রিল পহalgam-এ হওয়া জঙ্গি হামলার পর, ২০২৫ সালের ৭ই মে ভারত একটি উচ্চ-তীব্রতার প্রতিশোধমূলক হামলা হিসেবে **অপারেশন সিন্দুর** শুরু করে। এটি পাকিস্তানের সন্ত্রাসী পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। এটি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা নীতিতে একটি বড় ধরণের পরিবর্তনের সূচনা করে।

অপারেশন সিন্দুর-এর গুরুত্ব

- **নীতিগত পরিবর্তন:** এটি প্রথাগত "কৌশলগত সংযম"-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটায়। এর ফলে পুরনো "ডোজিয়ার বা নথিপত্র আদান-প্রদান"-এর বদলে **জিরো টলারেন্স (শূন্য সহনশীলতা)** নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদকে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **পারমাণবিক ভীতি দূর করা:** বাহাওয়ালপুর এবং মুরিদকের মতো গভীর লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে ভারত প্রতিপক্ষের পারমাণবিক হুমকিকে তুচ্ছ প্রমাণ করেছে। এটি দেখিয়েছে যে, পারমাণবিক সীমার নিচে থেকেও ভারত উচ্চ-তীব্রতার সামরিক অভিযান চালাতে সক্ষম।
- **কার্যকরী সমন্বয় (Operational Integration):** এই মিশনটি সেনাবাহিনীর তিনটি শাখার (**স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী**) মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ও সংহতির একটি বড় পরীক্ষা ছিল, যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব:** দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্ল্যাটফর্ম এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (যেমন S-400) এই অভিযানে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। এটি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে **আত্মনির্ভরশীলতার (Atmanirbharta)** গুরুত্ব প্রমাণ করেছে।

ভারতের নতুন নিরাপত্তা নীতির বৈশিষ্ট্য

- **সক্রিয় প্রতিশোধ:** ভারত এখন কূটনৈতিক "প্রতিক্রিয়াশীল সংযম" থেকে সরে এসে তাৎক্ষণিক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি নিয়েছে। ভারত এখন আর আন্তর্জাতিক নথিপত্রের ওপর নির্ভর না করে স্বাধীন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে।
- **পারমাণবিক ধাপ্পাবাজি মোকাবিলা:** এই নতুন নীতি অনুযায়ী, পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি ছাড়াই সামরিক অভিযানের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের সীমানার অনেক ভেতরে আঘাত হেনে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে যে, পারমাণবিক শক্তি কোনোভাবেই প্রক্সি ওয়ার বা ছায়াযুদ্ধের ঢাল হতে পারে না।
- **সমন্বিত যুদ্ধ শক্তি:** প্রতিরক্ষা এখন একটি "সমগ্র জাতির প্রচেষ্টা"। এটি স্থল, জল এবং আকাশপথের শক্তির সাথে উন্নত প্রযুক্তির (যেমন S-400) সমন্বয় ঘটিয়ে একটি বিধ্বংসী ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরির ওপর জোর দেয়।
- **জিরো-টলারেন্স ম্যান্ডেট:** সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদকে এখন **"যুদ্ধের শামিল"** হিসেবে দেখা হয়। এটি সামরিক বাহিনীকে একটি রাজনৈতিক "মুক্ত হস্ত" প্রদান করে, যাতে তারা আক্রমণের সময় এবং তীব্রতা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে।

ভারতের জন্য কৌশলগত প্রভাব

১. **প্রতিরক্ষামূলক থেকে সক্রিয় প্রতিরোধে রূপান্তর:** ভারত এখন কেবল আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া দেখানোর বদলে **"বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ"** গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেছে, যার মধ্যে আগাম আঘাত হানার বিকল্পও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষায় ভারত সীমান্তের ওপারে সন্ত্রাসের উৎসে আঘাত করতে দ্বিধা করবে না।

২. **ইন্টিগ্রেটেড থিয়েটার কমান্ড (ITC):** সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ফলে সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং অপারেশনাল গতি বৃদ্ধি পাবে। এই কাঠামোগত পরিবর্তন হাইব্রিড হুমকি এবং দুই ফ্রন্টের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক সাড়া নিশ্চিত করবে।

৩. **প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরশীলতা:** বিদেশি প্রস্তুতকারকদের ওপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক জোর দেওয়া হচ্ছে। এটি ভারতের **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে** শক্তিশালী করে এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়েও সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখে।

৪. **মাল্টি-ডোমেইন অপারেশন এবং সাইবার নিরাপত্তা:** নতুন নীতি স্বীকার করে যে আধুনিক যুদ্ধ কেবল স্থল, জল বা আকাশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ডিজিটাল এবং মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই তথ্য পরিকাঠামো রক্ষা এবং মহাকাশ-ভিত্তিক নজরদারি বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫. **বহুপাক্ষিক মৈত্রীর মাধ্যমে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** ভারত একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থেকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বজায় রাখে। এটি ভারতকে Quad এবং BRICS-এর মতো মঞ্চে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি বিশ্ববন্ধু (Vishwa Bandhu) হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়।

ভারতের নতুন কৌশলগত মতবাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **পারমাণবিক উত্তেজনার ঝুঁকি:** পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘনঘন সামরিক প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ দক্ষিণ এশিয়ায় অনিচ্ছাকৃত উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং কৌশলগত অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

২. **উচ্চ সামরিক প্রস্তুতি বজায় রাখা:** একটি সক্রিয় মতবাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সেনা মোতায়েন, **নজরদারি** এবং কর্মক্ষম প্রস্তুতি প্রয়োজন, যা সশস্ত্র বাহিনী ও সম্পদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

৩. **কূটনৈতিক ও বৈশ্বিক চাপ:** সংকটের সময় বড় শক্তিগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভারতকে সংযত থাকার জন্য চাপ দিতে পারে, যা ভারতের কৌশলগত নমনীয়তাকে সীমিত করে।

৪. **অর্থনৈতিক ও আর্থিক বোঝা:** উন্নত প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বজায় রাখা, আধুনিকীকরণ এবং **স্বদেশী উৎপাদন** বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং বিশাল আর্থিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

৫. **সাইবার এবং হাইব্রিড যুদ্ধের হুমকি:** শত্রুরা প্রচলিত যুদ্ধের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমানভাবে **সাইবার আক্রমণ**, ড্রোন, ভুল তথ্য প্রচার এবং প্রক্সি এজেন্টদের (পরোক্ষ শক্তি) ব্যবহার করতে পারে।

৬. **স্বদেশী প্রতিরক্ষা সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীলতা:** এই মতবাদের সাফল্য নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ওপর। তবে এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ঘাটতি এবং আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পন্থা

১. **সমন্বিত থিয়েটার কমান্ড (Integrated Theatre Commands) শক্তিশালী করা:** ভবিষ্যৎ যুদ্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যৌথ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে ভারতকে সামরিক সমন্বয় ত্বরান্বিত করতে হবে।

২. **প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি:** বিদেশী নির্ভরশীলতা কমাতে এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বাড়াতে **স্বদেশী প্রতিরক্ষা উৎপাদন**, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সাইবার সিস্টেমে বিনিয়োগ বাড়ানো অপরিহার্য।

৩. **গোয়েন্দা ও নজরদারি সক্ষমতা বৃদ্ধি:** আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং হাইব্রিড হুমকি রুখতে ভারতকে রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ, **স্যাটেলাইট নজরদারি**, সাইবার মনিটরিং এবং সীমান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৪. **উন্নত সাইবার এবং হাইব্রিড যুদ্ধের প্রস্তুতি:** একটি আধুনিক নিরাপত্তা কৌশলে সাইবার আক্রমণ, ড্রোন যুদ্ধ এবং শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৫. **কৌশলগত কূটনীতি এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের বিস্তার:** আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং আঞ্চলিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন গড়ে তুলতে ভারতকে QUAD, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা আরও গভীর করতে হবে।

৬. **নিয়ন্ত্রিত উত্তেজনার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ বজায় রাখা:** সামরিকভাবে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করলেও, একটি পারমাণবিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারতকে পরিমিত প্রতিক্রিয়া এবং **উত্তেজনা ব্যবস্থাপনা** বা নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

উপসংহার

অপারেশন সিন্দুর ভারতের নিরাপত্তা কৌশলে 'প্রতিক্রিয়াশীল সংযম' থেকে 'সক্রিয় প্রতিরোধে'র একটি নির্ণায়ক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নির্ভর করে সামরিক প্রস্তুতি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, কৌশলগত কূটনীতি এবং একটি জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশে কার্যকরভাবে উত্তেজনা ব্যবস্থাপনার ওপর।

Q. "Operation Sindoor reflects a paradigm shift in India's national security doctrine from strategic restraint to proactive deterrence." Discuss the strategic significance of this shift. Also examine the challenges associated with India's emerging security doctrine. (15 Marks)

***

Scan to attempt more questions...

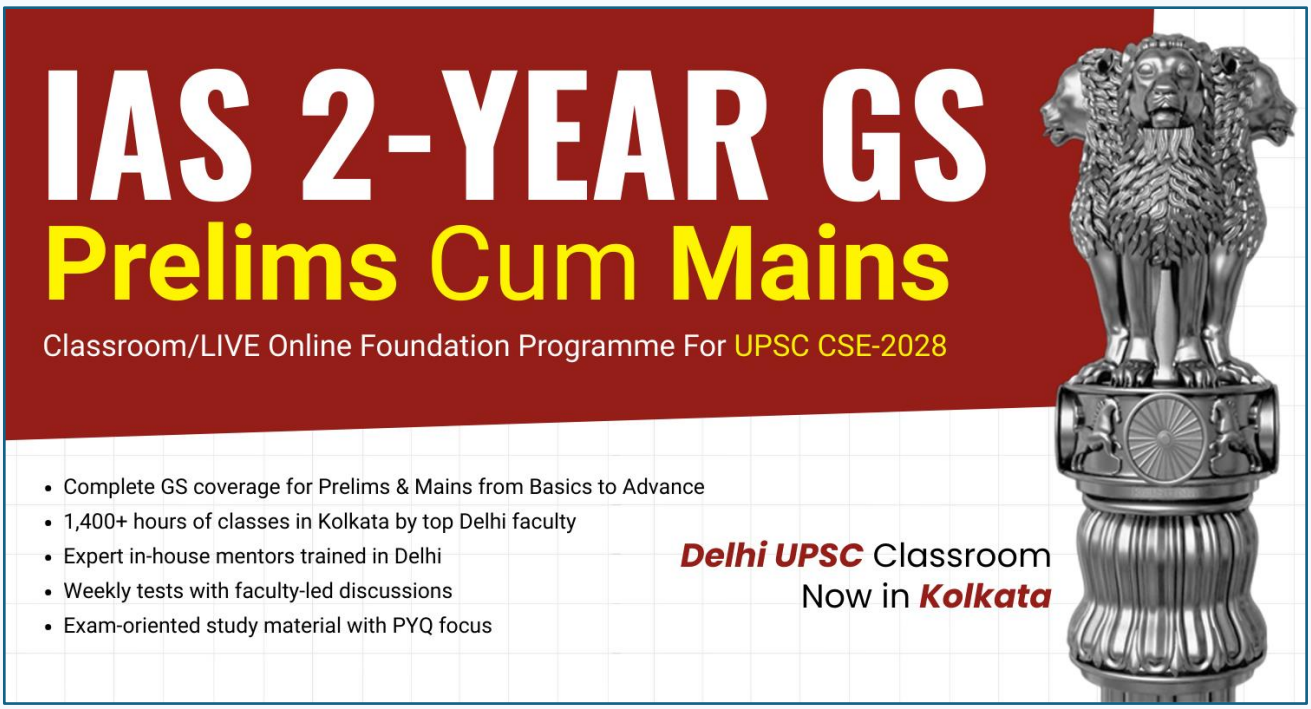

PROF. (DR.) SAMIT RAY
Chairman of RICE Group and
Chancellor of Adamas University

RICE IAS

Delhi's Top Notch IAS Faculty Now At Kolkata

2-YEAR GS PRELIMS & MAINS

Classroom/LIVE Online Foundation Programme

FOR UPSC-CSE 2028

Under the guidance of

S.A. MAJID

Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President -ADAMAS UNIVERSITY

KNOW YOUR FACULTY MEMBERS

AKSHAY VRAT
Experience – 12+ Yrs
Subject – Environment

DR. K SHIVESH
Experience – 20+ Yrs
Subject – Modern History

ALOK KUMAR
Experience – 10+ Yrs
Subject – Science & Tech.

DR. KUMUD RANJAN
Experience – 20+ Yrs
Subject – Polity & Constitution

AMIT KUMAR
Experience – 10+ Yrs
Subject – Economics

VIJAY KUMAR
Experience – 07+ Yrs
Subject – Society

ANKIT SHARMA
Experience – 10+ Yrs
Subject – International Relations

KARUNA MISHRA
Experience – 07+ Yrs
Subject – Geography

PANKAJ SINGH
Experience – 10+ Yrs
Subject – AMC

DR. P M TRIPATHI
Experience – 25+ Yrs
Subject – Essay

Sealdah, Kolkata | Old Rajinder Nagar, New Delhi | At Adamas University

8100819447 | 9933118849 | 8100971442

Through the Eyes of Aspirants

P.V Surendra
Monthly Current affairs magazine of RICE IAS is really helping me alot. It is comprehensively covering current events with segregation of topics in subject wise.

Aindrila saha
The monthly magazines for current affairs are exam-oriented and written in a very concise manner suitable for performing well in the examinations.

Sulagna Roy
Provides gainful insights about the current relevant news. Really beneficial.

Kashish Kapoor
By reading Monthly Current Affairs it has become easy to conclude the important news at the end of the month.

Shreya Mondal
By reading current affairs, it has become easy to conclude the important news at the end of monthly magazine.

Kishore Muddada
The topics are comprehensively covered in each magazine content was crisp, clear & to the point that are very much important for the preparation & the current is also covered with the static part. Keep up the good work.

OUR COURSES

IAS 2-Year General Studies

Prelims Cum Mains Foundation Course

Classroom & LIVE Online Programme

- Complete GS coverage for Prelims & Mains from Basics to Advance
- 1,400+ hours of classes in Kolkata by top Delhi faculty
- Expert in-house mentors trained in Delhi
- Weekly tests with faculty-led discussions
- Exam-oriented study material with PYQ focus

For **UPSC CSE-2028**

IAS 10-Month General Studies

Prelims Cum Mains

Classroom & LIVE Online Programme

- Complete GS coverage for Prelims & Mains
- 700+ hours of classes in Kolkata by top Delhi faculty
- Expert in-house mentors trained in Delhi
- Weekly tests with faculty-led discussions
- Exam-oriented study material with PYQ focus

For **UPSC CSE-2027**

RICE IAS

Prof. (Dr.) Samit Ray

CHAIRMAN OF RICE GROUP
& CHANCELLOR OF ADAMAS UNIVERSITY

"Bengal once led India in the Civil Services, producing pioneers like Satyendra Nath Tagore and Subhas Chandra Bose. Today, we must revive that legacy. With the right guidance and training, Bengal's youth can again shape governance and nation-building. When Bengal's students rise, the whole nation prospers".

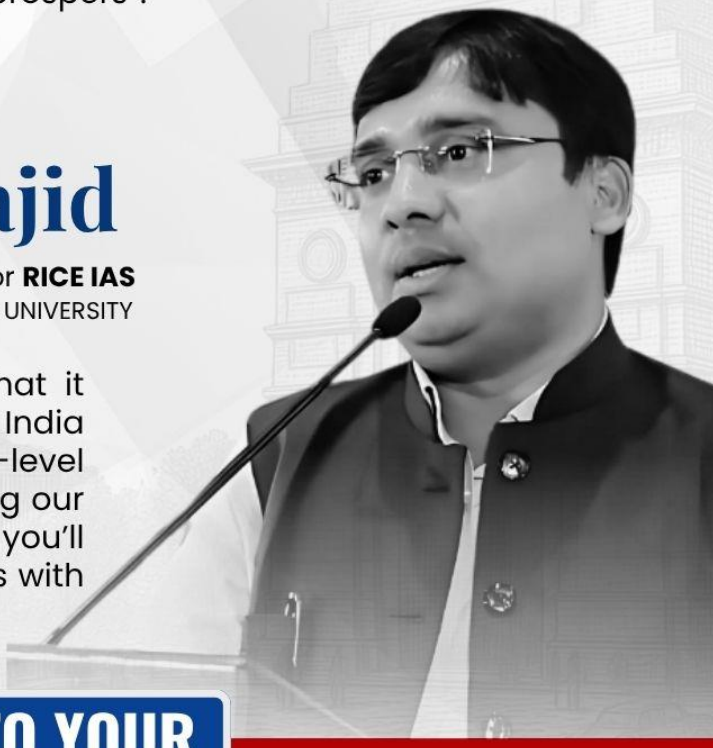

S.A. Majid

Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President -ADAMAS UNIVERSITY

"With 12 years at Vajiram & Ravi, I know what it takes to crack UPSC CSE (IAS/IPS/IFS/other All India Services). We started RICE IAS to bring Delhi-level coaching and expert faculty to Bengal, reviving our legacy of producing IAS and IPS officers. Here, you'll find not just guidance but a mentor who stays with you until success"

GET CLOSER TO YOUR
IAS & IPS DREAMS

Sealdah, Kolkata | Old Rajinder Nagar, New Delhi | At Adamas University

8100819447 | 9933118849 | 8100971442